বনফুল



প্রকাশ ভবন ॥ কলিকাতা—বারো

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীশ্যামল নন্দী

সন্ধিপূজা

১

সেদিন বড়ই গরম। চৈত্র মাস। আকাশে প্রতপ্ত সূর্য মীন রাশিতে অবস্থান করিয়া স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন। কোথাও পাতাটি নড়িতেছে না। এখনকার হিসাবে কালটা সেকাল। এখন যেটাকে কলিকাতা বলি তখন সেটার নাম ছিল সুতানুটি! চারিদিকে তখনও গ্রাম্য ভাব অপরিবর্তিত। মাঝে মাঝে দুই একটি পাকাবাড়ি আছে বটে, কিন্তু খড়ের বাড়ি এবং খাপরার বাড়িও বিস্তর। টিনের চালও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কাঁচা নালি রাস্তার দুইধারে ভটভট করিতেছে। রাস্তাও কাঁচা। বর্ষার সময়ে চারিদিক কাদায় পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। পুকুর ডোবাও কম নাই। প্রতি পল্লীতেই প্রায় একটা করিয়া পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে নারিকেল সুপারি ও তালের গাছ। ভাল পুকুরও আছে, আবার শ্যাওলা-ঢাকা মজা পুকুরেরও অভাব নাই। অনেক বাড়ির সামনে বা পিছনে ছোট ছোট সব্‌জি-বাগান। সেখানে বেগুন, পুঁইশাক, পালং শাক, লাউ গাছ, কুমড়ো গাছ প্রভৃতির ভিড়। কলাগাছও প্রচুর। এসব ছাড়াও মাঝে মাঝে আম জাম কাঁঠাল গাছও রাস্তার ধারে ধারে আছে। সেগুলির মালিক কোম্পানি, কিন্তু সেগুলির ফল ভোগ করে পাড়ার পাঁচজন। বড় রাস্তা হইতে কিছুদূরে বেশ বড় একটি বাগান। বাগানের একধারে ছোট একটি বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালগুলি পাকা, কিন্তু ছাদ পাকা নয়। খাপরা, এবং একদিকে খানিকটা খড়ের চাল আছে। ইহার উপর একটি চারকোনা গৈরিক পতাকা উড়িতেছে। ইহার অর্থ বাড়িটির মধ্যে কোনও দেবতা আছেন। ঘরের পূর্ব দিকের দেওয়ালটায় ছোট একটি জানলা রহিয়াছে। একটিমাত্র দ্বার। সে দ্বারে প্রকাণ্ড একটি তালা ঝুলিতেছে। দেশী তালা নহে, বিদেশী ভালো তালা। বেশ বড় এবং ভারী। মন্দিরটির ভিতর আছে একটি শিবলিঙ্গ। স্বয়ম্ভু বহুকাল পূর্বে নাকি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই স্থানে, মাটি ভেদ করিয়া। তাহার পূর্বে একটি স্বপ্ন দিয়াছিলেন বর্তমান মালিক ধূর্জটিমঙ্গল

চৌধুরীর পিতা মহেশমঙ্গল চৌধুরীকে। স্বপ্নে মহেশমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন—
—"দেখ, মহেশ তোর এই বাগানের কোণে বহুদিন থেকে মাটির নীচে আছি। বাংলা দেশে পাল রাজত্ব শুরু হবার অনেকদিন আগে বীরভদ্র নামে একজন তান্ত্রিক হিন্দু আমাকে এখানে স্থাপিত করেছিলেন। পাশে একটি কালীর মূর্তিও ছিল। কিন্তু অনাচারে অবিচারে অত্যাচারে যখন দেশ ছেয়ে গেল তখন বিদ্রোহ হল দেশে। পালবংশ স্থাপিত হল। তারা সব বৌদ্ধ। তারা হিন্দুদের মূর্তি সব লোপাট করতে লাগল। হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার পাশের কালীমূর্তিটি অন্তর্ধান করেছে। রণরঙ্গিণী নিজেই অন্তর্ধান করেছেন, কেউ তাঁকে তুলে নিয়ে যান নি। আমিও ইচ্ছে করলে গা-ঢাকা দিতে পারতুম। কিন্তু আমি স্থাণু লোক, কোথাও নড়া-চড়া করতে চাই না। আমি থেকেই গেলুম। ভাবলাম, দেখাই যাক না কি হয় শেষ পর্যন্ত। বৌদ্ধদের আমলে আমার ভারী দুর্দশা হয়েছিল। আমার মন্দিরটা ভেঙে গেল। তাতে ভারী আরাম পেলুম। তুমি আর যেন মন্দির করাতে যেও না। ধুমধাম করে পূজো করবারও দরকার নেই। মনে মনে পূজো কোরো, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হব। খোলা-মেলা জায়গাই আমার ভালো লাগে। তোমার বাগানটা পাহারা দেব আমি। চোরের দেশ তো, অনেকেই তোমার বাগানের ফল চুরি করে নিয়ে যায়। আমি তাদের নাম চিত্রগুপ্তের খাতায় লিখিয়ে দেব, বাছাধনরা পরে মজাটা টের পাবেন। আমি এখানে থাকব, কেউ আমাকে নাড়াতে পারবে না। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।"

মহেশমঙ্গল প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"মা কালী কোথায় গেলেন? তাঁকে কি খোঁজবার চেষ্টা করব?"

"না, চেষ্টা করলেও তুমি পারবে না। তিনি ইচ্ছা না করলে কেউ তাঁর নাগাল পায় না। তিনি সর্বত্র আছেন, এখানে আছেন। তিনি ইচ্ছাময়ী, যখন ইচ্ছা করবেন এখানে তিনি আবির্ভূতা হবেন। তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না।

মহেশমঙ্গল বলিলেন—"কিন্তু আপনি বাবা একলা থাকবেন, সেটা কি ভালো দেখায়?"

মহাদেব হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি কখনও একা থাকি না। শক্তি সর্বদা আমার সঙ্গে থাকেন। ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না"।

মহেশমঙ্গল ইহা লইয়া আর মাথা ঘামান নাই। মহাদেবের পাকা মন্দিরও আর নির্মিত হয় নাই। তিনি স্বপ্নের কথাটা অবশ্য সকলকে বলিয়াছিলেন। সেই হইতেই কথাটা রটিয়া গিয়াছিল যে স্বয়ং মহাদেব তাঁহার বাগান পাহারা দেন এবং চোরদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া চিত্রগুপ্তের দফতরে পাঠান। কিন্তু অতি-বুদ্ধিমান ঘুঘু ধরনের লোকেরা কথাটা বিশ্বাস করিতেন না। বলিতেন—"মহেশবাবু চতুর লোক। তাই স্বয়ং মহাদেবকে বাগানের পাহারাদার রেখেছেন। কল্পনার জোর আছে চৌধুরী মশায়ের। কিন্তু কল্পনার মুলে কি আছে জানেন? গাঁজা আর কারণ। দিনে বিশ পঁচিশ ছিলিম গাঁজা খান আর বোতল বোতল কারণ। এরই জোরে উনি মহাদেবকে বাগানের পাহারাদার বানিয়েছেন। খলিফা লোক বটে।"

এইবার ধূর্জটিমঙ্গলের পূর্বপুরুষের ইতিহাস একটু স্মরণ করা যাক। মহেশমঙ্গল বিরাট বড়লোক ছিলেন। জমি জায়গা বিস্তর ছিল। নবাবী আমল হইতে যে সব বিষয়সম্পত্তি জায়গীরস্বরূপ পাইয়াছিলেন সেগুলি তো ছিলই, ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াও বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন তিনি। শোনা যায় আলিবর্দি খাঁর সুনজর ছিল তাঁহার উপর। তিনি যখন বঙ্গদেশে আসিয়া সরফরাজ খাঁকে গদিচ্যুত করিয়া সেই গদিতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন তখন মহেশমঙ্গল বালক মাত্র। তাঁহার পিতা শঙ্করমঙ্গল তখন এক বিখ্যাত ডাকাতদলের নেতা ছিলেন। শঙ্করমঙ্গলের ডাকাতরা আলিবর্দি খাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। আলিবর্দি নিজের সৈন্যদলে শঙ্করমঙ্গলকে ভর্তি করিয়া লইয়াছিলেন। আততায়ীদের সহিত এক সংঘর্ষে শঙ্করমঙ্গল মারা যান। তখন মহেশমঙ্গলের বয়স মাত্র ষোল বৎসর। আলিবর্দি তাঁহাকে অনেক জমি দান করেন। নানারকম ব্যবসার সুযোগ করিয়া দেন। নবাব-অন্তঃপুরে যে সমস্ত জরির কাপড়, জরির ওড়না, জরি-খচিত জামা ব্যবহৃত হইত তাহা সরবরাহ করিবার ভার মহেশমঙ্গলকে দিয়াছিলেন তিনি। বর্গীর হাঙ্গামার সময় সুযোগ পাইয়াও মহেশমঙ্গল সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করেন নাই। তিনি শান্তিপ্রিয় নির্বিবাদী লোক ছিলেন। আলিবর্দির শাসনকালেই তিনি সর্পাঘাতে মারা যান। মহেশমঙ্গল পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধূর্জটিমঙ্গলও

একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন মহেশমঙ্গলের। তাঁহার অনেকগুলি ভগ্নী ছিল, জগদম্বা, দুর্গা, জয়া, শ্যামাঙ্গিনী, মহামায়া ও বারাহী। সেকালের কুলপ্রথা অনুযায়ী সকলেরই কুলীনের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল, প্রত্যেক কুলীনের ঘরে শতাধিক পত্নী ছিল, সুতরাং ধূর্জটিমঙ্গলের ভগ্নীরা কেহ পতিগৃহে গমন করেন নাই। টাকার লোভে পতিরাই মাঝে মাঝে পত্নীদের নিকট আসিয়া রাত্রিবাস করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের বংশবৃদ্ধিও হইয়াছিল। ধূর্জটিমঙ্গলের দুই যমজ পুত্র শম্ভুমঙ্গল এবং জটামঙ্গল পলাশীর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধূর্জটিমঙ্গলের তৃতীয়া পত্নী জগদ্ধাত্রী তাঁহাদের জননী ছিলেন। জগদ্ধাত্রীর পিতা রামলোচন নবাব দরবার হইতে খান উপাধি পাইয়াছিলেন। নবাব সরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁহার রূপসী যুবতী কন্যা জগদ্ধাত্রীর উপর নবাব সরকাবেব জনৈক সিরাজ-পারিষদের কু-নজর পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি ভয় পাইয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে সিংভূমের জঙ্গলে এক সাহেবের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দেন। সাহেব ব্যবসায়ী ছিলেন। নানারকম পশুচর্ম সংগ্রহ করিয়া তিনি বিলাতে চালান দিতেন। বিলাত হইতে আমদানী করিতেন বিলাতী মদ। নবাব দরবারে সে মদের খুব চাহিদা ছিল। দিল্লী এবং মুর্শিদাবাদে মদ বিক্রয় করিবার কেন্দ্র ছিল তাঁহার। কিন্তু তিনি বাস করিতেন সিংভূমের জঙ্গলে। তাঁহার জংলি কুঠি রক্ষা করিবার জন্য একদল বন্দুকধারী গোরা পাহারাদার ছিল। সাহেবের নাম ছিল জন। জন সাহেবের জংলি কুঠি বিখ্যাত স্থান ছিল ওঅঞ্চলে। জগদ্ধাত্রীর পিতা রামলোচন খানের সহিত জন সাহেবের আলাপ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে। রামলোচনের সহায়তাতেই তিনি নবাব সরকার হইতে ব্যবসায় করিবার অনুমতি লাভ করেন। এজন্য তিনি রামলোচনের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। রামলোচন একদিন গভীর রাত্রে সপরিবারে কয়েকটি পালকি করিয়া জন সাহেবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন আমাকে রক্ষা করতে হবে। আমার বিবাহিতা মেয়েকে আর ওদের নজরের সামনে রাখবার সাহস হল না। আগামী পূর্ণিমায় আমার জামাই আসবার কথা, কিন্তু তা আর হয়ে উঠবে না মনে হয়। কারণ ব্যাপারটা আমি গোপন রাখতে চাই।'

জন সাহেব লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। গালের দুই-ধারে জমকালো

মটন-চপ দাড়ি ছিল। রামলোচন যখন গেলেন তখন গভীর রাত্রি। জন সাহেব তখন তিনটি ওরাঁও যুবতীর গান শুনিতেছেন। একজন সম্মুখে, দুই জন দুই পাশে। চার জনই বেশ সুরাপান করিয়াছেন। রামলোচনের অভ্যাগমে রস-ভঙ্গ হইল। কুঠির বাহিরে কলরব শুনিয়া জন সাহেব বন্দুক লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ওরাঁও রমণী তিনটিও তিনটি শাণিত তরবারি লইয়া সাহেবের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। ইহারা শুধু সাহেবের প্রমোদ-সঙ্গিনী নহে, বডি-গার্ডও। বাহিরে বন্ধু রামলোচনকে দেখিয়া সাহেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার মুখে সব কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ভয় কি, আমি তোমাকে রক্ষা করব।' বলিলেন অবশ্য সাহেবী বাংলা উচ্চারণে। আমি সে বাংলা আমাদের উচ্চারণে লিখিলাম। কিন্তু রামলোচন যখন নিজের জামাতার কথা উল্লেখ করিলেন এবং সে আসিতে পারিবে না বলিলেন, তখন সাহেব ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন— 'হোয়াই? সে নিশ্চয়ই আসবে। বাধা কি? সে থাকে কোথায়, তার নাম কি বল।'

'নাম তার ধূর্জটি। থাকে বারাসতে। ওর সূতানুটিতে কিছু বিষয় আছে, মাঝে মাঝে সেখানে গিয়েও থাকে। এখন বারাসতে আছে।'

সাহেব ধূর্জটি নামটা কায়দা করিতে পারিলেন না। যাঁহারা গঙ্গাকে গ্যাঞ্জেস করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে শুদ্ধভাবে ধূর্জটি উচ্চারণ করা শক্ত। জর্জ শব্দটা তাঁহাদের পরিচিত। জন বলিলেন, "জর্জটিকে এখানে আসতে হবে। তাকে আনতে আমি আমার গোরাদের পাঠাব। সঙ্গে ঘোড়া ও পালকি থাকবে। ভয়ের কোনও কারণ নেই। ইউ সি দিস?"

বন্দুকটা তুলিয়া দেখাইলেন।

'এর ভয়ে সবাই কাবু'।

তাহার পর পকেট হইতে একটি মোহর বাহির করিয়া বলিলেন, 'আর এর কাছে সবাই জব্দ। আলিবর্দি দিল্লীর বাদশাহকে কয়েক কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে বাংলার মসনদে কায়েম হবার অনুমতি পেয়েছিল। জান?

"জানি না। আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর রাখি না'।

"বাট্ ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। জর্জটিকে আনতে যারা যাবে তাদের সঙ্গে বন্দুক আর মোহর দুইই থাকবে"।

একটি ওঁরাও মেয়ের দিকে চাহিয়া জন আদেশ করিলেন, 'রোমনি, তুমি দানিয়েলকে ডেকে আন।'

রোমনি মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল।

রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দানিয়েল কে?'

'দানিয়েল পর্তুগীজ। দুর্ধর্ষ জলদস্যু একজন। আগে ওদের হুগলীতে কুঠি ছিল। প্রবল প্রতাপ ছিল ওর বাবার। শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলা দেশে চলে আসেন তখন তিনি শাহজাহানকে নৌবহর দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু মমতাজ বেগমের দুটো বাঁদীর রূপে মুগ্ধ হয়ে কেলেঙ্কারী কাণ্ড করে ফেললেন ভদ্রলোক শেষকালে। তাদের অপহরণ করে বেইজ্জত করলেন। শাহজাহান ক্ষেপে গেলেন এই শুনে। তিনি হুগলীর সমস্ত পর্তুগীজদের বন্দী করে দিল্লী পাঠাবার হুকুম দিলেন। কিছু পর্তুগীজ অবশ্য পালাতে পেরেছিল।'

জনের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পুনরায় পকেট হইতে মোহরটি বাহির করিয়া বলিলেন—'এর জোরে। আমি পাঁচ হাজার মোহর ঘুষ দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছিলাম দানিয়েলকে এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। দানিয়েলের বাবার সঙ্গে আমার বাবার বন্ধুত্ব ছিল। আমার বাবা সবে তখন এদেশে এসেছেন। জাহাঙ্গীর বাদশার হুকুম মতো সবে তখন তিনি এদেশে ব্যবসা করবার অনুমতি পেয়েছেন। দানিয়েলের বাবা তখন খুব সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। লুটের মালপত্তর খুব সস্তা দামে বিক্রি করতেন তাঁর কাছে। সেই মাল বাবা বিলেতে চালান করতেন। তাই আমি যখন শুনলাম দানিয়েল বিপদে পড়েছে, তখন তাকে ছাড়িয়ে আনলাম। দানিয়েল এখন আমার বিশ্বাসী বন্ধু। তার উপরই জর্জটিকে আনবার ভার দিচ্ছি।'

রোমনি একটু পরেই দানিয়েলকে ডাকিয়া আনিল।

দানিয়েল গ্যাট্টাগোট্টা বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মুখে লাল গোঁফ দাড়ি। দেখলেই মনে হয় খুব ধূর্ত ও বেপরোয়া।

জন হাসিমুখে আগাইয়া গেল এবং দানিয়েলের সহিত করমর্দন করিয়া বলিল—'দানিয়েল, রোমনি তোমাকে একটি অনুরোধ করতে চায়। কিন্তু নিজে সে লজ্জায় সেটা বলতে পারছে না। তাই আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে— তোমাকে কিছু বলতে ও স্বভাবতই লজ্জা পায়।'

রোমনি মুখ ফিরাইয়া হাস্য গোপন করিল।

জন বলিতে লাগিল—'আমার বন্ধু রামলোচন তাঁর মেয়েকে এখানে এনেছেন নবাবের ভয়ে। তাঁর জামাই ভূর্জটি আছেন বারাসতে। সেই জামাইকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। আপনার মেয়ের নাম কি—'

রামলোচন বলিলেন, 'জগদ্ধাত্রী—'

'জাগ্‌ট্রি। রোমনির খুব ভালো লেগেছে জাগ্‌ট্রিকে। ওর ইচ্ছে জাগ্‌ট্রিব স্বামী এখানে আসুক। তুমি ছাড়া এ ভার কাকে দিই বল। রোমনি মুখ ফুটে তোমাকে বলতে পারছে না, তাই আমিই বলছি—,

দানিয়েল রোমনির দিকে এক নজর চাহিয়া দেখিল। তাহার পর রোমনিকে অভিবাদন করিয়া বলিল—'আই ক্যান প্লাক দি স্টাবস ফ্রম দি স্কাই ফর ইউ ডার্লিং।' তাহাব পর জনেব দিকে চাহিয়া বলিল—'রেস্ট অ্যাসিওর্ড, আই শ্যাল ব্রিং জর্জটি হিয়াব। হোয়্যাব ইজ হি?'

রামলোচন তাহাকে ধূর্জটিমঙ্গলেব ঠিকানা দিলেন।

দানিয়েল অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

রামলোচন জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি রোমনিকে এব মধ্যে জড়ালেন কেন—'

রোমনি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

'ওসব সাহেবেব ছুতা গো। চালাকি—'

জন হাসিমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পব বলিলেন—'শি ইজ রাইট। ইট্‌ ইজ্‌ এ ট্রিক। দানিয়েল রোমনিকে ভালবাসে। ওর প্রেমে দানিয়েলের নাক পর্যন্ত ডুবে গেছে। কিন্তু রোমনি ওকে আমোল দেয় না। আর আমাবও কড়া হুকুম বলাৎকার করা চলবে না। ওকে যদি রাজি করাতে পার, আপত্তি নেই। কিন্তু জবরদস্তি চলবে না। রোমনি রাজি হচ্ছে না, দানিয়েল হাবুডুবু—এই এখন অবস্থা। তাই রোমনির নাম দিয়ে অনুরোধটা জানালাম, দানিয়েল প্রাণ দিয়ে করবে। রোমনি এদের থাকবার ব্যবস্থাটা কোথায় করা যায়—রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরের কাছে আমাদের যে কুঠিটা আছে—'

'সেটাতে কেউ নেই। মন্দিরে ঝামরি আছে—'

জন রামলোচনকে বলিলেন—'ওইখানেই তোমরা থাকো। বেশ বড়

কুঠি। বড় হাতা আছে। পুকুরও আছে একটা। একটু দূরে রঙ্কিণীর মন্দির, সেখানে ঝামরি থাকে—'

'ঝামরি? সে আবার কে—'

'ঝামরি রঙ্কিণীর সেবায়েত। এমনি লোক বেশ ভালো। মাঝে মাঝে ওর ভর হয়। তখন অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে। শি বিকাম্‌স এ স্ট্রেঞ্জ ওম্যান। কিন্তু অন্য সময় খুব ভালো। তির্কির কি রকম আত্মীয় হয়, না?'

আর একটি ওরাঁও মেয়ে বলিল—'আমার পিসী। বাপের বুইন—'

'তুমিই তাহলে এদের নিয়ে যাও তার কাছে। আলাপ করিয়ে দাও—'

"আসেন। আপনিও সাহেব আসেন। আপনাকে পিসি খুব ভক্তি করে। বলে সাহেব রঙ্কিণী মায়ের সেরা ভক্ত। আপনাকে দেখলে পাগলী বড় খুশী হয়। আপনিও চলেন সঙ্গে'।

রামলোচন বলিলেন, "পাগলী না কি—"

"পাগলী না তো কি। কখনও কাপড় পরে, কখনও ন্যাংটা থাকে। মাথায় তেল দেয় না। কখনও কাঁচা মাংস খায়, কখনও পোড়া মাংস খায়। কখনও কাঁদে কখনও হাসে, কখনও নাচে কখনও দিনের পর দিন ঘুমায়। দিনের পর দিন উপবাস করে। পাগলীই তো। কিন্তুক ওর খ্যামতা আছে। দানিয়েল সাহেবের গুণ্ডা ভাইটাকে ঝামরিই তো খতম করলেক বাণ মেরে। বলেছিল খবরদার আমার যখন ভর হয় তখন এসে হাল্লা করবি না, করিস তো চিরতরে মুখ বন্ধ করে দেব তোর। দিলেক তো। আসেন আপনারা—"

রামলোচন, জন সাহেব এবং জগদ্ধাত্রী তির্কির পিছু পিছু গেলেন। রামলোচন ঝামরিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। ভয়ও পাইলেন একটু। রঙ্কিণীর মন্দিরের কাছে উলঙ্গিনী ঝামরি দাঁড়াইয়া ছিল। হাতে একটি পোড়া কাঠ। ঝাম্‌রি পীন-পয়োধরা তন্বী। পূর্ণ যুবতী। চোখ দুইটি বড় বড় এবং চোখের দৃষ্টি মর্মভেদী। মাথার চুল তৈল-বিহীন। মনে হয় যেন মাথায় চামর বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কুচকুচে কালো রং, যেন কালো পাথর কুঁদিয়া কোন প্রতিভাবান শিল্পী ঝামরিকে সৃষ্টি করিয়াছে। জন সাহেবকে দেখিয়া ঝাম্‌রি পোড়া কাঠখানা ফেলিয়া দিল। তাহার পর আগাইয়া আসিল। "কি গো সাহেব। তোমার রঙ্কিণীকে একটু শাসন কর না কেন।

সহজে মুখ খুলতে চায় না। কাল থেকে সাধ্যসাধন করছি, কিছুতেই উত্তর দেয় না। শেষে আজ নিমগাছের ডাল পুড়িয়ে ঠেঙালাম, তখন জবাব দিল।"

"কিসের জবাব চাও"—জন জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ইংরেজের সঙ্গে সিরাজের লড়াই হবে। জগা জানতে চায় সে যুদ্ধে কে জিতবে—"

"জগা কে—"

"জগৎ শেঠ গো। সে হরু পুরুতকে পাঠিয়েছে আমার কাছে। কাল থেকে উপোষ দিয়ে ধরনা দিচ্ছে বামুনটা আমার ঘরে। এদিকে রঙ্কিণী মুখ খোলে না। বড় বেয়াড়া হয়েছে আজকাল। ঠেঙালাম, তখন বললেক—ইংরেজরা জিতবেক।"

তাহার পর হঠাৎ জগদ্ধাত্রীর দিকে চাহিয়া ঝামৃরি বলিয়া উঠিল—"আরে ই কে—"

হাসিমুখে আগাইয়া আসিল তাহার দিকে। তাহার পর তাহার পেটে একটা খোঁচা মারিয়া—দুইটি আঙুল তুলিয়া দেখাইল। জগদ্ধাত্রীর গর্ভে যে যমজ সন্তান হইবে এই ইঙ্গিতই করিয়াছিল ঝামৃরি। কিন্তু তখন তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। পাগলীর কাণ্ড ভাবিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল সকলে। জগদ্ধাত্রী ভয় পাইয়া গিয়াছিল।

জন সাহেব বলিলেন—"এ মেয়েটি এখন সপরিবারে তোমার কাছেই থাকবে ওই কুঠিতে। ওঁর বাবা রামলোচন খান আমাদের বন্ধু লোক। সিরাজের আমলারা ওঁর মেয়ের উপর কু-নজর দিয়েছে। তাই পালিয়ে এসেছে তোমার কাছে। তোমার ভরসায়—',

ঝামরির চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে প্রখর হইয়া উঠিল।

"মিছা কথা বলছিস কি লেগে? ওরা আইছে তোর কাছে তোর ভরসায়। তুই তো একটা মরদের মতো মরদ। বরগিদের এখানে ঢুকতে দিস নাই। তোর কাছে আসবেই তো। বরগিরা যখন আমার বুইন খাজরিকে ধরেছিল তখন যদি তুই থাকতিস সে বেঁচে যেত। আমিও তোর কাছে পালিয়ে এসে বেঁচেছি। ওরাও থাক, আমি দেখাশোনা করব—সিরাজ ধ্বংস হবেক।"

২

জন সাহেবের আশ্রয়ে জগদ্ধাত্রী অনেকদিন ছিলেন। রামলোচন মাঝে মাঝে আসিয়া তাহার খোঁজখবর করিয়া যাইতেন। জগদ্ধাত্রীর স্বামী ধূর্জটিমঙ্গলও আসিতেন মাঝে মাঝে। শিকারে তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। বন্দুক দিয়া নিরীহ পশুপক্ষী শিকার করিতেন না তিনি। যাহারা করিত, তাহাদের তিনি বলিতেন, "পাখী-মারা বীর ওরা। মহাবীরই বলতাম, কিন্তু লাফিয়ে সমুদ্র পার হতে পারে না যে। কেবল দূর থেকে গুলি ছুঁড়ে নিরীহ পাখিগুলোকে মারে। বাঘের হাঁকাড় শুনলে ছুটে পালায়, কিন্তু নিরীহ খরগোশগুলোকে তাড়া করে তাদের মারে আর খেয়ে ফেলে। বীর ওরা, কিন্তু এখানেও মহাবীরের সঙ্গে তফাত আছে ওদের, কারণ মহাবীর মাংসাশী ছিলেন না। আমি বাঘ, ভালুক, নেকড়েদের মারি সম্মুখ যুদ্ধে, আর তারা যখন মারা পড়ে তখন তাদের মাংস আমি খাই না।" ধূর্জটিমঙ্গল সত্যই বড় শিকারী ছিলেন। হাতে একটা ছোট বল্লম এবং কাঁধে বেঁটে একটা শালকাঠের মুগুর লইয়া তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিতেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে বাঘ, ভালুক, নেকড়ে, চিতা প্রভৃতি শিকার করিতেন। প্রায়ই দেখা যাইত মুগুরের ঘায়ে তিনি শিকারের মাথাটা ফাটাইয়া দিয়াছেন, তাহার পর তাহার বুকে বিদ্ধ করিয়াছেন শাণিত বল্লমটা। জন সাহেবের কুঠিতে অনেকদিন ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা যখন বাংলার মসনদে বসিয়া পাশবিকতার পঙ্ককর্দমে নিজেকে অবলিপ্ত করিতেছিল, যখন তাহার কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের প্রকোপ হইতে হিন্দু মুসলমান ক্রীশ্চান কাহারও নিস্তার ছিল না, যখন সতীনারীদের আর্তনাদে, গুপ্তঘাতকের নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে নিহত নর-নারীদের অভিশাপে, ভীত রাজপুরুষদের জটিল ষড়যন্ত্রে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মীর ললাট ভ্রূকুটিকুটিল—ঠিক সেই সময় ধূর্জটিমঙ্গল সূতানুটি ত্যাগ করিয়া সিংভূমের জঙ্গলে জন সাহেবের কুঠিতে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আগে তিনি মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করিতেন, কিন্তু

ইংরেজদের সহিত নবাবের মনোমালিন্য যখন বেশ পাকিয়া উঠিল তখন তিনি সুতানুটিতে থাকা আর নিরাপদ মনে করিলেন না। কলিকাতার আশেপাশে থাকাটাও বিপজ্জনক মনে হইল তাঁহার। তিনি যখন সুতানুটিতে ছিলেন তখনই সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে বিভীষিকা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে, কারণ সে সময় তিনি ও ঝক্‌মারি সুতানুটি জঙ্গলের ভিতর আত্মগোপন করিয়াছিলেন। শুধু তিনি নয়, আরও অনেক লোকও 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই নীতি অনুসরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। ধূর্জটিমঙ্গল লোকমুখে যতটুকু শুনিয়াছিলেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন জন সাহেবের কাছে।

বলিয়াছিলেন—'সায়েব, নবাব ক্ষেপে গেছে। অনেকে বলছে, যে হোসেন কুলি খাঁকে উনি হত্যা করেছিলেন তারই ভূত না কি ওঁর কাঁধে ভর করেছে। তাই উনি পাগলের মতো কাণ্ড করছেন। কোলকাতায় তোমাদের যে বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল তা তো শেষ করে' দিলে লোকটা। শুনলাম তোমাদের বিরুদ্ধে খবর দিয়েছিল মেদিনীপুরের ফৌজদারী রাজরাম সিং। তোমরা যে বাগবাজারে কেল্লা করছ এ খবরটা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন নবাব। রাজরাম তাঁর ভাই নারান সিংয়ের হাতে চিঠি দিয়ে তোমাদের সব খবর নবাব বাহাদুরকে জানিয়েছে। নবাব বাহাদুর তাঁর মাসতুতো ভাই পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎজঙ্গের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছিলেন। নারান সিংকে বললেন তুমি ছদ্মবেশ ধরে' কলকাতায় যাও, আর ইংরেজদের সম্বন্ধে সব খবর যোগাড় কর। আমি শওকৎজঙ্গকে খতম করে' তারপর ইংরেজদের ব্যবস্থা করব। নারান সিং ফিরিওলার ছদ্মবেশে কলকাতায় এসে ঘুরতে লাগল। আমার কাছেও কাপড় বিক্রি করতে এসেছিল একদিন। এসেই বললে—কোলকাতার কোনও সায়েবের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে কি? আমাকে কোনও বড় সায়েবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন না। ওঁরা যে রকম আমীরী চালে থাকেন তাতে মনে হয় ওঁদের কাউকে খদ্দের পেলে আমার দামী মসলিনগুলো বেচতে পারব। আমি একটু ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করলাম—বললাম, সাহেবরা আমীরী চালে থাকেন না কি! ওরা তো বেনে, বনেদী বড়লোক তো নয়। 'ফেরিওলা বললে—আরে মশাই, বেনেই হোক আর

বনেদীই হোক, ওদের গাড়ি-ঘোড়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, চাকর বাকর, নাচ-মোচ্ছব দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় মশাই। আমাকে একটা সায়েবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন। আপনার ভাইপো জেমসের ঠিকানা বলে' দিলাম তাকে। আমি বুঝতেই পারিনি যে লোকটা গুপ্তচর। কিন্তু তার পর দিনই ধরা পড়ে গেল লোকটা। গভর্নর ড্রেক হুকুম দিলেন কান পাকড়ে বার করে দাও লোকটাকে কোলকাতা থেকে। কোলকাতা যখন তোমাদের জমিদারি তখন তোমরা তা দিতে পার। কিন্তু তবু আমার মনে হয় অতটা অপমান না করলেই চলত। এর ওপর গুজব শুনলাম গভর্নর ড্রেক নাকি সিরাজউদ্দৌলাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন যে, জগৎবল্লভের ছেলে শরণার্থী হয়ে এসেছে তাঁদের কাছে, তাকে তিনি নবাবের হাতে সমর্পণ করবেন না। নবাব নাকি তাই চেয়েছিলেন। এর পরেই নবাবের দেখা হল নারান সিংয়ের সঙ্গে। নবাব শওকৎজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন বলে' রাজমহল পর্যন্ত পৌছেছিলেন, নারান সেইখানে গেল আর তাঁর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল—হুজুর, জাঁহাপনা, খোদাবন্দ, আমার মানইজ্জত কিছু রইল না, আপনাব হুকুমে কলকাতায় গিয়ে ওই বেনেগুলোর হাতে অপমানিত হতে হল। আপনি একটা বিহিত করুন। কলকাতায় জমিদারি করে' ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ওরা আপনাকে নবাব বলে' আমোলই দেয় না। তখন নবাব সাহেবের মনে পড়ে গেল যে তিনি যখন বাংলার মসনদে নবাব হয়ে বসেন, তখন ইংরেজরা তাঁকে নজরানা দেয়নি তো। সত্যি ওদের বাড় খুব বেড়েছে, ওদের টিট্ করা দরকার। নবাব রাজমহল থেকে ফিরলেন। উদ্দেশ্য ইংরেজদের শায়েস্তা করা।'

জন সাহেব বলিলেন, "এত কাণ্ড হয়েছে তা তো জানি না। তারপর কি হল! নবাব এসে পড়ল কলকাতায়?

"পড়ল বলে' পড়ল। হৈ হৈ করে এসে পড়ল।"

"ইংরেজরা কোন বাধাই দিলে না—?"

"বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। নবাব আসছেন শুনে পেরিন বাগানের কাছে তোমাদের যে গড় ছিল সেইখানে গোটাকয়েক কামান এনে ফেলেছিল সাহেবরা। নবাবের একদল সৈন্য চিৎপুর খালের ধারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অত হাতী ঘোড়া বড় বড় কামান আর

পল্‌টন্‌ নিয়ে সে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না। পেরিন সাহেবের বাগানে পেরিন্স পয়েণ্টের ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে এনসাইন পিকার্ড নবাবের সৈন্যের সঙ্গে লড়ে' গেলেন। অনেক নবাব সৈন্য মারা গেল। বনে জঙ্গলে পালিয়ে গেল অনেকে। সেখানেও তাদের তাড়া করে' গেলেন পিকার্ড সাহেব। নবাব সাহেবের সেনাপতি ছিলেন মীরজাফর, তিনি পিছু হটতে লাগলেন। নবাব হয়তো হটেই যেতেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু উমিচাঁদের এক জমাদার জগন্নাথ সিং নবাবের ছাউনিতে গিয়ে হাজির হল। সে নবাবকে কলকাতায় ঢোকবার একটা গোপন রাস্তা দেখিয়ে দিলে। দমদম থেকে কোলকাতা আসবার রাস্তায়, প্রায় টালার কাছাকাছি একটা ছোট সাঁকো ছিল। গরু ঘোড়া চরাতে যেত ও অঞ্চলের লোক সেটার উপর দিয়ে। ইংরেজরা নবাবের আসবার খবর পেয়ে সব সাঁকো ভেঙে দিয়েছিল, এইটেই কেবল ভাঙতে ভুলে গিয়েছিল। এই ভুলের সুড়ঙ্গ দিয়ে নবাব কিছু সৈন্য নিয়ে কলকাতায় ঢুকল। পরদিন শেয়ালদার কাছে মারাঠা ডিচের উপরকার এক নীচু সাঁকো দিয়ে নবাবের বাকি সৈন্যরা হাতি ঘোড়া উট আর কামান সুদ্ধ এসে হুড়মুড়িয়ে পড়ল কোলকাতার উপর। প্রথমে বউবাজারে পড়ল, তারপর বড়বাজারে ঢুকে সমস্ত লুঠপাট করে' আগুন লাগিয়ে দিলে চারিদিকে। নবাব গেলেন হালসিবাগানে উমিচাঁদের বাগানবাড়িতে!"

জন সাহেব বলিলেন—"জর্জটি তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ। এক পেগ পোর্ট কি শেরি খাবে? ইট উইল পিক ইউ আপ—"

ধূর্জটি বলিলেন—"একপাত্র ভাং খাওয়াতে যদি পার খেতে পারি। মদ খাব না। ভাং আছে—?"

"আছে। আমার এখানে সব থাকে। বোয়—"

একটি চাপরাসী গোছের লোক আসতেই তিনি হুকুম দিলেন, জর্জটির জন্যে একগ্লাস মেওয়া ভাং নিয়ে এস'।

ধূর্জটি বলিলেন—"কোলকাতা থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়েছে নবাব সাহেব। ফোর্ট উইলিয়ম এখন নবাবের দখলে। কোলকাতার ইতর ভদ্র সব লোক পালিয়েছে। আছে কে জান?"

"কে?"

"গোবিন্দ মিত্তির—"

"ও, ছ্যাট্ ব্লাক জমিন্দার ? ইয়েস, হি ইজ এ টাফ্ নাট্।"

কিসমিস পেস্তা বাদামবাটা-মেশানো দুধ চিনি গোলাপজল দেওয়া একগ্লাস চমৎকার ভাং আসিয়া পড়িল। ঢকঢক করিয়া সেটা পান করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—'আঃ'—"

জন বলিলেন—আর এক. গ্লাস দেবে ?"

"না, আর চাই না। তোমার ভাইপো জেম্সের কিন্তু কোনও সংবাদ পেলাম না। শুনলাম সব সাহেবরা ফলতায় গিয়ে জমা হয়েছে। সেখানে যাওয়া গেল না। চারদিকে মিলিটারি পাহারা, বাইরের কোন লোকের যাওয়ার উপায় নেই"।

জন হাত খুলিয়া বলিলেন—"খামুস্। চুপ কর।"

জন মুর্শিদাবাদ দিল্লীতে ঘোরাফেরা করিয়া দুই চারিটা হিন্দী এবং উর্দু কথা শিখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে তাক মাফিক সেগুলি কথাবার্তার মধ্যে লাগাইয়া দিতেন।

ধূর্জটিমঙ্গলও হিন্দী-উর্দু বুঝিতেন। তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

জন কপালের মাঝখানে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটি ঠেকাইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত।

তাহার পর হাঁক দিলেন—বোয়্।

খানসামা আবার আসিল।

জন হুকুম দিলেন—হুইস্কি সোডা।

জন নীরবে উপর্যুপরি পাঁচ পেগ হুইস্কি পান করিয়া ফেলিলেন। তাহার পরও গুম হইয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

ধূর্জটিমঙ্গল তখন প্রশ্ন করিলেন—'সায়েব, কি হল তোমার !'

জন উত্তর দিলেন, "ঠিক করে ফেলেছি। আমি কয়েকজন গোরা সৈন্য নিয়ে আজই বেরিয়ে পড়ব জেম্সের খোঁজে। ফলতায় যাবো। দরকার হয় ইংরেজের সেনাদলে ভর্তি হয়ে সিরাজের সঙ্গে লড়ব। আমি যতদিন না ফিরি তুমি ততদিন এখানে থাক"।

'তার মানে ? তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ, যদি না ফের—'

'ওয়েট এ বিট'।

জন উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। একটু পরে একটি কাগজ হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

'এই নাও —'

'কি এটা'

'পড়ে দেখ'

'আমি ইংরেজি পড়তে পারি না।'

জন গড়গড় করিয়া পড়িয়া গেলেন। তাহার পর বাংলা করিয়া বলিলেন, 'এর মানে আমার সিংভূমের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি জাগ্‌ট্রি স্বামী জর্জটির তত্ত্বাবধানে রেখে আমি যুদ্ধে চললাম। আমাব অবর্তমানে এ বিষয়ের সমস্ত আয় জর্জটি ভোগ করবে। কুড়ি বছরের মধ্যে যদি আমি না ফিরি বা আমার ভাইপো জেম্‌স না ফেরে তাহলে জর্জটিই এ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবে। এখন বুঝলে? এতে রাজী তো?"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—'এখনই তাড়াহুড়ো করে যুদ্ধে না-ই গেলে? দু'দিন অপেক্ষা করেই দেখ না হাওয়া কোন দিকে বয়—'

জন সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'নো নো নো। আই ক্যানট ওয়েট এ মোমেণ্ট। জেমস আমার প্রিয় ভাইপো, আমাদের একমাত্র বংশধর। তার খোঁজে আমাকে এখনই বেরুতে হবে। তুমি এখানে থাকো। আর এই দলিল তুমি রাখ—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—'দলিলে তুমি আমার এবং আমার স্ত্রীর যে নাম লিখেছ তা ঠিক নাম নয়। আমার নাম ধূর্জটি, আমার স্ত্রীর নাম জগদ্ধাত্রী, তুমি লিখেছ —'

তাহাকে থামাইয়া দিয়া জন বলিলেন—'অল্ রাইট, তুমি বাংলায় একটা দলিল লিখে ফেল, আমি তাতে সই করে দিচ্ছি।'

ধূর্জটিমঙ্গল জন সাহেবের সহিত তাঁহার আপিসঘরে গেলেন এবং বাংলায় দলিলটি লিখিয়া ফেলিলেন।

তাহার পর সাহেব বলিলেন, "যাওয়ার আগে ঝামরির সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব। সে কি বলে শোনা যাক"।

ঝামরি মন্দিরের কাছেই আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া ঘুমাইতেছিল। অনেক

ডাকাডাকিতেও সে উঠিল না। সাড়া পর্যন্ত দিল না। মুখের ঢাকা যেমন ছিল তেমনি রহিল।

জন সাহেবেব সঙ্গিনী তিন জন সাহেবের হাঁকডাক শুনিয়া বাহির লইয়া আসিল।

সাহেব বলিলেন—'ঝামরিকে ডেকে তোল। আমি কলকাতা যাব। ওর সঙ্গে দেখা ক'বে যাই'।

তির্কি প্রশ্ন করিল—'কোলকাতা যেছ কেন?'

'নবাবেব সঙ্গে লড়াই কবতে'।

'ওমা! কি হবেক গো! লড়াই করতে?'

রোমনি বলিল—'আমরাও যাব তুব সঙ্গে'।

শাউনিও বলিল—'হাঁ, আমবাও যাব। আমরাও লড়ব নবাবের সঙ্গে—'

জন সাহেব হাসিমুখে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পব বলিলেন—'তোবা পারবি না।'

তিন জনই সমস্বরে বলিল—'খুব পারব।'

জন সাহেব আবার খানিকক্ষণ হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—'তবে চল। দানিয়েল কিন্তু এখানে থাকবে। ওর দেখাশোনা করবে কে—'

'কেন কস্তুবী আছে, লালীর সঙ্গেও দানিয়েল জমাইছে খুব। ওর জন্যে ভামনা করিও না। ও মিনসা খুব তালেবর—' বলিতে বলিতে রোমনি হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

'আচ্ছা তাহলে ঝামরিকে ওঠা—'

'ও এখন উঠবেক নাই। ওর ভর হইছে—'

সাহেব বলিলেন—'বেশ ওর ভর নামুক। তারপর আমি যাব। ততক্ষণ সব ঠিকঠাক করি। কালো পলটনরা এখানে থাকবে। আমি গোরাদের নিয়ে যাব। পাঁচটা ঘোড়া এখানে থাকবে, বাকিগুলো আমি নিয়ে যাব। তোরা পুরুষের বেশে ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে পারবি তো?"

তিনজনেই সমস্বরে উত্তর দিল—'হুঁ—অ,

"তবে তৈরি হয়ে থাক। কালো পলটনদের জামা আর পাতলুম পরে

নে তোরা। কাল দশটায় বেরুব আমরা। ততক্ষণ ঝামরির ভর নেমে যাবে"।

ঝামরি তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল।

বলিল—'তুই এখনই বেরিয়ে পড়। ছুপহর রাতে যখন কালপেঁচাটা ডেকে উঠবে সেই সময় বেরিয়ে যাবি। তাহলে কোন বিপদ হবেক নাই। ওর ডাকই তোকে আগলাবেক। ওই নবাবটাকে ধরে তার নাক কান কেটে দিয়ে আয়। আজই ও দান শা ফকিরের নাক কান কেটেছে। বড় ভালো ছিল লোকটা। মরে নাই, এখনও বেঁচে আছে। আমি রঙ্কিণীর সিঁছুর মনসাপাতায় দিব। সেটা লাগাতে বলিস, ঘা সেরে যাবেক।'

জন প্রশ্ন করিলেন—'এত খবর তুমি জানলে কি করে' ঝামরি?'

'আমার ভব হইছিল যে। রঙ্কিণী আমাকে ব'লে গেল।'

'আমার ভাইপো জেম্‌সের খবরটাও নাও না'।

'খবর জানি। কিন্তুক বুলব না—'

তাহার পর হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল সে। তাহার ভ্রূকুটিকুটিল মুখ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, মনে হইল চক্ষু ছুইটি বুঝি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। রঙ্কিণী মন্দিরের দিকে ছুই হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—'ওই রক্তখাকীকে শুধা। ও নরবলি চায়। বলে তুবা না দিবি তো আমি জোগাড় করে লিব'।

ঝামরি হনহন করিয়া মন্দিরের পিছনে জঙ্গলের ভিতর চলিয়া গেল, আর ফিরিল না।

সেদিন মধ্যরাত্রে পেচক ডাকিয়া উঠিল বু-ওম, বু-ওম, বু-ওম। জন তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সন্ধ্যা হইতে ক্রমাগত মদ্যপান করিয়া তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রোমনি আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল—'সাহেব উঠ উঠ! প্যাঁচাটা চেঁচাচ্ছে। উঠ, যাবার সময় হল—,

সাহেবের সাড়াশব্দ নাই।

রোমনি তখন ঠেলা দিল তাঁহাকে। নও

'প্যাঁচাটো ডাকছে গো, উঠ উঠ—' বারণ

'ড্যাম ইওর প্যাঁচা। লেট মি স্লীপ। কাল সকালে যাব। এখন—' নের সঙ্গে

—'। জন পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন। ত হবে না।

পরদিন সকালে যখন তাঁহার ঘুম ভাঙিল তখন চারিদিকে রোদ উঠিয়া গিয়াছে।

জন সসৈন্যে যাত্রা করিলেন কলকাতার দিকে।

রোমনি, শাওনি এবং তির্কিও পুরুষের বেশে ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহার অনুগমন করিল।

৩

জন আর ফেরেন নাই। ধূর্জটিমঙ্গলও কিছুদিন পরে সিংভূমের জঙ্গল ত্যাগ করিয়া কলিকাতার দিকে রওনা হইয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার ঘরবাড়ি বিষয়-সম্পত্তি ছিল, সেগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল। তিনিও অনেকদিন ফিরিলেন না। তাঁহার অবর্তমানেই জগদ্ধাত্রী দুইটি যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। দানিয়েল সাহেব জগদ্ধাত্রীকে নিজের কুঠিতে লইয়া গিয়াছিলেন। দানিয়েল সঙ্গিনী প্রসব করাইয়াছিল শিশু দুইটিকে। দুইটিই পুত্রসন্তান। কস্তুরীকে যদিও দানিয়েল বিবাহ করে নাই, কিন্তু কস্তুরীই দানিয়েল-সংসারের কর্ত্রী ছিল। সে যাহা বলিত তাহাই হইত; সে যাহা চাহিত তাহাই পাইত। সে যখন বলিল—যখন দুটো ছেল্যা হইছে, তখন আমি একটা লিব, লালী একটা লিক। সেই নামকরণ করিল তাহাদের: একটার নাম দিল খাম্বা, আর একটার নাম দিল খুঁটি। কস্তুরী খাম্বার পরিচর্যা করিত, আর লালী খুঁটির। জগদ্ধাত্রী একদিন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তোদের ছেলেমেয়ে হয়নি কেন? কস্তুরী হাসিয়া জবাব দিল—'আমাদের যে বিয়া হয় নাই গো। আমরা সায়েবের।, কিন্তুক সায়েবটা যে বুড়া আর বেয়ারামি। আমাদের ছেলেপুলে হবেক নাই। তোর ছেলেই আমরা পালব।'

ঝকমারি পিসী, ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত আসিয়াছিল। সে বলিল—নিয়ে তোরা ...া ওদের মানুষ কর; তোমাদের দেওয়া নাম খাম্বা আর খুঁটি ... তিনজ... থাকতে পারে, কিন্তু ওদের বংশে সকলের নামের শেষে ... "তবে তৈ...

থাকে। তাই ওদের ভালো নামও রাখতে হবে।' সেই ছেলে দুটির নামকরণ করিল—শম্ভুমঙ্গল, আর জটামঙ্গল।

ঝকমারি পিসীর একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। সে রক্তসম্পর্কে ধূর্জটিমঙ্গলের ভগ্নী নয়। ধূর্জটিমঙ্গলের পিতামহ শঙ্করমঙ্গল ডাকাতের সর্দার ছিলেন। এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার দলে ভোজপুরের এক বিহারী ডাকাত ছিল, নাম ঝঙ্কার সিং। বিপুলকায় শক্তিমান লোক। একাই দশজনের মহড়া লইতে পারিত। কিন্তু এই পালোয়ান লোকটাই ডাকাতি করিতে গিয়া একদিন মারা গেল। যে বাড়িতে ডাকাতি হইতেছিল সেই বাড়িরই একটি যুবতী মেয়ে একটি কুড়ুল দিয়া আঘাত করিল ঝঙ্কার সিংকে। তাহার মাথা দু'ফাঁক হইয়া গেল। ঝঙ্কার সিং মারা যাইবার পর শঙ্করমঙ্গল তাঁহার একমাত্র সন্তান রাজমণিকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিলেন। রাজমণি তখন বিধবা, কিন্তু অন্তঃস্বত্ত্বা। রাজমণির মা আগেই মারা গিয়াছিলেন। রাজমণি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিয়া মারা গেল। শঙ্করমঙ্গল তাহার নাম রাখিলেন ঝঙ্কারিণী। ধূর্জটি-মঙ্গলের মা অর্থাৎ মহেশমঙ্গলের স্ত্রী মানুষ করিয়াছিলেন ঝঙ্কারিণীকে। কিন্তু শিশু ঝঙ্কারিণী সকলের জীবন নাকি অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। দিনরাত চীৎকার করিত। ধূর্জটিমঙ্গলের মা সুবর্ণময়ী তাহার নামটা একটু বদলাইয়া ঝকমারিতে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন। পোশাকী ঝঙ্কারিণী নামটা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ঝকমারী নামটাই টিকিয়া ছিল শেষ পর্যন্ত। খাম্বা ও খুঁটির যখন জন্ম হয় তখন ঝকমারি পিসি যুবতী। বয়স ষোল বৎসর। তাহার চোখমুখে বাঙালী মেয়ের কমনীয়তা ছিল না, ছিল কেমন যেন একটা পুরুষালি ভাব। অবলীলাক্রমে বড় বড় গাছে উঠিতে পারিত, সাঁতারে তাহার জোড়া কেহ ছিল না, মারপিটেও অদ্বিতীয়া ছিল ঝকমারি। তাহার মেয়ে সঙ্গী বড় একটা কেহ ছিল না, পুরুষ সঙ্গীই বেশী। কপাটি খেলা, ধাপসা খেলা এমন কি কুস্তিতেও তাহাকে কেহ হারাইতে পারিত না। বৌদিকে—ধূর্জটিমঙ্গলের স্ত্রী জগদ্ধাত্রীকে সে বড় ভালবাসিত। ভয়ও করিত। তিনিই কিছুদিন আগে তাহাকে পুরুষ সঙ্গীদের সহিত মিশিতে বারণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—তুই মেয়ে ছেলে, তুই বেটাছেলেদের সঙ্গে কুস্তি করবি ? তোর লজ্জা করে না ? তোকে আর ওদের সঙ্গে মিশতে হবে না।

ঝকমারি বলিল—'বাঃ আমি কি করব তাহলে—'

'তুই আমার ঠাকুরঘর নিয়ে থাক। তারপর বিয়ে হলে শ্বশুরঘর করবি—'

'ইস আমি বিয়ে করবই না।'

'তোর দাদা যা ঠিক করবে তাই হবে। তোর দাদা বলেছে ভোজপুরী সিপাহীর সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে। অযোধ্যার নবাবের পলটনে সে নাকি কাজ করে।'

ঝকমারি আবার মাথা নাড়িয়া বলিয়াছেন—'আমি বিয়ে করবই না।'

কিন্তু জগদ্ধাত্রীর কথা সে অমান্য করে নাই। জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরঘরের ভার সে লইয়াছিল। জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরঘরে অনেক ঠাকুর। শিব, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, গণেশ তো আছেনই। আরো সব ছোট বড় নুড়ি আছে অনেক। কোনটা মা শীতলা, কোনটা ওলা বিবি, কোনটা পাষাণপুরের শিব, কোনটা হরিঘাটার জাগ্রত পীর সাহেবের কবরের নিকট কুড়াইয়া পাওয়া পাথর, কোনটা ইতু লক্ষ্মী, কোনটা তুষু ঠাকুরণ, কোনটা মা ষষ্ঠী—এই রকম অনেক। সমবেতভাবে ইহাদের সকলেরই পূজা করিত জগদ্ধাত্রী। ঠাকুরদের ভোগ দিয়া প্রত্যহ প্রসাদ বিতরণ করিত সে। এই ঠাকুরঘরের ভার লইয়াছিল ঝকমারি। ঘরটা পরিষ্কার করিত দুইবেলা, ফুল তুলিত, ফল কুঁচাইত, চন্দন ঘষিত। ধূপধুনা জ্বালাইত। এই ঠাকুরঘর শেষে তাহাকে পাইয়া বসিল। ঠাকুরঘরে বসিয়া সে আপনমনে মালা গাঁথিত, রামায়ণ পড়িত, গানও গাহিত। এই ঠাকুরঘরে বসিয়াই সে একদিন আত্ম আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহার পূর্বজন্মের জীবন সহসা একদিন ছবির মতো ফুটিয়া উঠিল তাহার মানসপটে। ছবিটা অনেকক্ষণ ধরিয়া সে নিজেই দেখিল। তাহার পর জগদ্ধাত্রীকে গিয়া বলিল ঘটনাটা।

"বৌদি আজ ভারী একটা মজার কাণ্ড হয়ে গেল ঠাকুরঘরে বসে'। আমি আর এক জন্মে ফিরে গিয়েছিলাম। কি যে সব দেখলাম স্বচক্ষে—"

"কি দেখলি—"

ঝকমারি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"উঃ, কোথায় চলে' গিয়েছিলাম—'

'কোথায়?'

'আমেদনগরে। সেখানে বাদশাহী তাঁবুতে বুড়ো সম্রাট আলমগীর, বিছানায় শুয়ে হাঁপাচ্ছেন। আমি তাঁকে হাওয়া করছি।'

'তুই ?'

'হ্যাঁ আমি। আমি তখন ঝকমারি নই, আমি শাহানসার বাঁদী রাবেয়া। বাদশাহ দাক্ষিণাত্য থেকে শাহাজানাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু আমেদনগরে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। পা দু'টো ফোলা ফোলা, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, ক্রমাগত কাশছেন। হাকিম সাহেব জবাব দিয়ে গেছেন। বাদশাহ তাঁর পেয়ারের ছোটছেলে কামবক্সকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেই বললেন তোমাকে বিজাপুরের নবাব করে' দিলাম, তুমি এখনই সৈন্যসামন্ত নিয়ে নবাবের মর্যাদা অনুসারে শোভাযাত্রা করে বিজাপুরের উদ্দেশে বেরিয়ে সেখানকার সিংহাসন দখল কর।'

ঝকমারি আবার চুপ করিল।

'তারপর ?'

"কয়েকদিন নিঃঝুমের মতো পড়ে রইলেন। সাতদিন পরে ডাকলেন আর এক ছেলে আজিম শাকে। তাঁকে বললেন, তুমি মালওয়া চলে যাও। সেখানকার নবাব হও তুমি। তবে খুব তাড়াতাড়ি যেও না। রোজ পাঁচ ক্রোশ যাবে, তার বেশী নয়। এখনি বেরিয়ে পড়, দেরি কোরো না। আমি এখানেই বিশ্রাম করি। আজিম শাও চলে গেলেন। তখন আমি খোজা পয়গম্বরকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, 'এ সময়ে উনি ছেলেদের দূরে পাঠিয়ে দিলেন কেন ?' খোজা পয়গম্বর অনেকদিনের পুরানো লোক, আমাকে মেয়ের মতো ভালবাসত। খোজা চুপিচুপি বললে—বাদশা নিজের বুড়ো বাপকে কয়েদ করেছিলেন। তাই তাঁর ভয় হয়েছে তাঁর ছেলেরাও যদি তাই করে। সেইজন্য ওদের সরিয়ে দিলেন দূরে। চালাক লোক তো—"

ঝকমারি চুপ করিয়া গেল আবার। ফ্যালফ্যাল করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

'থেমে গেলি কেন ? তারপর কি হল—

ঝকমারি যেন আপন মনে বলিতে লাগিল—'আলমগীর মরে গেছে। কফিনে পুরে ফেলা হয়েছে তাঁর দেহ। আজিম শা কফিনটা কাঁধে তুলে কিছুদূর এগিয়ে গেল। তারপর রেখে দিল সেটা।'

আবার চুপ করিল ঝকমারি। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল।.... 'আওরাঙ্গাবাদে পাটিয়ে দেওয়া হল বাদশার দেহ। সেখানেই কবর দেওয়া হল তাঁকে। কুরবানিও হল। আজিম শা নিজেকে বাদশা বলে ট্যাঢরা পিটিয়ে দিলে চারদিকে। তারপর নিজে সিংহাসনে উঠে বসল—'আমি ছিলাম আলম গীরের বাঁদী, হয়ে গেলাম আজিম শার। সিংহাসনে উঠে আজিম শা অনেক খেলাত বখশিস দিলে সবাইকে। আমিও পেলাম একটা দামী মসলিনের ওড়না আর পঞ্চাশ আসরফি। নাচগান আমোদপ্রমোদের তুফান বইতে লাগল। কিন্তু এত সুখ সইল না বেশী দিন। আলমগীরের আরও তিনজন ছেলে খবর পেলেন যে বাদশা খুব অসুস্থ। ছোটছেলে কামবক্স ছিলেন বিজাপুরে। আলমগীর তাঁকে বিজাপুরের শাসনকর্তা করে গিয়েছিলেন। তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হলেন তিনি। আজিম শা তাঁকে আরও কিছু জমিদারি দিলেন, নিজের নামে টাকা তৈরি করবার অনুমতি দিলেন, তাঁর নামে খোতবাও পড়া হ'তে লাগল মসজিদে মসজিদে। কিন্তু বাদশার বড়ছেলে, সুলতান মোয়াজ্জিম বাগ মানলেন না সহজে। তিনি কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন আলমগীরের মৃত্যু সময়ে, তাঁর মেজছেলে আজিমউস্‌সান ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। এঁরা দু'জনে মিলে যাত্রা করলেন আমেদনগরের উদ্দেশ্যে। একবারাবাদে এসে মোয়াজ্জিম খবর পেলেন বাদশা মারা গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে সম্রাট বলে' ঘোষণা করলেন। তারপর তিনি চিঠি লিখলেন আজিম শাকে—বাবা তোমাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা করে' গেছেন, তুমি তাই নিয়ে যদি সন্তুষ্ট থাক আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি যদি হিন্দুস্থানের সিংহাসনের লোভ কর তাহলে তোমার ভাল হবে না। খোজা পয়গম্বর খবরটি সংগ্রহ করে এনে চুপিচুপি বললেন আমাকে। তারপর বললেন—এইবার বেধে গেল।

ঠিক তাই হল। আজিম শা উত্তর দিলেন—এক সিংহাসনে দু'জনের স্থান নেই। সত্যিই তারপর যুদ্ধ বেধে গেল। সৈন্যসামন্তরা চলতে শুরু করল একবারাবাদের দিকে। আমাদের তাঁবুও চলল তাদের পিছু পিছু। নানারকম গুজব শুনতে লাগলাম। একদিন শুনলাম সুবে বাংলা থেকে দেওয়ান যে এক কোটি টাকা রাজস্ব দিল্লীতে পাঠাচ্ছিলেন

আজিমউস্‌সান নাকি সেটা আটক করেছেন। আরও শুনলাম তিনি বিদরবখ্‌তের শ্বশুর একবারাবাদের শাসনকর্তা মোক্তার খাঁকে বন্দী করেছেন। মোক্তার খাঁ আজিম শার বন্ধু ছিলেন। তিনি আজিমউস্‌সানের তম্বি গ্রাহ্যই করলেন না।

এর পরই সুলতান মোয়াজ্জিম, তাঁর বড়ছেলে মুয়াজিদ্দিনকে নিয়ে এসে পড়লেন একবারাবাদে। সুলতান মোয়াজ্জিমেব সৈন্যরা মাইনে পায়নি বলে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। আজিমউস্‌সান যে কোটি টাকা আটকে ছিলেন তা তাঁর বাবাকে দিলেন। তাঁর বাবা সে টাকা দিয়ে সৈন্যদের মাইনে তো মিটিয়ে দিলেনই, আরও অনেক দান খয়রাৎও করলেন। তারপর যুদ্ধ লেগে গেল। আজিম শার আফগান সেনাপতি মুনেব্বর খাঁর পাঁচ হাজার আফগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুলতান মোয়াজ্জিমেব উপর। কিন্তু কিছুই হল না। আজিম শা হেবে গেলেন। শুধু তাই নয় মারা গেলেন তিনি। মুনেব্বর খাঁও মারা পড়লেন। আমরা সবাই বন্দী হলাম। আমি তাঁবুতে চুপ করে' বসে আছি এমন সময় সুলতান মোয়াজ্জিমের একটা মাতাল সৈন্য আমার তাঁবুব সামনে এসে চীৎকার করে বললে—ওই বাঁদীটাকে আমার শোবার ঘরে পাঠিয়ে দাও। খোজা পয়গম্বর তাঁবুতে ঢুকল। আমি তার পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমাকে বাঁচাও। খোজা বললে—বাঁচবার একটি উপায়ই আছে। বললাম, সেই উপায়ই আমাকে বলে' দিন। খোজা তৎক্ষণাৎ খাপ থেকে তলোয়ার বাব করে আমার গলাটা কেটে দিলে। দড়াম করে' পড়ে গেলাম আমি....মবে গেলাম—'

হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল ঝকমারি।

'কিন্তু আমি মরিনি তো। এই তো একটু আগে তোমার ঠাকুরঘরে ঠাকুরের ভোগ রাঁধছিলাম। মনে মনে ডাকছিলাম, দাদা এবার ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের গোলযোগ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কি যে হচ্ছে কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। দাদা ফিরলে নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু বৌদি আমি এখনি যেটা দেখলাম সেটা কি সত্যি? সত্যিই কি আমি রাবেয়া ছিলাম বাদশা আলমগীরের সময়! কিন্তু যা দেখলাম তা তো স্বপ্ন নয়, জেগে জেগে স্বচক্ষে দেখলাম—'

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—'মাথা খারাপ হ'য়ে গেলে লোকে জেগে জেগেও

অনেককিছু আজগুবি দেখে। আমাদের গাঁয়ের নবু ঠাকুর বলতেন আমি গত জন্মে সরফরাজ খাঁ ছিলাম, আমাকে তোমরা কুর্নিশ কর। তোরও হয়তো মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তোর দাদা ফিরুন তখন তোর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে একটা। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—'

'আমি বিয়ে করবই না—'

এক বৎসর পরে ধূর্জটিমঙ্গল ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন নীলাম্বর রায়, ধূর্জটিমঙ্গলের বন্ধু! তাঁহারা খবর আনিলেন। ক্লাইভ মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। নবাবের সহিত এইবার যুদ্ধ হইবেই। চতুর্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে।

নীলু রায় ছোটখাটো খর্বাকৃতি ব্যক্তি। রং কালো। চোখ দুইটি ছোট ছোট। মুখে চাপদাড়ি। চোখের দৃষ্টিতে ধূর্তামি মাখানো। অথচ কেমন যেন কাতর দৃষ্টি। সর্বদাই মৃদু মৃদু হাসেন এবং চাপদাড়িতে হাত বোলান। জংলি কুঠিতে যেসব কালা পলটন জন সাহেব রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের ক্যাপ্টেন সরদার মাখনলালের সহিত নীলু রায়ের বন্ধুত্ব জমিয়া গেল। মাখনলালকে নীলু রায় ক্লাইভের খবর সবিস্তারে সব বলিলেন। সর্বঘটে যেমন কাঁঠালি কলা থাকে নীলু রায়ও তেমনি সর্বঘটে বিরাজ করিবার ক্ষমতা রাখিতেন। তিনি কলিকাতায় নবাব নিয়োজিত শাসনকর্তা মাণিকচাঁদের দরবারে যেমন অনায়াসে যাতায়াত করিতেন তেমনি অনায়াসে যাতায়াত করিতেন ফলতায় ইংরেজ মহলে। নীলু রায়েব মাধ্যমে মাণিকচাঁদ অবৈধ উপায়ে লোকের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করিতেন। ফলতায় ইংরেজরা বড় দুর্দশার মধ্যে ছিলেন। ভালো খাওয়া জুটিত না, মদ পাওয়া যাইত না, তাহার উপর আর এক বিপদ হইয়াছিল ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখ। নীলু রায় মাণিকচাঁদের অগোচরে ইংরেজদের খাবার, মদ এবং ঔষধ সরবরাহ করিতেন। কবিরাজী এবং হেকিমি ঔষধও পাঠাইয়া দিতেন তাহাদের জন্য। অনেক সময় ইহাতে বেশ উপকারও হইত। নীলু রায়ের মাধ্যমে কলিকাতার অনেক বড়লোক ইংরেজদের টাকাও ধার দিতেন। বরের ঘরের মাসী এবং কনের ঘরের পিসী হইয়া নীলু রায় দুই পক্ষেরই হাঁড়ির খবর সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকাতে মাখনলালকে ক্লাইভের আগমনের যে বর্ণনাটা

তিনি দিলেন সেটা মিথ্যা নয়। আর একটা কথাও গোপনে তিনি বলিলেন যে যদিও মাণিকচাঁদ আপাতদৃষ্টিতে নবাবের লোক কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনিও ইংরেজদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাহা হইলে ইংরেজরা ফলতাতেও থাকিতে পারিতেন না। কারণ ফলতাও নবাবের রাজত্বের মধ্যে। মাণিকচাঁদ খামখেয়ালী নবাবকে ভয় করেন, মনে মনে বোধহয় ঘৃণাও করেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন ইংরেজদের। সাধারণ লোকেদের সহিত ইংরেজদের ব্যবহার খুব ভালো। তাঁহারা পয়সা দিয়া জিনিস কেনেন, তাঁহাদের সৈন্যরা সাধারণ লোকদের বাড়িঘর সম্পত্তি লুট করেন না। ন্যায়ের প্রতি তাঁহাদের প্রবল নিষ্ঠা। কথার খেলাপ করিবার লোক তাঁহারা নহেন। এইসব কারণে মাণিকচাঁদ ইংরেজদের বিশ্বাস করেন। অবশ্য বাহিরে বাহিরে তাঁহাকে দেখাইতে হয় যে তিনি নবাবের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তিনি বজবজে যদিও ক্লাইভের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু সেটা লোক দেখানো যুদ্ধ।

মাখনলাল জিজ্ঞাসা করিল—'ক্লাইভ লোকটা কে বল তো? এর নাম তো আগে শুনিনি—'

'ক্লাইভ সাধারণ লোক নয়, ওস্তাদ লোক, সাংঘাতিক লোক। আসল আসরফি। ছিল মাদ্রাজ আপিসের কেরানী, এখন কর্নেল। কেরানীর কাজ মোটে ভাল লাগত না ওর, দিক্ হয়ে তাই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। তু'বার নিজের মাথা লক্ষ্য করে' রিভলভার ছুঁড়েছিল, কিন্তু একবারও গুলি লাগল না। মনে হয় স্বয়ং মা কালী ওর সহায়। ও সোজা লোক নয় মাখনলাল, আসল জাত সাপ—'

"কিন্তু কেরানী থেকে কর্নেল হল কি করে—"

"দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল যে ইংরেজদের। তাই অনেক কেরানীকে তারা সেনাদলে বহাল করে' ফেললে। সেই সময় ক্লাইভ কলম ছেড়ে ধরল তলোয়ার। লড়ল তুপ্লেক্সের সঙ্গে। অনেক যুদ্ধে জিতে নাম কিনে ফেললে ছোকরা। হু হু করে কর্নেল হয়ে গেল। এখন তো ওই সর্বেসর্বা। ও যেরকম জাঁকজমক করে' এসেছে কি হবে শেষ পর্যন্ত ভগবানই জানেন—"

"জাঁকজমক মানে?"

"ক্লাইভের সঙ্গে এসেছেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন্ পাঁচখানা যুদ্ধজাহাজ নিয়ে, দু'খানা জাহাজ যদিও মাঝপথে লোপাট হয়েছে তবু যা এনেছেন তা প্রচুর। তার ওপর আছেন মেজর কিলপ্যাট্রিক। দুঁদে লড়িয়ে একজন দেশী সিপাইদের ক্যাপ্টেন। ক্লাইভ ফলতা থেকে মাণিকচাঁদকে, শুধু মাণিকচাঁদকে কেন স্বয়ং নবাবকেও এমন চিঠি ঝেড়েছে যে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে সকলের—"

"কি চিঠি—"

"চিঠি আমি দেখিনি। কিন্তু তার মর্ম হচ্ছে, মানে মানে কলকাতা ছেড়ে চলে যাও। তা না হলে যুদ্ধং দেহি। মাণিকচাঁদ হয়তো ভেগে পড়ত কিন্তু নবাবের বিনা অনুমতিতে সেটা করা সম্ভব নয়। তাই পালালেন না। শিবপুরের দুর্গটা মেরামত করে' সেনাসামন্ত নিয়ে বজবজে গিয়ে ইংরেজের রাস্তা আগলে বসে' রইলেন। কিন্তু যখন ক্লাইভ আর মেজর কিলপ্যাট্রিক এসে হাজির হলেন তখন আধঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ খতম। একটা গুলি মাণিকচাঁদের মাথার পাগড়িটাই উড়িয়ে নিয়ে গেল। এক ছুটে তিনি কলকাতায় গিয়ে হাঁফ ছাড়লেন। তাঁর সৈন্যরা ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়ল বজবজের দুর্গে। ওয়াটসন ছিলেন জাহাজে। সেখান থেকে দুটি গোলা ফেললেন তিনি। প্রকাণ্ড গোলা। এই গোলার দাপটে বজবজের ফুটফাট গোলাগুলি একদম বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল মাণিকচাঁদের সৈন্যরা দুর্গের ভিতর। ক্লাইভ ঠিক করেছিলেন সকালে এসে দুর্গটি দখল করবেন। কিন্তু রাত্রে একটা ভুতুড়ে কাণ্ড হয়ে গেল"।

"ভুতুড়ে কাণ্ড? কি রকম?"

"রাতদুপুরে দেখা গেল দুর্গের দেওয়ালের উপর চড়ে' কে যেন খনখনে গলায় বলছে—এ দুর্গ আমাদের। তোমরা অবিলম্বে পালাও। যদি না পালাও তাহলে তুলকালাম কাণ্ড করব আমি। জন দুই নবাবের সেপাই বেরিয়ে এসে তম্বি করতে গিয়েছিল। ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে' মেরে ফেললে একজনকে। দেখা গেল তার হাতে একটা খাঁড়াও রয়েছে। দ্বিতীয় সেপাইটার মুণ্ড সে এক কোপে উড়িয়ে দিলে। তৃতীয় একটা সেপাই আসতেই তাকে এক ঘুঁষিতে ধরাশায়ী করে ফেললে। হৈচৈ পড়ে গেল।

ইংরেজের সৈন্যরা এসে পড়ল। নবাবের সৈন্যরা যে যেদিকে পারল পালাল !"

"ভূত ? একটা ভূত এই কাণ্ড করলে ? বল কি—"

হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন নীলু রায়। বলিলেন—"না, ভূত নয়। ছিটগ্রস্ত একটা সাহেব সৈন্য। মদ খেয়ে ওই কাণ্ড করেছিল। কিন্তু ইংরেজ জাতের আইন-নিষ্ঠার গল্পটা শোন। আমার তো শুনে তাক লেগে গিয়েছিল ! ওই মাতালটার জন্যেই বজবজ দুর্গ-জয় সহজ হয়ে গেল। ইংরেজের একটি সৈন্যও মরল না। ও লোকটা যদি নবাব সাহেবের চাকর হত নবাব ওকে বকশিস করতেন, হয়তো ওকে মনসবদার বানিয়ে দিতেন, ক্লাইভ কিন্তু ওর কোর্ট মার্শাল করলেন। বললেন, বিনা হুকুমে কেন ও কেল্লার দেওয়ালে চড়েছে। লোকটাকে ক্ষমা চাইতে হ'ল। বলতে হ'ল এমন কাজ আর কক্‌খনো করব না। এর থেকেই বোঝ ইংরেজ আর মুসলমানে কত তফাত। ইংরেজরা নিয়ম অনুসারে চলে। কোলকাতার ফোর্ট-উইলিয়াম কেল্লা তো ওরা দখল করে' নিয়েছে—"

"অ্যাঁ, বল কি ! ফোর্ট দখল করে' নিয়েছে—"

"হ্যাঁ। ওয়াটসন এসে দমাদ্দম গোলা ফেলতেই সব চোঁচা দৌড় দিলে ! মাণিকচাঁদ পালাল হুগলিতে। ফোর্ট দখল করে' নিলে ওরা"।

"আমাদের মালিক জন সাহেবের কোনও খবর পেলে না ?"

"নাঃ। ধূর্জটি অনেক খোঁজখবর করলে তো। তার কিংবা তার ভাইপোর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।"

এমন সময় মধু সামন্ত আসিয়া হাজির হইল। তাহার স্কন্ধে একটি মুণ্ডহীন বলি দেওয়া পাঁঠা। পাঁঠাটা নামাইয়া সে বলিল—"একটু তামুক খাওয়াত তো মাখন।"

"পাঁঠা কি রঙ্কিণী মায়ের কাছে মানত ছিল ?"

"হ্যাঁ মানতই ছিল। মানত করেছিল আমার পরিবারটি। ভারী ভীতু মেয়েমানুষ সে। আমার কিছু জমি চেপে নিয়েছিল খালিমুল্লা। আমি নালিশ করেছিলাম তার নামে। খালিম না কি ভুইঞা ঈশা খাঁর আত্মীয়। তাই ভয় ছিল বিচারক সুবিচার করবে কিনা। আমার পরিবারটি ভীতু লোক —ভয়ে ভয়ে রঙ্কিণীর কাছে মানত করে' বসল মা মকোর্দমা জিতিয়ে দাও,

তোমার কাছে বলি দেব। আমাকে কিন্তু তদারকী করতে হল অনেক। সৈতুল্লার মারফত ফৌজদারের কাছে কিছু ভেট পাঠাতে হল। ভেট নিয়ে যাওয়ার জন্য সৈতুল্লাকেও দিতে হল কিছু। রক্ষিণীর উপর নির্ভর করে আমি বসে' থাকতে পারলুম না। মকোর্দমা জিতেছি। পরিবার বললে, পাঁঠা মানত করেছিলাম দিয়ে এস। ভাবলাম অনেকদিন মাংস খাইনি, তাছাড়া যখন মানত করেছে একটা, তখন দেওয়াই উচিত। নিয়ে এলুম একটা পাঁঠা কিনে। ৭০০ কড়ি দাম নিলে। কামার মুণ্ডুটা নিলে, তাছাড়া আরও দশটা কড়ি। ঝামরি বলছে তাকে একটু মায়ের প্রসাদ দিতে হবে। তাই ভাবছি পাঁঠাটা কেটেকুটে এইখানেই রান্না করে' ফেলি, খানিকটা রাঁধা মাংস ঝামরিকে দিয়ে বাকিটা বাড়ি নিয়ে যাব। ভাই মাখন তুমি একটা ব্যবস্থা করে' দিতে পার? ও কি, তুমি অমন বিমর্ষ হ'য়ে বসে' আছ কেন?"

"শুনছি নবাবের সঙ্গে ইংরেজের লড়াই বাধবে। তার মানেই আমাদেরও হয়তো যুদ্ধে যেতে হবে। আমরা ইংরেজদের অধীনে চাকরি করি বটে, কিন্তু নবাবকে ইংরেজরা সত্যি সত্যি হারিয়ে যদি এদেশের রাজা হয়ে বসে' তাহলে সেটা খুব খারাপ লাগবে ভাই—"

নীলু রায় বলিলেন, "খারাপ লাগবে কেন। ওরকম একটা পাজী কামুক অর্থপিশাচ নিষ্ঠুর লোককে মসনদ থেকে নামিয়ে দেওয়াই তো উচিত। ইংরেজরা যদি রাজা হয়, তাহলে দেশের ভাগ্য বলে' মানব সেটা—"

মধু সামন্ত প্রশ্ন করিলেন—"কেন? ইংরেজরা কি দেবতা? তারা কি কম কামুক, কম পাজী? এই যে তোমাদের জন সাহেব। ও কি শুকদেব? তোমাদের নাকের উপর দিয়েই তো তিনটে ছুঁড়িকে নিয়ে সরে' পড়ল। ওদের বড় বড় চাঁইরাও রাখ্নি রাখে। রোজার ড্রেকের নামেও অনেক কথা শুনেছি"

'কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার মতো কামুক পাষণ্ড—"

মধু সামন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"হবেই তো, এই হচ্ছে দস্তুর। সব নবাবরাই ওই জাতের। সব শিয়ালের এক রা। আলিবর্দি খাঁই খালি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ছিল। একটিমাত্র বিবি ছিল তার। অন্য কোনও মেয়েমানুষের দিকে নজর দেয়নি সে। কিন্তু সে ভাল লোক ছিল বলে কই তোমরা তো দলবদ্ধ হয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াওনি যখন

সে বর্গির হাঙ্গামার সময় নাস্তানাবুদ হচ্ছিল ? এখন তোমরা তো সিরাজের আশেপাশেই ঘুরঘুর করছ, অনেক মহাত্মা নিজেদের বউ বেটি বোন উপহার দিচ্ছে তাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্যে। সিরাজ-না হয় খারাপ কিন্তু তোমরাই কি ভালো ?"

"কিন্তু সিরাজ হোসেন কুলি খাঁকে অমনভাবে মেরে ফেললে—"

'মারবে না ? হোসেন কুলি যে প্রেমিক ছিলেন। সিরাজের মা আর মাসী দু'জনের সঙ্গেই প্রেম করতেন তিনি। সিরাজ তেজী লোক, এ অপমান সে সইবে কেন ?"

"বল কি !"

"যা শুনেছি তাই বলছি। জগৎশেঠের একজন গোমস্তা আমাকে বলেছিল। মতিঝিলে তার আনাগোনা ছিল। সে বললে—হোসেন কুলি ঘসেটি বেগম আর আমিনা বেগম দু'জনের প্রেমেই হাবুডুবু খাচ্ছিল। ওরা সব সমান। সিরাজের আর এক মেসো সৈয়দ আহম্মদ যখন উড়িষ্যায় ছিল, সেখানে সে উর্ডোনিদের নিয়ে টানাটানি করত। খবর শুনে আলিবর্দি খাঁ সেখান থেকে ওকে সরিয়ে দেন। শুধু সিরাজ খারাপ, একথা বললে শুনব কেন, ওরা সবাই খারাপ। আমরাও। আমরাই ওদের খোসামোদ করে' ঘুষ দি, আমরাই ওদের মেয়েমানুষ সরবরাহ করি। আমিও সেই পাপে পাপী।"

হঠাৎ মধু সামন্ত নিজেই নিজের গালে চড় মারিতে লাগিলেন। "আমাদের গাঁয়ের গরীব ঝুনিয়াকে আমিই তুলে দিয়েছি পাপিষ্ঠ বকাউল্লা বক্‌শির হাতে। ঝুনিয়ার অবশ্য কপাল ফিরেছে, তার বাপ-মায়ের দারিদ্র্যও ঘুচেছে, কিন্তু আগুন লেগে গেছে আমার মনে। বুঝলে ? আমরা কেউ ভালো নই, আমরা সবাই পাজির পাঝাড়া, সবাই হারামজাদা, সবাই শয়তান, সবাই নচ্ছার। রায় মশায় সিরাজকে শয়তান বলছেন, নিজে সাধু সাজবার জন্যে নাকি" ?

নীলু রায় দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন—'আমি ভাই যা জানি তাই বলছি। আপনি যা বলছেন তাও হক কথা, আমরা সব কীটস্য কীট, মানুষ নই।'

মাখন বলিল—'পাঁঠাটা যদি এখানেই রান্না করেন তাহলে আর দেরি করবেন না, উঠুন—'

মধু সামন্ত পাঁঠাটা লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এমন সময় দেখা গেল ধূর্জটিমঙ্গল আসিতেছেন। তিনি এতক্ষণ পূজা করিতেছিলেন। তাঁহার কপালে ও বাহুতে চন্দনের ছাপ, পরিধানে পট্টবস্ত্র, পায়ে খড়ম, গায়ে কোনও জামা নাই। সেকালে অধিকাংশ লোকই বাড়িতে নগ্নগাত্র হইয়া থাকিতেন। মধু সামন্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। মধু সামন্ত পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক। বেশ কিছু জমিজমা আছে, ও অঞ্চলের অধিবাসী কিছু প্রজাও আছে তাঁহার। অর্থাৎ ওই অঞ্চলের খানিকটা অংশের ইজারা লইয়াছেন তিনি। পাশেই আর একজন ইজারাদার খালিমুল্লা। তাঁহার সহিত প্রায়ই খিটিমিটি বাধে। তিনি আগাইয়া গিয়া ধূর্জটিমঙ্গলের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন; ধূর্জটিমঙ্গল ব্রাহ্মণ। তাছাড়া জন সাহেবের বন্ধু লোক।

"কি মধু, পাঁঠা কি রঙ্কিণী মাকে নিবেদন করলে নাকি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এইখানেই রান্না করে' নিয়ে যাব ভাবছি। ঝামরিকে একটু প্রসাদ দিতে হবে।"

"প্রসাদ আমরাও পাব। তুমি আজ আমাদের বাড়িতে খাবে—"

"আমিই রান্নার ব্যবস্থা করছি, তোমার বৌদিই রাঁধবেন,—ওরে হোকনা—"

একটি আদিবাসী ভৃত্য আসিয়া হাজির হইল।

তাহার পর মধু সামন্তের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তোমার পুরুত আর কামার কি চলে গেছে?"

"অনেকক্ষণ"।

ধূর্জটি হোকনাকে আদেশ করিলেন—"তাহলে তুই রামু পুরুত আর পাঁচু কামারকে ডেকে আন। আর কাল ওই যে ওরাঁও পাড়া থেকে পাঁঠা বেচতে এসেছিল এক বুড়ী, তার কাছ থেকে পাঁচ শ' কড়ি দিয়ে পাঁঠাটাকে কিনে ফেল। কড়ি তোর গিন্নীমার কাছ থেকেই পাবি—। যা চট্ করে যা—"

মধু সামন্ত বলিলেন—'আপনিও কি একটা একটা পূজো দেবেন নাকি'?

"দিতেই হবে। তা না হলে একটি পাঁঠায় এতগুলো লোকের কুলোবে কি করে"?

হোকনা চলিয়া যাইতেছিল, ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে আর একটা ফরমাস করিলেন।

"ঝামরি কোন দিকে আছে দেখ তো—"

সামন্ত বলিল—'ঝামরি এখন কবুতর ঝলসাচ্ছে। সকালে চেরো মাগীরা দশটা কবুতর বলি দিয়েছিল মা রঙ্কিণীর কাছে। তার থেকে দুটো ঝামরিকে দিয়ে গেছে। তাই সে ঝলসাচ্ছে একটু আগেই দেখে এলাম। আমাকেও বলেছে মাংসের ভাগ চাই। কেন কি দরকার ওর সঙ্গে—"

"আমি তো জন-এর সন্ধান পেলাম না। ও যদি কিছু বলতে পারে। মাঝে মাঝে ঠিক ঠিক বলে' দেয়। অদ্ভুত ক্ষমতা ওর। কিন্তু বড্ড খামখেয়ালী। চল একটু ব'লে যাই ওকে—"

রঙ্কিণীর মন্দিরের পিছনে যে জঙ্গল ছিল, সেখানে ছিল একটা কৃষ্ণচূড়ার বড় গাছ। তাহারই তলায় ঝামরি বসিয়া কবুতরের হাড় চিবাইতেছিল। সামন্তকে দেখিয়া বলিল—'ওকি, মাংস এখনও কাটিস নাই? খাব কখন? ক্ষিধা লেগেছে যে—"

সামন্ত বলিল—"ধূর্জটি মশায়ও একটা পাঁঠা বলি দেবেন এখনি মায়ের কাছে! তখন দুটো পাঁঠা একসঙ্গে রান্না হবে। তোমাকে দিয়ে যাব এক বাটি—"

ধূর্জটির দিকে তাকাইয়া ঝামরি বলিল—"তুইও পাঁঠা বলি দিবি? পাঁঠা খেয়ে খেয়ে রঙ্কিণীর অরুচি ধ'রে গেছে। অন্য বলি চায় উ।"

"অন্য বলি আবার কি—"

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ঝামরি।

"রক্তখাকি নরবলি চায়। নরবলি—। পারবি দিতে?"

"না তা আমি পারব না। বলি দেওয়ার মানুষ পাব কোথা?"

"চেষ্টা করলেই পাবি। টাকা ফেললেই পাবি। কিনতে পাওয়া যায়।"

"ওসব পাগলামি ছাড়। জন সাহেব কোথা গেল বল—"

ঝামরি বলিল—"জানি। বুলব না।"

বলিয়াই উঠিয়া পড়িল। তাহার কোমরে যে বস্ত্রখণ্ড জড়ানো ছিল সেটাও খসিয়া পড়িল। মন্দিরের ভিতর চলিয়া গেল সে।

সেদিন ধূর্জটি শুধু সামন্তকেই নয় মাখনলাল আর তাহার সহকারী জয়রামকেও নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাদের সহিত নীলু রায় তো ছিলেনই। জগদ্ধাত্রীই স্বহস্তে সব রন্ধন কবিয়াছিলেন। এই কয়জন লোকের জন্য পাঁচ সের বাঁশফুলি চালেব ভাত প্রস্তুত করিয়াও তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল শেষ পর্যন্ত না কম পড়িয়া যায়। কিন্তু কম পড়ে নাই। ভাতের সঙ্গে ছিল গব্য ঘৃত, মুগেব ডাল, বুটের ডালেব বড়া। তাছাড়া ছিল বেতের আগার তরকারি, পুঁইশাকের চচ্চড়ি, মোচার ঘণ্ট, পোস্তবাটা, সিমেব সডসড়ি, মাগুব মাছ দিয়া জিরাব ঝোল, আমচুব দিয়া শোল মাছ, কলাব অম্বল আর আদা কাসুন্দী। ইহার উপর মাংস তো ছিলই। মাংসে লাউ, ছোলা ভিজানো, হিং গোলমরিচ আদা প্রভৃতি দিয়া অপরূপ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়ছিল জগদ্ধাত্রী। ইহার উপর ছিল পায়েস, মনোহরা এবং চন্দ্রপুলি। জগদ্ধাত্রী ধনীর গৃহিণী। কিন্তু তিনি নিজেই মাথায় ঘোমটা দিয়া এবং গাছকোমর বাঁধিয়া স্বহস্তে সকলকে পবিবেশন কবিলেন। ঝকমারি তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল। অতিথিবা প্রত্যেকে দামী কার্পেটেব আসনে উপবেশন করিয়া রূপাব বাটিতে ভোজন করিলেন। রূপার গ্লাসে সুগন্ধী সুশীতল জল পান করিয়া তৃপ্ত হইলেন। আহারান্তে রূপার তবক দেওয়া পান প্রত্যেকেব হাতে দিবার পর ঝকমারি রূপাব আতরদান খুলিয়া প্রত্যেককে আতরও মাখাইয়া দিল। মধু সামন্তের সহিত পাচক ব্রাহ্মণ গেল দুইজন। শুধু মাংস নয় সমস্ত রকম খাবাব গুছাইয়া নিজে দাঁড়াইয়া দুইটি পালকিতে তুলিয়া দিলেন। মধু সামন্ত পালকিতেই গেলেন। চওড়া লালপাড় শাড়ি, শাড়ির লাল আঁচল, মাথায় সিঁদুর, হাতে লাল শাঁখা এই বেশেই জগদ্ধাত্রীকে সত্যই যেন জগদ্ধাত্রী বলিয়া মনে হইতেছিল। যাইবাব সময় মধু সামন্ত বলিয়া গেলেন "মা ঠাকুরুন কাল আবার আসব, আপনার কাছেই প্রসাদ পাব, কর্তার সঙ্গে কিছু বৈষয়িক আলোচনা আছে।

মধু সামন্ত পরদিন এক হাঁড়ি মধু, এক হাঁড়ি দই, এক হাঁড়ি সন্দেশ এবং একটি নধর ভেড়া লইয়া দেখা দিলেন অতি প্রতুষেই। পদব্রজেই আসিয়াছিলেন তিনি। সঙ্গে তিনটা চাকর হাঁড়ি তিনটা মাথায় করিয়া আনিয়াছিল। চতুর্থ চাকর ভেড়াটি স্কন্ধে বহিয়া আনিয়াছিল। স্নান

করিয়া আসিয়াছিলেন সামন্ত মহাশয়। তাঁহার কাঁধে ভিজা কাপড় এবং মাথায় ভিজা গামছা। পরিধানে পিরান এবং চওড়া-পাড় তাঁতের ধুতি। পায়ে মজবুত মিলিটারি বুট এক জোড়া।

"কি হে সামন্ত তুমি যে স্নান শেষ ক'রে এসেছ দেখছি—"

"হ্যাঁ, কইলি নদীতে স্নানটা সেরেই নিলাম। আমাব উর-ধুকের ব্যায়ারাম আছে, তাই ভোরেই স্নানটা করে নি। এই মুটেগুলোকেও খাইয়ে দিয়েছি নদীর ধারে। সঙ্গে চিঁড়ে এনেছিলাম। গুড়ও এনেছিলাম। বনে কিছু মহুয়াও পেলাম। আমিও জলযোগ সেরে নিয়েছি।"

ধূর্জটিমঙ্গল প্রত্যেক মুটেকে পঁচিশটি কড়ি দিলেন এবং আরও খাইতেও দিলেন। মুড়ির মোয়া আর বাতাসা। মুটে চাবটি কৃষ্ণকায় ওঁরাও, সরল সদা-সপ্রতিভ, হাসিখুশিতে ভরপুব। তাহারা প্রত্যেকেই মাথা ঝুঁকাইয়া ধূর্জটিকে প্রণাম কবিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

উহারা চলিয়া গেলে সামন্ত মহাশয় বলিলেন—"এই সব আসকাবা দিয়েই আপনারা মুনিসদেব পায়াভারি ক'রে দিচ্ছেন। আমি তো ওদেব মজুরি খাওয়া সব দিয়েই দিয়েছি, আপনি আবার দিতে গেলেন কেন?"

নীলু রায় কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"ওটা ওর স্বভাব।'

ধূর্জটিমঙ্গল যাহা বলিলেন তাহা সে যুগের পক্ষে একটু আশ্চর্যজনক। বলিলেন, 'ওরাই রাজা, তাই ওদের খাজনা দিলাম। ও কথা যাক, বস। আমি গিন্নীকে খবর দিয়ে আসি—'

খড়ম চটচট করিতে করিতে তিনি ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। একটু পরেই তিনি ফিরিলেন। তাঁহার পিছনে একটি চাকর একটি পিতলের হাঁড়িতে গরম দুধ আনিয়া হাজির করিল। আর একটি চাকরেব হস্তে তিনটি রূপার বাটি এবং ছোট ছোট গামছা।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—'এক বাটি ক'বে গরম দুধ খেয়ে নিয়ে তারপর চল ওই মাঠে গিয়ে বসি। কি বৈষয়িক কথা বলবে তুমি—?"

"আগে দুধটা খেয়ে নেওয়া যাক, তারপব বলছি সব।"

বাটিতে গবম দুধ ঢালিয়া দিল ভৃত্যরা। তাহার পর গামছা পাঠ করিয়া প্রত্যেকের দুই হাতের অঞ্জলিতে গামছাগুলি পাতিয়া দিল। তাহার

পর সেই গামছাগুলির উপর গরম দুধের বাটি বসাইয়া দিয়া গেল তাহারা। প্রত্যেকে ফুঁ দিয়া দিয়া গরম দুধ পান করিতে লাগিলেন। ভৃত্যরা তিনটি ছোট ছোট জলও দিয়া গেল। দুগ্ধ পানান্তে সকলে হাত ধুইলেন। সামন্ত আলগোছে একটু জল পানও করিলেন।

"চল এবার মাঠে বসা যাক।"

মাঠে কয়েকটি মোড়া পাতাই ছিল। সেখানে গিয়া তিনজনেই উপবেশন করিলেন। মহুয়া ফুলের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। অদূরে মনরঙ্গোলি গাছটায় প্রচুর ফুল ফুটিয়াছে। পিছনের বন হইতে বনমোরগের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

সামন্ত বলিলেন—"শুনছি নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধছে। এখন আমাদের কি কর্তব্য?"

"কিসের কর্তব্য—?"

"আমরা কোন পক্ষে থাকব?"

"আমরা চুনোপুঁটি, আমরা কোনও পক্ষে থাকলাম বা না থাকলাম তাতে ওদের কিছু এসে যাবে না।"

"যাবে বই কি। আমরা যে পক্ষে থাকব সেই পক্ষকে টাকা দিয়ে লোক দিয়ে সাহায্য করব। সে সাহায্য হয়তো যৎসামান্য, কিন্তু মনে রাখবেন কাঠবেড়ালিও রামচন্দ্রকে সেতু নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন।"

বলিয়াই একদৃষ্টে তিনি ধূর্জটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নীলু রায় বলিলেন—"আপনার কথাবার্তা থেকে তো মনে হয় আপনি নবাবের দিকে।"

এইটুকু বলিয়া তিনি অন্যদিকে চাহিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সামন্ত বলিলেন—"তা যদি মনে করেন করুন। আপনার মন তো আমার ঘোড়া নয় যে লাগাম টেনে যেদিক ইচ্ছে ঘুরিয়ে দেব। আমি নবাবের পক্ষে এটা যদি আপনার মনে হয়ে থাকে তাহলে তাই মনে করুন। তবে এটা জানবেন কোন নবাবের উপরই আমার ভক্তি নেই। আমি এদের পক্ষে থাকতে চাইছি স্বার্থের খাতিরে। আমার ঠাকুর্দার বাবা আজিমুদ্দিনের সময় নবাব সরকারে চাকরি করতেন। সে সময় অনেক সম্পত্তির মালিক

হয়েছিলেন তিনি। যখন খুশি খাজনা দিতেন, যখন খুশি দিতেন না। তারপর আলিবর্দীর আমলে আর অতটা যা-খুশি করা যেত না। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে ভয়ানক কড়াকড়ি হয়ে গেল। খাজনা জমা না দিলেই বৈকুণ্ঠবাস। সেই নিয়মই এখনও চলছে। তবু আমরা মোটামুটি ভালই আছি। বছরে বছরে খাজনা দিয়ে দিই, কখনও বাকিও রাখি, সদরে কিছু ঘুষঘাস দিলেই কেউ তাগাদা করে না। নিজের নিজের জায়গিরের হর্তাকর্তা বিধাতা আমরাই। তছাড়া আর একটা কথা ভাবুন। শুনেছি পাঠানদের আমলে এদেশে প্রত্যেকেই ধনী ছিলেন, অনেকের ফলাও ব্যবসায় ছিল, কিন্তু মোগলদের আমলে আমাদের আর তেমন বাড়বাড়ন্ত রইল না, টাকা অনেক কমে গেল। তার কারণ গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে সব টাকা দিল্লী চলে যেতে লাগল। ইংরেজরা রাজা হয়ে যদি আরও কড়াক্কড়ি করেন তাহলেই তো আমাদের দফা নিকেশ। নবাবরা হাজার বদমায়েশ হলেও নবাব, দিলদরিয়া, কিন্তু এরা হল বেনে। এরা যদি রাজ্যপাট পায় আর এদেশের টাকা নিজেদের দেশে চালান করে, তাহলেই তো এদেশের আর কিছু থাকবে না মশাই। ছিবড়ে ক'রে ফেলবে সব।"

নীলু রায় বলিলেন—"আপনি খুব দূবদর্শী লোক সামন্ত মশায়। আপনি যা বলছেন তা-ই হয়তো হবে। কিন্তু একটা কথা বলতে পারেন, যে-কলসীতে শত শত ফুটো, সে কলসীতে জল কতক্ষণ রাখতে পারবেন? মোগল সাম্রাজ্য টলমল করছে। বাংলা নবাবদেরও সেই অবস্থা। বর্গীর আক্রমণে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে সব। আলিবর্দীর রাজকোষে টাকা ছিল না। এই বিদেশী বেনেদের কাছ থেকেই তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন। দিনাজপুরের রাজা রামনাথ, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও অনেক টাকা দিয়েছিলেন তাঁকে। তাছাড়া অনেক জমিদারদের কাছ থেকে 'আবওয়াব' আদায় করেছিলেন তিনি এজন্য। তাও সামলাতে পারেন নি। তাঁর উত্তরাধিকারী সিরাজ টাকার জন্যে হন্যে কুকুরের মতো ঘুরছেন চারদিকে। যেনতেনপ্রকারেণ টাকা চাই। এর উপর আছে লাম্পট্য আর বিলাস। এ রাজ্য কি বেশীদিন টিকবে মনে করেন? টিকবে না। তখন আর কেউ আসবে। হয় বর্গীরা আবার মাথা চাড়া দেবে, তা না হ'লে হয়তো রাজপুতরা, কিংবা হয়তো বাইরে থেকে

আহমদ শা দুরানীর মতো কোন ডাকাত এসে হানা দেবে আবার। কিংবা কোন বিদেশী জাত, যারা এখন বেনে হয়ে ব্যবসা করছে এদেশে তাদের মধ্যেই কেউ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আমি যতদূব জানি ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ আর ইংরেজের মধ্যে ইংরেজরাই সব চেয়ে ভালো। পর্তুগীজরা তো ডাকাত। যেই হোক নবাবদের নাভিশ্বাস উঠেছে। এ অবস্থায় নবাবের সহযোগিতা করা মানে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনা। তাছাড়া আমাদের শক্তিই বা কত? কিই বা আমরা করতে পারি। এই ধরুন না নবাব যখন কলকাতা আক্রমণ করে বড়বাজারে আগুন ধরিরে দিলে তখন আমরা বনে জঙ্গলে পালিয়েছিলাম। তারপর আবার যখন ইংরেজবা কোলকাতায় এল তখন তারাও নিজেদের পাড়াটি বাঁচিয়ে চারদিকে আগুন লাগিয়ে দিলে। আবার আমবা যে যেদিকে পারলাম পালালাম। পালানো ছাড়া আমরা কি করতে পারি বলুন। তবে মনে মনে আমি সায়েবদের দিকে—ওবা মুসলমানদের চেয়ে ভালো।"

ধূর্জটি এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এইবার বলিলেন, "দেখ মধু, আমি নবাবের আমলাদের ভয়ে সুতানুটি থেকে পালিয়ে এসেছি এই জঙ্গলে। জন সাহেব আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তার বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করবার ভার সে দিয়ে গেছে আমাকে। আমি এমন কিছুই করব না যাতে তার অনিষ্ট হয়—। কলকাতায় আমার ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে দিয়েছে নবাবরা। আমার প্রথম পরিবার ভানুমতীকে দ্বিতীয় পরিবার লক্ষ্মীমণিকে আর ছোট বোন বারাহীকে নবাবের পাষণ্ড সেনারা লুট ক'রে নিয়ে গেছে। আমার আরও চারটি বোন ছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা ছিল, তারা কে কোথায় পালিয়ে গেছে, খোঁজ পাইনি। শুনেছি ভানুমতী আর লক্ষ্মীমণি আত্মহত্যা করেছে। শুনেছি বারাহী বেঁচে আছে এখনও, সে নাকি ওই দুরাত্মা মুসলমান ওমরাওয়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে পালিয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় আছে তা জানি না। এ অবস্থায় তুমি কি প্রত্যাশা কর যে আমি চাইব ওই নবাব এদেশের উপর আধিপত্য করুক? তা আমি কখনও চাইব না। আমি চাইব সে নিপাত যাক—"

নীলু রায় দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখ দুইটি জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

মধু সামন্ত তখন গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন—"আমি সবই শুনেছি। তবু আপনাকে বলছি এখন আপনি নবাবের পক্ষেই থাকুন। কারণ চেনা শত্রুকে কায়দা করা সহজ। কি পেলে তারা খুশী হয় তা আমরা জানি। টাকা আর মেয়েমানুষ এই তারা চায়। বকাউল্লা বক্‌শি এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। নবাব অন্তঃপুরের অনেক দাসী বাঁদী এইখান থেকেই যায়। আপনার বন্ধু জন সাহেবও অনেক দাসী বাঁদী বিক্রি করতেন পর্তুগীজ ব্যবসাদারদের কাছে। তাদের অনেককে আমি চিনি। তাদের যারা প্রণয়ী তাদেরও। এদের সাহায্য নিয়ে আপনার ভগ্নীদের খোঁজ করা অসম্ভব নয়। হয়তো তাদের ফিরেও পেতে পারেন, হয়তো তাদের সাহায্যে আপনার আরও উন্নতি হতে পারে। সেইজন্যে বলছি আপনি নবাবের দলে থাকুন।"

ধূর্জটি ইহার উত্তরে একটু হাসিয়া বলিলেন, "মধু, তোমার আসল উদ্দেশ্যটা তুমি খুলে বলছ না। আমি কিভাবে নবাবকে সাহায্য করতে পারি তাও বলছ না। সব খুলে বল। এতে তোমার কি লাভ হবে কিছু?"

মধু সামন্ত কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন।

"লাভ হবে। দশহাজার আসরফি।"

"কি রকম? অত টাকা কে দেবে তোমাকে—"

"সিরাজের বেগম লুৎফুন্নিসা"

"তুমি তার নাগাল পেলে কিরূপে—"

"মোমিন বিবির কৃপায়—"

"মোমিন বিবি কে?"

"আমার জমিদারিতে সে কিছুদিন আগে বাস করত। এখন সে লুৎফুন্নিসার রঙমহলের দাসী। লুৎফুন্নিসা তাকে ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে। সে—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া নীলু রায় বলিলেন—"এখানকার যারা বাসিন্দা তারা প্রায় সকলেই তো আদিবাসী। হয় ওঁরাও, নয় কোল, নয় মুণ্ডা, নয় চের। কিছু বাউরিও আছে। তাদের মধ্যে মোমিন নামটা বড় শুনিনি তো—"

সামন্ত বলিলেন—"মোমিন বিবি খাঁটি আদিবাসী নয়। তার মা

আদিবাসী, কিন্তু তার বাপ ছিল একজন পর্তুগীজ দস্যু। দস্যুটা ডাকাতি করতে গিয়ে মারা যায়। তার মা মেয়েটাকে পালন করছিল। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটা। অনেক টাকা দিয়ে একজন আমীর তাকে কিনে নেন। এখন সে লুৎফুন্নিসার রঙমহলে প্রধান বাঁদী। এখানকার মেয়ে বলে' সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। কয়েকদিন আগে সে আমাকে বলে' পাঠিয়েছে যে, বেগম সাহেবা চারটি চিঠি লিখেছেন। একটি জগৎশেঠকে, একটি দুর্লভরামকে একটি উমির্চাদকে আর একটি রাজবল্লভকে। বলেছেন চিঠিগুলি গোপনে ওঁদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এর জন্যে তিনি দশহাজার আসরফি বখশিস দেবেন। মোমিন বিবি জিজ্ঞাসা করে' পাঠিয়েছে আমি একাজ পারব কি না। আমি রাজি হয়েছি। চিঠি চারখানি আমার কাছে এসে পৌঁছেচে—"

নীলু রায় প্রশ্ন করিলেন, "চিঠিতে কি আছে জান?"

"চিঠি সীলমোহর করা। তাছাড়া আমি ফারসী পড়তে জানি না। তাই চিঠি খুলিনি।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি গরীব মানুষ। ওঁদের কারো সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তবে জগৎশেঠের একজন পুরোহিত এখানে রঙ্কিণীর পুজো দিতে আসেন। তাঁকে ধরতে পারি এবং তাঁর মারফত চিঠিটা জগৎশেঠের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি—"

"ব্যাপারটা চাউর হয়ে যাবে তাহলে। লুৎফুন্নিসা সেটা চান না। কথাটা নবাব সাহেবের কানে যদি যায় তাহলে অনর্থ বাধবার খুবই সম্ভাবনা।

নীলু রায় বলিলেন—"কিন্তু চিঠিগুলিতে কি আছে তা না জেনে সেগুলি বিলি করবার ভার নেওয়া কি ঠিক হবে? চিঠিগুলিতে কি রকম সীলমোহর আছে?"

সামন্ত বলিলেন—"গালার। তার উপর একটা গোল আংটির ছাপ আছে। বোধহয় লুৎফুন্নিসার আংটির ছাপ।"

নীলু রায় বার দুই দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"গোল আংটি একটা আমার কাছেও আছে। গালার সীল ভেঙে আবার গোল আংটির ছাপ দিয়ে দেওয়া যায়। চিঠি এনেছেন সঙ্গে?"

"এনেছি। আমার পিরানের পকেটে আছে—"

"পিরান কোথায় ?"

"পেটরার মধ্যে আছে—"

"পেটরাই বা কই ? আপনি তো শুধু গায়ে এলেন ভিজে কাপড় কাঁধে করে'—"

"পেটরা আছে পালকিতে। পালকি কইলি নদীর ধারে নামিয়ে স্নান করে এসেছি আমি। অনুমতি করেন তো নিয়ে আসি চিঠিগুলি—"

"আপনি যাবেন কেন ? আমার একটা চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

"না, চাকর আনতে পারবে না। আমি সঙ্গে একজন আর্মেনি খোজা এনেছি ! সে তলোয়ার আর পিস্তল নিয়ে পালকি পাহারা দিচ্ছে। আমি যাব আর আসব। আপনার কুঠি থেকে বেশীদূরে পালকি রাখিনি। কইলি নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেইখানেই আছে পালকী—"

"তবে যান—"

মধু সামন্ত চলিয়া গেলেন।

নীলু রায় ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া বলিলেন--"এ লোকটিকে তুমি চেন ?"

"চিনি। এখানকার ইজারাদার একজন। কিন্তু লোকটিকে যত সামান্য বলে' মনে হয়, তত সামান্য নয়। ধলভূমের রাজা ওর বন্ধু। আমার মনে হচ্ছে ও তারই দূত হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। আমরা যদি ওর কথায় সায় না দিই তাহলে এখানে টেকা যাবে না। এই সম্পত্তি যদিও দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে নজরানা দিয়ে জন সাহেব কিনেছিল কিন্তু ধলরাজার সঙ্গে ঝগড়া হলে এ সম্পত্তি বেহাত হ'য়ে যাবে। ধলরাজার পাইক পেয়াদা আছে, সৈন্যসামন্তও আছে। দেশী সৈন্য আছে, পর্তুগীজ সৈন্যও আছে। সুতরাং ওকে চটিয়ে এখানে থাকা যাবে না। তুমি যেন বেফাঁস কিছু বলে ফেল না। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ওরা নবাবের স্বপক্ষে। আমাদের মনে মনে যাই থাক বাইরে অন্যরকম ভান করতে হবে—"

"ধর যদি তোমাকে ওই চিঠি নিয়ে যেতে বলে তুমি যাবে ? জগৎশেঠের নাগাল পাবে তুমি ?"

"দেখ নীলু, পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু নেই। মুর্শিদাবাদে যাওয়াটাই শক্ত।

ঘোড়ায় যেতে হবে। পথও নিরাপদ নয়। দূরও অনেক। দেখা যাক চিঠিতে কি আছে, তারপর বিবেচনা করা যাবে।"

একটু পরেই মধু সামন্ত চিঠি চারখানি আনিয়া হাজির করিল।

নীলু রায় সীলমোহরগুলির পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এ সাধারণ গোল আংটির ছাপ। আমার আংটি দিয়েও এরকম সীলমোহর করা চলবে।"

মধু সামন্ত বলিলেন—"আপনারা কি ফাসি জানেন?"

"জানি"—নীলু রায় দাড়িতে একবার হাত বুলাইয়া লইলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"নীলু ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত বেশ ভালভাবে জানে। ইংরিজিও শিখছে। ও চিঠিগুলো পড়ুক, পড়ে' আমাদের বাংলায় বুঝিয়ে দিক বেগম লুৎফুন্নিসা কি চান। তারপর ব্যবস্থা করা যাবে—"

নীলু রায় চারটি চিঠিই খুলিয়া ফেলিলেন। চারটি চিঠিই পড়িলেন। তাহার পর বলিলেন—'চারটি চিঠিই এক। ঠিকানাগুলোই খালি আলাদা আলাদা। আমি একটা চিঠি অনুবাদ করে' আপনাদের শোনাচ্ছি।

খোদাতাল্লা আপনার উপর অজস্র কৃপাবর্ষণ করিয়া আপনাকে সর্বদা সুখী করুন এই প্রার্থনা করি। আমি নবাব মনসূরোলমোল্লা সিরাজউদ্দৌলা-শাহা কুলী খাঁ-মির্জা মহম্মদ-হায়বৎজঙ্গ বাহাদুরের ধর্মপত্নী লুৎফুন্নিসা। নিতান্ত বিপদে পড়িয়া আপনার নিকট সঙ্গোপনে এই পত্র লিখিতেছি। আমি আপনার কন্যাসমা, আশা করি কন্যার গোস্তাকি আপনার স্বাভাবিক ঔদার্যগুণে মাফ করিবেন। আমি লক্ষ্য করিতেছি হারেমে নবাবের অনেক উপপত্নী আছেন, তাঁহারা নবাবের নিকট হইতে নিত্য নতুন উপহার লইয়া থাকেন, কিন্তু কেহই তাঁহার হিতৈষী নহেন। তাঁহার মঙ্গল চিন্তা করেন না, সকলেই তাঁহাকে সর্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার বন্ধুরাও কেহ তাঁহাকে সুপথে চলিবার পরামর্শ দেন না। আমার সৎপরামর্শ তিনি শুনিয়াও শোনেন না। তাঁহার নামে যে যে সব কলঙ্ককাহিনী লোকে প্রচার করে তাহার কিছু অতিরঞ্জিত। কিন্তু কিছু যে সত্য তাহা আমি জানি। কিন্তু এসব দোষ সত্ত্বেও আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আমি মনে করি অন্তরে তিনি খারাপ লোক নহেন, কুসঙ্গই তাঁহাকে মন্দপথে লইয়া যাইতেছে। আপনি একজন প্রবীণ লোক, আপনি তাঁহাকে সুপথে ফিরাইবার চেষ্টা করুন। ভাল কাণ্ডারী বিপন্ন

নৌকাকেও তুফানের মুখে রক্ষা করিতে পারে। আপনি স্বর্গীয় নবাব আলিবর্দীর আমলের লোক, আপনার নিকট আমার মিনতি আপনি তাঁহার সহায় হউন, তাঁহার বিপক্ষতা না করিয়া তাঁহার বন্ধু হউন। শুনিতেছি তাঁহার বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র হইতেছে, আপনার নিকট আমার কাতর প্রার্থনা আপনি যদি আন্তরিকতার সহিত আমার স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করেন এই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি আমি আপনার কন্যাসমা, আপনি এ বিপদে কন্যার সহায় হউন। আমি যদিও নবাবের ধর্মপত্নী তবু আমি বড় হতভাগিনী। করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি আমাকে রক্ষা করুন। আর একটি প্রার্থনা, আমি যে আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি তাহা যেন প্রকাশ না পায়। আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি লুৎফুন্নিসা—'

নীলু রায় একটি পত্রপাঠ শেষ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "চারটি চিঠিই একরকম। শুধু উপরের ঠিকানাগুলি আলাদা আলাদা—"

মধু সামন্ত উৎসুক নেত্রে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিলেন ধূর্জটিমঙ্গল। কি বলিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একটি ওঁরাও বৃদ্ধ এবং আরও কয়েকজন আসিয়া হাজির হইল। তাহারা বলিল—গতরাত্রে একটা বাঘ তাহাদের গোয়ালে ঢুকিয়া তাহাদের গরু লইয়া গিয়াছে। পাশের গ্রাম ফুরুলডাঙ্গাতেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। এ বাঘটিকে না মারিলে এ অঞ্চলের গরু ভেড়া ছাগল আর থাকিবে না। মানুষও মরিবে। কিছুদিন আগে একটি অর্ধভুক্ত শম্বরকেও তাহারা বনের মধ্যে দেখিয়াছে। মাঝে মাঝেই ময়ূরের দল ডাকিয়া উঠিতেছে। তাই মনে হয় বাঘটা পাশের জঙ্গলেই আছে। পূর্বে জন সাহেব তাহাদের রক্ষাকর্তা ছিলেন। তিনি যাইবার পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার অবর্তমানে ধূর্জটিমঙ্গলই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তাই তাহারা তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন।

ধূর্জটিমঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"চল এখনই আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। তোমাদের যে গরুটা নিয়ে গেছে সেটার কোনও পাত্তা পেয়েছ? বাঘ সাধারণতঃ যেদিন মারে সেদিনই সবটা খায় না, আধখাওয়া করে' রেখে যায়। পরদিন আবার সেখানে আসে—"

একজন ওঁরাও বলিল—"সেটা পাওয়া গেছে। মহুলটুলির বড় শালগাছটার নীচে পড়ে আছে সেটা—"

"ভালই হয়েছে তাহলে আমি শালগাছটার উপব চড়ে' বসে থাকি। বাঘটা এলেই তার উপব ঝাঁপিয়ে পড়ব—"

মধু সামন্তর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"নবাব থাকুক আব যাক আমি তেমন গ্রাহ্য কবি না। কিন্তু লুৎফুন্নিসার চিঠি শুনে বড় কষ্ট হয়েছে। তাঁকে আমি সাহায্য করবাব চেষ্টা করব। চিঠি চারখানি নিয়ে আমি নিজেই মুর্শিদাবাদ যাব। কিন্তু পথ অনেকটা। পথে চোর ডাকাতও আছে। তাছাড়া বন আর পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। সঙ্গে হাতিয়ারবন্দ লোকলস্কব চাই। ঘোড়ায় গেলে তাড়াতাড়ি হবে। পথে ঘোড়া বদলের ব্যবস্থা থাকলে আরও তাড়াতাড়ি হবে। সঙ্গে একদল অশ্বারোহী পলটন নিয়ে কিভাবে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি সেটা ভেবে দেখ। আমি বাঘটা মেরে আসি—নীলু যাবে না কি সঙ্গে—"

নীলু বলিলেন—"তুমি তো মুগুর আর বর্শা নিয়ে বাঘের সঙ্গে লড়বে। আমি তাব মধ্যে গিয়ে কি করব?"

"তুমি একটা বড় ছোরা নিয়ে চল। যদি বাঘটা আমাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়, তখন তুমি সাহায্য করতে পাববে।"

"বেশ চল।"

মধু সামন্ত বলিলেন -"আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা সব হয়ে যাবে। আমি ধলরাজার কাছে যাচ্ছি। তিনি ঘোড়া লোকজন সব দেবেন। আজই একজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি ঘোড়ায়। সে রাস্তার মাঝে মাঝে ঘোড়ার বন্দোবস্ত রাখবে। কিন্তু আপনি তো চললেন বাঘের মুখে —"

"যদি না ফিরি, তাহলে তো খেল খতম। তুমি তখন অন্য লোক দেখো - নীলু যদি অক্ষত ফিরে আসে সে-ও যেতে পারে।"

"আমি তাহলে চিঠিগুলো কি করব"

"ফিরে নিয়ে যাও, কাল এসো।"

"কিন্তু তাতে একটু বাধা আছে। খবর পেয়েছি একটা গুপ্তচর না কি ওই চিঠিগুলো চুরি করবার মতলবে ঘোরা-ফেরা করছে। তাই চিঠিগুলো আমার কাছে রাখতে চাই না।"

"ধলরাজার সঙ্গে যখন আলাপ আছে তখন সেইখানেই রেখে দাও না।"

মধু কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "শুনেছি ওই গুপ্তচরটা না কি ধলরাজারই কর্মচারী। ধলরাজা জানতে পারলে অবশ্য এখনি তার মুণ্ডচ্ছেদ করবেন। কিন্তু আজকাল সবাই মুখোশ পরে' থাকে, কে বিশ্বাসী কে বিশ্বাসঘাতক, তা চেনা শক্ত। চিঠিগুলি আপনাব কাছেই থাক। আমি কাল আসব।"

মধু সামন্ত চিঠি চারখানি ধূর্জটিমঙ্গলকে দিয়া চলিয়া গেলেন। ধূর্জটিমঙ্গল সেগুলি জগদ্ধাত্রীর কাছে লইয়া গেলেন।

"আমি বনে বাঘ মাবতে যাচ্ছি। তুমি এ চিঠি চারখানি সিন্দুকেব ভিতর পুরে তালা বন্ধ করে রেখে দাও। সিন্দুকের চাবি নিজের কাছ ছাড়া কোরো না—"

"কি চিঠি ওগুলো—"

"তা বলব না। খুব দরকারি আর খুব গোপনীয় এইটুকু শুধু জেনে রাখ।"

জগদ্ধাত্রীর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। অধর দুইটি কাঁপিয়া উঠিল।

"অত গোপনীয় চিঠির ভার আমি নিতে পারব না। তুমিই যেখানে রাখবার রাখ। কিছুই না জেনে অত বড় দায়িত্বের বোঝা বওয়া যায় না। আর আমার উপর তোমার যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে এ ভাব আমাকে দিচ্ছই বা কেন?"

ধূর্জটিমঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিলেন যে জগদ্ধাত্রীর আত্মসম্মানে ঘা লাগিয়াছে। জগদ্ধাত্রী বড় অভিমানিনী। তাহার কম্পিত অধর, আনত অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি, তাহার কঠোর মুখভাব দেখিয়া ধূর্জটিমঙ্গল বুঝিলেন তাহাকে অবিলম্বে প্রসন্ন না করিয়া তিনি শিকারে যাইতে পারিবেন না।

বলিলেন, "তোমাকে সব কথা খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই। তোমাকে কখনও অবিশ্বাস করতে পারি? বলিনি, কারণ শুনলে তুমি ভয় পাবে। ভেবেছিলাম শিকার থেকে ফিরে এসে তোমাকে সব বলব। বেশ, তবে এখনই সব শোন।"

ধূর্জটিমঙ্গল সব কথা খুলিয়া বলিলেন।

সব শুনিয়া জগদ্ধাত্রী বলিলেন, "যে নবাবের অত্যাচারে আমরা এত বিব্রত, সেই নবাবের সাহায্য তুমি করবে ?"

"নবাবকে আমি সাহায্য করছি না, আমি ল্যুৎফুন্নিসার অনুরোধ পালন করছি মাত্র। সে শুনেছি পতিপ্রাণা। তাছাড়া হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক রাজরানীই হোক বা ভিখারিনীই হোক মেয়েমানুষের নির্যাতন আমি সইতে পারি না। লুৎফুন্নিসা সিরাজের বেগম তবু তিনি নির্যাতিতা ! তিনি সিরাজ দরবারের জনকতক বড় বড় ওমরাহকে চিঠি লিখেছেন যাতে তাঁরা সিরাজকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন। আমি তাঁদের কাছে চিঠিগুলি পৌঁছে দিয়ে আসব এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এখানকার ধলরাজা নবাবের পক্ষে। যদি আমি অস্বীকার করতাম তাহলে ধলরাজা খুব অসন্তুষ্ট হতেন। সামন্ত ধলরাজারই দূত। আর ধলরাজা যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে আমরা এখানেও থাকতে পারব না। এইসব কারণেই আমি চিঠিগুলি নিয়েছি। আমি বাঘটা মেরে ফিরে আসি, তারপর যাব—"

"এখন বাঘ শিকারে না-ই গেলে। কাল তোমাকে বেরুতে হবে—"

"কিন্তু এখানে আমি যে জন সাহেবের প্রতিনিধি। তাঁর প্রজাদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তাছাড়া বাঘটাকে মেরে না ফেললে ও কোনদিন তোমাদেরই উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। জন সাহেবের গরু মোষ ভেড়া ছাগল তো কম নেই।"

জগদ্ধাত্রী একথার জবাব দিতে পারিল না।

ঝকমারি নিকটেই বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল। সেই জবাব দিল। বলিল, "সবই বুঝলাম, কিন্তু তুমি কবে বুঝবে যে আমরা পাথর নই ? আমাদের ভাবনা চিন্তাগুলো তো তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে না। সেগুলো যে আমাদের মনকে গামছানেংড়ানো করবে—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "বেশ তো তোমরাও চল না আমার সঙ্গে। কিন্তু ওই কচি ছেলে দুটোকে নিয়ে এই দীর্ঘপথ যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে ? অবশ্য ছেলেদের জন্যে ভাবি না, ছেলে দুটো তো চব্বিশটি ঘণ্টা লালী আর কস্তুরীর কাছে থাকে। মায়ের দিকে ফিরেও তাকায় না

ওরা। আমাদের ছেড়ে অনায়াসে থাকতে পারবে। একবছরের উপর তো বয়স হল ওদের।"

জগদ্ধাত্রী বলিল, 'না আমি ছেলেদের ছেড়ে কোথাও যাব না। তবে ঝকমারি যদি যেতে চায় তোমার সঙ্গে যাক না।'

ঝকমারি চুপ করিয়া রইল।

জগদ্ধাত্রী বলিতে লাগিলেন "তোর দাদা তো একবছর পরে এই সবে ফিরেছেন এসেই আবার চললেন। আবার ফিরতে হয়তো একবছর লাগবে। আগে জন সাহেবের ভরসায় আমরা নির্ভয়ে থাকতাম। এখন কার কাছে আমাদের রেখে যাচ্ছ? ওই দানিয়েলের কাছে?"

'দানিয়েল বিশ্বাসী লোক। তাছাড়া সাহেবের কালা পলটন তো থাকবে। মাখনলাল খুব প্রভুভক্ত। এতেও যদি তোমরা ভয় পাও মধু সামন্তকে ভার দিয়ে যাব। ধলরাজার লোকেরা এখানে এসে থাকবে—"

জগদ্ধাত্রী হাসিয়া উত্তর দিলেন—তোমার দানিয়েল বিশ্বাসী হ'তে পারে, কিন্তু ওকে দেখে ভয় করে বাপু। মনে হয় ও লোকটাও যেন ছোটখাটো একটি সিরাজ। ধলরাজার লোকরা কেমন হবে জানি না। যাক তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর, চিরকাল তাই তো করেছ। আমাদের ভরসা অদৃষ্ট। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। লক্ষ্মী দিদি আর ভানু দিদিকে তো আত্মহত্যা করে মান বাঁচাতে হয়েছে, আমরাও না-হয় তাই করব। কি বলিস ঝকমারি—"

ঝকমারি ফণিনীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিল।

"আমি আত্মহত্যা করতে যাব কোন দুঃখে। যদি মরতেই হয় যুদ্ধ করতে করতে মরব।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, 'তোমরা কে কিভাবে মরবে তা তর্ক করে ঠিক কর, আমি বাঘটাকে মেরে আসি ততক্ষণ।'

অকুস্থলে গিয়া ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন মরা বাছুরটা শালগাছের নিকট পড়িয়া আছে। তাহার গলার খানিকটা বাঘে খাইয়া গিয়াছে। দেখিলেন শালগাছটা খুব উঁচু। অনুভব করিলেন অত উঁচুতে উঠিয়া বসিলে সুবিধা হইবে না। প্রথমতঃ বাঘটা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে দ্বিতীয়তঃ অত উঁচু হইতে বাঘের উপর লাফাইয়া পড়িলে তাঁহার নিজেরই হাত-পা ভাঙিয়া

যাইবার সম্ভাবনা। ধূর্জটিমঙ্গল এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। বেশ একটু দূরে একটা গোলপাতার ছাউনি কুঁড়ে ঘর দেখা গেল। সঙ্গে যে ওরাঁওটি আসিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ও ঘরটা কার?'

'মায়ের ঘর।'

আদিবাসীরা বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখে রঙ্কিণী দেবীর জন্য। তাহাদের ধারণা রঙ্কিণী দেবী তাহাদের খবর লইবার জন্য বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। ঘুরিয়া বেড়াইলেই শ্রান্তি হয়, শ্রান্তি অপনোদনের জন্য ওই কুটিরগুলি। খালিই পড়িয়া থাকে সেগুলি। অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা সেখানে রাত্রে আড্ডাও দেয়। ভাঙ্গিয়া পড়িলে মাঝে মাঝে কেহ মেরামত করিয়া দেয়।

ধূর্জটিমঙ্গল নীলু রায়কে বলিলেন, "চল ওরই মধ্যে আমরা ঢুকে বসে' থাকি। এখনও সূর্য অস্ত যায়নি, সূর্য অস্ত গেলে বাঘ আসবে। দূর থেকে দেখতে পেলেই আমরা বেরিয়ে আসব।"

ধূর্জটিমঙ্গল সঙ্গে তাঁহার ছোট মুগুর এবং শাণিত বর্ষাটি আনিয়াছিলেন। নীলুরায়ের হাতেও ছিল বেশ বড় ছোরা একটা। উভয়ে সেই খালি ঘরটিতে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই নীলু রায় প্রশ্ন করিলেন—"কথাটা পেড়েছিলে?"

"জগদ্ধাত্রীকে জিগ্যেস করেছিলাম, সে বললে ওর বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই। বিয়ে করতে চায় না, এ অবস্থায় জোর তো করতে পারি না।"

"কিন্তু মেয়েদের একটু জোরই করতে হয়। ঢের আগেই ওর বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাত্র পাইনি। ওর পরিচয় গোপন করে তো সম্বন্ধ করতে পারি না। কিন্তু ও বেহারী আর ডাকাতের নাতনী শুনে কেউ ওকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। দু'একজন ফৌজি বেহারী সিপাহীকেও বলেছিলাম, তারাও রাজি হয়নি। কয়েকটা বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যেতে ও এখন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। বলছে বিয়েই করব না। তোমার যে হঠাৎ ওকে এত ভালো লেগে যাবে তা তো বুঝতে পারিনি, তাহলে তোমার সঙ্গেই আগে ওর বিয়ে দিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন ওর মত না হলে কিছুই করা যাবে না। তোমার বয়স কত হল?"

"ত্রিশ—"

"এতদিন পর্যন্ত তুমি একটাও বিয়ে করনি এটা সত্যি বিশ্বাস হয় না। আমি তোমার চেয়ে ছোট কিন্তু তিনটে বিয়ে করে ফেলেছি।"—হাসিয়া বলিলেন,—"তাছাড়া দু'একটা উপরি প্রণয়িনীও আছে—"

"তা তো জানি। মুর্শিদাবাদে কিছুদিন আগে তোমার মৈনি বিবির গান শুনে এলাম। দারুণ গলা। শুনলাম ও নাকি আগে হিন্দু ছিল?"

"কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে। ঔরংজেবের আমলে জিজিয়া কর থেকে রেহাই পাবার জন্য ওর বাবা মুসলমান হয়ে যায়। তিনি গানের খুব বড় ওস্তাদ ছিলেন। মেয়েটা যদি রূপসী হ'ত তাহলে অবশ্য মুসলমানদের হারেমে চলে যেত এতদিনে। কিন্তু ওই কুৎসিত মেয়েকে কেউ নিতে চাইল না। তখন ওর বাবা ওকে গান শেখালেন।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ হল কি করে?"

"অত বৃত্তান্ত নাই বা শুনলে। গান শুনে মুগ্ধ হয়েছি। শুধু আমি নই, অনেকেই মুগ্ধ। অনেক বড়লোকের রঙমহলে ওর যাতায়াত আছে। চিঠিগুলো ওর সাহায্যেই পাঠাব ভাবছি—"

"আমার কিন্তু একটা কথা জানতে খুব কৌতূহল হচ্ছে। ওই কুৎসিত মেয়েকে তোমার মতো শৌখিন লোক পছন্দ করল কি করে। সারা মুখে বসন্তর দাগ, কুচকুচে কালো রং বড় বড় দাঁত, বাখারির মতো চেহারা—"

ধূর্জটিমঙ্গল হাসিয়া বলিলেন—"যারা সত্যিকার শৌখিন তারা রূপকেও ভালবাসে, গুণকেও ভালবাসে। গুণও একরকম রূপ। তাছাড়া আমি বিষয়ী লোক। আমি দেখলাম ও মেয়েটাকে যদি হাতে রাখতে পারি তাহলে আমার অনেক সুবিধা হবে। অনেক বড়লোকের বাড়িতে ওর যাতায়াত। রূপ নেই কিন্তু মেয়েটি সত্যিই ভালো। ওকে মুর্শিদাবাদে একটা বাড়ি কিনে দিয়েছি বেনামীতে। কিছুতেই নিতে চায় না, জোর করে দিয়েছি—"

"তোমার পরিবার এসব কথা জানে?"

"রামঃ। এসব ওকে জানিয়ে লাভ কি? মাঝ থেকে অশান্তি। ওর কোন অভাব রাখিনি তো। আবার কষ্ট হয় আমার আগেকার বউ দুটোর জন্যে। তারা আত্মহত্যা করল। ওদেরও বড় ভালবাসতুম। বড়

বৌটা বাঁজা ছিল, মেজ বৌ মুখরা ছিল। আমাদের সুতানুটির বাড়ির পাশে কুস্তির আখড়া ছিল একটা। অনেকে এসে সেখানে গোলমাল করত। ভোর চারটে থেকে সবাইয়ের তাল ঠোকা চলত। মেজ বৌয়ের ঘুম ভেঙে যেত তাতে। তিনি একদিন বেরিয়ে এসে এমন দাবড়ি দিলেন সকলকে, যে দুড়-দাড় করে' পালাল সবাই। তারপর আখড়াটা ভেঙেই গেল। সবাই বলল, না বাবা ওই রায়বাঘিনীর বাড়ির কাছে আমরা যাব না। সবাই তাকে ওই নামেই ডাকত। কিন্তু সে উগ্রচণ্ডা ছিল না। অপরূপ রূপসী ছিল সে। গম্ভীর ছিল, স্পষ্টবাদী ছিল, তার নিজস্ব জগৎ ছিল একটা, সেখানে আমাকেও ঢুকতে দিত না। আমাকে আমোল দিত না বলেই আমি জগদ্ধাত্রীকে বিয়ে করি। ওই মেয়েকেও আত্মহত্যা করতে হল। শুনেছি, বঁটি দিয়ে সে একটা গুণ্ডার ধড় থেকে মুণ্ডু নাবিয়ে নিয়েছিল। শেষে নিজে কুয়ার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।"

"আর একজন ?"

"সে ঘরে খিল দিয়ে গলায় দড়ি দেয়। গুণ্ডাগুলো কপাট ভেঙে দেখল সে আড়কাটা থেকে ঝুলছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল নীরব হইলেন। তাহার পর বলিলেন—"এ রকম অত্যাচার কতদিন চলবে বলতে পার ?"

"যতদিন আমরা সহ্য করব ততদিন চলবে। ওদের কামের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি আমরাই তো দিচ্ছি। মোহনলাল মহারাজা হলেন, অতবড় পদ পেলেন, বোনের দৌলতে। অনেকেই এরকম করছে। আমরাই পাষণ্ড নরাধম, আমাদের এ শাস্তি হওয়া উচিত।"

"কোনও প্রতিকার নেই বলছ ?"

"আপাততঃ মনে হচ্ছে ইংরেজই এর প্রতিকার। ওরা চতুর, ওরা বীরও। এতদিন ওরা ঘুষঘাস দিয়ে নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সিরাজোদ্দৌল্লা ওদের ল্যাজে পা দিয়েছে। ওরা ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। মাদ্রাজে ক্লাইভ যা করেছে তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখানে এসেই যা করছে তা-ও কম না। ফোর্ট উইলিয়ম ওদের দখলে এসে গেছে—দেখা যাক এবার কি করে।"

"যে যাই করুক আমাদের পক্ষে কোনটা ভালো হবে না। মধু সামন্ত যে কথাটা বললে সেটা নিতান্ত ফেলনা নয়। এক একবার রাজা বদলেছে আর আমাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। পাঠানদের আমলে আমাদের যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল মোগলদের আমলে তা রইল না। ইংরেজরা যদি রাজা হয়—"

"দেখ ধূর্জটি ওসব নিয়ে ধানাইপানাই করে লাভ নেই। যা হবার তা হবেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশী মাথা ঘামিও না। জীবনটা দাবা খেলা, এখনই যে চালটা দিতে হবে তাই নিয়ে মাথা ঘামাও। আমি হিমালয়ের উপর পাহাড়ীদের মধ্যে গিয়ে থাকব ঠিক করেছি। মনোমত যদি সঙ্গিনী পাই, তাহলে সেইখানে গিয়েই বাস করব। তোমার ঝকমারিকে পছন্দ হয়েছে, যদি ওকে আমার হাতে সমর্পণ কর—"

"আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে ঝকমারির মতটা হওয়া দরকার। ওর মতের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া যাবে না। তুমি বরং এখানে থেকে যাও, ওর হৃদয়-হরণ করবার চেষ্টা কর। তুমি এখানে থাকলে আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত হব।"

"কোনও নারীর হৃদয়-হরণ করবার চেষ্টা তো কখনও করি নি। সে সবের সন্ধানশুলুকও জানি না।"

"কি করলে তাহলে এতদিন?"

"লেখাপড়া করেছি খালি। গানবাজনার চর্চাও করেছি—"

"ঝকমারি মুখ্যু। লেখাপড়ার মর্ম ও বুঝবে না। গানবাজনার দিক দিয়ে চেষ্টা করতে পার। আমার এখানে দিলরুবা আর সেতার আছে। ঝকমারির আর একটা ক্ষমতা আছে। ও মাঝে মাঝে ওর পূর্বজন্মে ফিরে যায়। তখন সব আশ্চর্য আশ্চর্য কথা বলে, মনে হয় ওকে ভূতে পেয়েছে—"

"তাহলে মেয়েটি তো রহস্যময়ী।..."

"চুপ, চুপ। বাঘটা দূরে একটা ঝোপ থেকে বেরুচ্ছে।"

সত্যই বাঘটা ঝোপ হইতে সন্তর্পণে মুখ বাহির করিয়াছিল। ধূর্জটিমঙ্গল আর বিলম্ব করিলেন না। মুগুর ও বর্শা লইয়া বাঘের দিকে ছুটিয়া গেলেন। এত শীঘ্র তিনি বাঘের সম্মুখীন হইলেন যে বাঘটা ভাবিতেই পারিল না সে কি করিবে। ধূর্জটিমঙ্গল প্রচণ্ড বেগে মুগুরটা বাঘের মাথায় মারিলেন।

বাঘটা কিন্তু সহজে কাবু হইল না। দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল ক্ষতবিক্ষত হইলেন। কিন্তু বাঘের কাছে হার মানিলেন না। তিনি যখন বাঘটার বুকে বল্লম বিঁধাইয়া তাহাকে দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন তখন নীলু রায়ও ছোরা হস্তে ছুটিয়া আসিয়া বাঘটাকে আঘাত করিতে গেলে ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে বারণ করিলেন।

"চামড়াটা আর নষ্ট কোরো না। মোক্ষম মার দিয়েছি ওকে। আর উঠতে পারবে না। দেখ তো আমার পিঠটার অবস্থা—"

"পিঠ তো রক্তে ভেসে যাচ্ছে—"

"ওখানে একটা থাবা বসিয়েছিল, দাঁত বসাতে পারেনি কোথাও। রক্ত এখুনি থেমে যাবে—"

ওরাঁওরাও আশেপাশের জঙ্গলে লুকাইয়াছিল। তাহারাও আসিয়া পড়িল। বাঘটা সত্যই মারা গিয়াছিল। জঙ্গল হইতে গাছের ডাল কাটিয়া শীঘ্রই জংলীরা একটা ডুলি বানাইয়া ফেলিল। সেই ডুলিতে বাঘটাকে তুলিয়া লইল তাহারা। ধূর্জটিমঙ্গলের জন্যও তাহারা পালকি আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন—না, আমি হেঁটেই যেতে পারব। আমার জন্যে কিছু মহুয়ার মদ এবং মধু যোগাড় কর। ধূর্জটি হাঁটিয়াই বাড়ি ফিরিলেন। তাঁহার পিঠটা অবশ্য একটা বড় চাদর দিয়া সকলে বাঁধিয়া দিয়াছিল। খুব বেশী রক্তপাত হয় নাই। কিন্তু কাপড়ে প্রচুর রক্ত লাগিয়াছিল। তাহা দেখিয়া জগদ্ধাত্রী আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমাকে না দেখে বাঘটাকে দেখ। আমার কিচ্ছু হয়নি। প্রকাণ্ড বাঘ, ও আমাকে কখনও ওমনি ছেড়ে দেয়?"

ঝকমারি আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল ধূর্জটিমঙ্গলকে।

"গড় করি তোমার পায়ে—"

ধূর্জটিমঙ্গলের মুখে হাসি ফুটিল।

"রাগ করবি না বল? তাহলে একটা কথা বলি—। কিছু ঘুগনি কর তো। আজ মহুয়ার মদ খাব। তার সঙ্গে মধু আর সেরখানেক গরম দুধ। তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে সব। বানুছিকে ডাকতে পাঠা। সে এসে তার জড়িবুটির মলম তৈরি করুক। আর ওদের সবাইকে খবর দে। নাচগান হোক—"

বানছি ওরাঁওদের মোড়ল এবং সুচিকিৎসক। সে একটু পরেই আসিয়া পড়িল। লোকটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং বেশ লম্বা। মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা। চূড়ার উপর কয়েকটি পালক। হাতে মোটা তামার বালা। গলায় একটি প্রকাণ্ড মাদুলি সোনার শিকল হইতে দুলিতেছে। মাদুলিটি বাইসনের শিঙের টুকরা একটি। তাহার দুই পাশে দুইটি সবুজ রঙের পাথরও রহিয়াছে। বানছি ধূর্জটিমঙ্গলের ক্ষতটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। তাঁহার নাড়ী দেখিল, চোখ দেখিল, জিভও দেখিল। তাহার পর বলিল—তাহাদের ভাষাতেই বলিল—"ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে। আমি সব সঙ্গে করে এনেছি।"

বানছির সহিত তিনটি লোক আসিয়াছিল। একটির মাথায় একটি প্রকাণ্ড ঝুড়ি। আর দুইজনের মাথায় দুটি মাটির ছোট কলসী। ঝুড়িতে ছিল তাহার জড়িবুটি। একটি কলসীতে ছিল ময়াল সাপের পিত্ত, আর একটি কলসীতে বাঘের চর্বি।

বানছি প্রকাণ্ড ঝুড়ির ভিতর হইতে একটা কুচকুচে কালো শিল এবং নোড়া বাহির করিল।

"এ দুটো পুড়িয়ে পবিত্র করে নে—"

বানছির অনুচর কাঠকুটা দিয়া আগুন জ্বালিয়া শিল-নোড়াকে পুড়াইতে লাগিল। বানছি ঝুড়ির ভিতব হইতে কিছু শুক্‌না ডালপালা এবং কিছু সবুজ গাছপালাও বাহির করিল। তাহাব পর ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে ফিরিয়া বলিল—"এইবার এমন একটি জিনিস চাই যা তোমাদের কাছেই আছে, আমার কাছে নাই। শিল নোড়াটা বার কবে ঠাণ্ডা করো। বাঘের চর্বিটা গলাও। আগুনের কাছে রাখ, আপনিই গলে যাবে।

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন "কি জিনিস চাই বল—"

বানছি সহাস্যদৃষ্টিতে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। তাহার পর বলিল—'যে মেয়েটি তোমাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে তার চোখের জল চাই কয়েক ফোঁটা। যে কলম তৈরি করব তাতে গাছগাছড়া, বাঘের চর্বি, ময়াল সাপের পিত্তি এসব তো থাকবেই, তোমার ভালবাসার লোকের চোখের জলও চাই একটু—"

ধুর্জটিমঙ্গল হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "আমার পক্ষে তা ঠিক করা শক্ত কে আমাকে বেশী ভালবাসে।"

বানছি বলিল—"ঝামরি পারবে। কেউ গিয়ে ঝামরিকে ডেকে আনুক। আরে, ওই যে ঝামরি এসে গেছে—"

নিকটেই বাঘটাকে রাখা হইয়াছিল। ঝামরি তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া তাহার গোঁফ ছিঁড়িতেছিল।

মোড়লই তাহাকে ডাকিল।

"ঝামবি শোন শোন। এদিক পানে আয় একবাব—"

ঝামবি কয়েক গাছা গোঁফ ছিঁডিয়াছিল।

"তুর কাছে আসছিলাম। এইগুলো দিয়ে আমাকে তাগদের ওষুধ বানিয়ে দে একটা। বুড়ো হ'তে চাই না। অনেক দিন আগে একটা বুনো কাড়ার বুকের ধুকধুকিটা খেয়েছিলাম, জন সাহেব মেরেছিল কাড়াটাকে। শুনেছি বাঘের গোঁফ দিয়েও তাগদের ওষুধ হয়।"

মোড়ল বলিল, "দেব। এখন তুই একটা কাজ কর দিকি। এ লোকটাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে কে সেটা বার করে' দে। তুই ছাড়া এ কাজ আর কেউ পারবে না—"

"কি করবি তাকে নিয়ে—"

"তার চোখের জল চাই। মলমে মেশাতে হবে।"

"ওকে যে কে বেশী ভালবাসে তা উয়াকেই শুধাও না—"

ধুর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি জানি না।"

"ইস্ ন্যাকা সাজছিস কেনে? তুই জানিস না?"

"না। জগদ্ধাত্রী?"

"আরে না না, জগদ্ধাত্রী তোকে ভক্তি করে। আর ভালবাসে ওই ছুঁড়িটা। ঝকমকি না কি যে নাম তার—"

ঝকমারি বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া সে একছুটে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"দাঁড়া ওকে ধরে আনছি আমি"—

ঝামরিও অন্দরের দিকে ছুটিল।

একটু পরেই ঝকমারিকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল সে।

"এই লাও, এর চোখের জল পাবে কি করে'? এ তো দজ্জাল মেয়ে, কাঁদবেক নাই—"

মোড়ল বলিল—"আমি চোখে একটু ওষুধ দেব। অনেক জল বেরিয়ে পড়বে। কোন ভয় নাই মা! বস। কোন কষ্ট হবে না। তোমার চোখের জল না পেলে এ মলমে ভালো কাজ হবে না।"

ঝকমারি ঝপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। ঝামরি কোমরে একটা হাত বঙ্কিম ভঙ্গীতে রাখিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিল ঝকমারির দিকে। তাহার সে নীরব হাসিটাও অদ্ভুত।

মোড়ল কি একটা গুঁড়া ঝকমাবিব চোখে দিতেই প্রচুর অশ্রুপাত হইতে লাগিল। একটি ছোট বাটিতে মোড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু সংগ্রহ কবিয়া বলিল—"এতেই হবে। তুমি এবাব যাও। ভিতরে গিয়ে জল দিয়ে চোখটা ধুয়ে ফেল ভাল করে।"

ঝকমারি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া গেল। ভিতরে গিয়াই সে জগদ্ধাত্রীকে বলিল—"বৌদি, তুমিও গিয়ে চোখেব জল দিয়ে এস।"

"আমি আবার কেন। তুই তো দিয়ে এলি।"

"তোমাব চোখের জলেই বেশী কাজ হবে। তুমি যাও। তুমি দাদাকে কত ভালবাস তা আমি জানি না? পাগলি ঝামবি কি জানে? ও কি ওজন দাঁড়ি হাতে করে' বসে' আছে, কার ভালবাসা কম, কাব ভালাবাসা বেশী তা মাপবে? মরণ আর কি! তুমি চল। দাঁড়াও আমি চোখে একটু জল দিয়ে নিই—"

ঝকমাবি চোখ ধুইয়া ফেলিল। তাহার পব জগদ্ধাত্রীকে লইয়া মোড়লের কাছে গেল।

"মোড়ল তুমি বউদির চোখের জলও নাও।"

মোড়ল হাসিয়া বলিল—"বেশ তো, বেশ তো। বস।"

ঝামরি হো হো করিয়া হাসিয়া এক ছুটে অন্তর্ধান করিল।

একটু পরেই নর্তক-নর্তকীর দল আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় পলাশফুল, গলায় মহুয়া ফুলের মালা। পরনে খাটো বস্ত্র। মেয়েদের বক্ষে কোনও আবরণ নাই। পুরুষদের মাথায় একগোছা

করিয়া বাজরার শিষ। গলায় হাড়ের মালা। পুরুষদের মধ্যে দুইজন মাদল বাজাইতেছিল, দুইজন বাঁশী। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মুখে হাসি। সকলেরই হাতে এবং বাজুতে রূপার অলঙ্কার। সকলে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, মাদলের তালে তালে সকলেরই অঙ্গ দুলিতে লাগিল। তাহার পর শুরু হইল গান। গানের বাংলা তর্জমা করিলে সে গানের মাধুর্য বোঝানো যাইবে না। কারণ তাহাদের ভাষার এবং উচ্চারণের বিশেষ মিষ্টত্ব সে অনুবাদে ফুটিবে না। তবু অনুবাদ দিতেছি—

ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা নদীর কিনারে
দাঁড়িয়েছিল মহুয়া
রসবতী মহুয়া
কার লাগি দাঁড়িয়েছিল কে জানে
তা কে জানে
সুড়সুড়িয়ে বাতাস এসে বলল কানে কানে
তাব বললে কানে কানে
ওৎ পেতে বসে আছে দেখ না ভাল করে
ও কি রে তোর মিতা
মহুয়া দেখে বসে' আছে সোনার বরণ চিতা
দেহভবা কালো কালো চোখ
অনেকগুলো চোখ
চোখে পলক পড়ে না
হাজার চোখে চেয়ে আছে চিতা
চোখে পলক পড়ে না
মহুয়ার বুকের ভিতর কাঁপে বারে বারে—
ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা নদীর কিনারে।
ওবে নদীর কিনারে—

মোড়ল নানান জিনিসপত্র মিশাইয়া মলমটা প্রস্তুত করিয়া ফেলিল অবশেষে। তাহার পর সেটাকে রেশমের মজবুত কাপড়ের উপর বিছাইয়া

ধূর্জটিমঙ্গলের পিঠের উপর বেশ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। গান ও নাচ চলিতে লাগিল। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমাকে কাল সকালে কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে' কলকাতার দিকে যেতে হবে পারব ত?"

"খুব, খুব—"

মোড়ল ভরসা দিল।

"পনেরো দিন পট্টিটা বাঁধা থাকবে। তারপর ওটা খুলে ফেলতে হবে। আমি সঙ্গে লোক দেব। সেই সব করবে।"

হঠাৎ ঝামরি আবার আসিয়া উপস্থিত হইল।

মোড়লের দিকে বাঘের গোঁফের লোমগুলি আগাইয়া দিয়া বলিল—"নে, আমার ওষুধ বানিয়ে দে—"

"ওষুধ বানাতে একমাস দেরি হবে। আমার কাছে আর একটা বাঘের গোঁফ থেকে তৈরি বড়ি আছে। নিবি?"

"না। এইটে থেকেই বানিয়ে দে। এ বাঘটা আমার নাগর যে—"

"নাগর? বলিস কি!"

"হঁগো। হাঁকাড় দিয়ে রোজ ডাকত আমায়। বলত আয় আয় কাছে আয়, তোর ঘাড় মটকে খাই। এখন আমি বাগে পেয়েছি, আমিই তার গোঁফ ছিঁড়ে নিলাম। হি হি হি হি—"

হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল ঝামরি।

তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া ধূর্জটিকে প্রণাম করিয়া ফেলিল একটা।

"তুই বীর বটিস। আমার নাগরটাকে আমার কাছে এনে দিলি। আর কেউ পারতোক না। ও কি মরেছে? মরে নাই। ওরা মরে না—আড়ালে লুকিয়ে থাকে।"

ধূর্জটিমঙ্গল হাসিয়া বলিলেন—"বাঘ ভাল্লুক যে কারো নাগর হয় তা তো জানতাম না!"

ঝামরি বলিল—"মানুষ নাগরও তো বাঘ-ভাল্লুক গো। আমার মানুষ নাগর নাই। আমার নাগররা সব বুনো জানোয়ার। হাতী, কাড়া, চিতা, শম্বর এরাই আমার নাগর। রঙ্কিণী বলেছে তোর নাগরদের কেউ যদি মারে আমি তাকে দণ্ড দেব। তোকে দণ্ড দেবে রঙ্কিণী মনে রাখিস, সেটা—"

এই বলিয়া সে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে আঙুল নাড়িয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিল।

মোড়ল ধমকাইয়া উঠিল।

"এখন নাখড়া করিস না ঝামরি। বাবুকে একটু ঘুমাতে দে। কাল ভোরে আবার যেতে হবে—"

"বেশ বেশ আমি যেছি—"

অভিমানেব ভান করিয়া কিন্তু মুচকি হাসিতে হাসিতে গা দোলাইয়া ঝামরি চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া ভিতরের দিকে যাইতেছিলেন এমন সময় পালকির শব্দ পাওয়া গেল। শব্দ করিতে করিতে একদল পালকিবাহক একটি সুসজ্জিত পালকি লইয়া প্রবেশ করিল।

পালকি হইতে অবতরণ করিলেন—একটি দীর্ঘাকার প্রৌঢ় ব্যক্তি। তাঁহার মাথায় পাখীর পালকের মুকুট, হাতে ধনুক, কাঁধে তূণীর, তূণীরে অনেক শাণিত তাব। অঙ্গেও তাঁহার বহুমূল্য ভূষণ। গলার হারে একটা বহুমুল্য হীরকই বোধহয় জ্বলিতেছিল। নগ্নগাত্রে ভেলভেটের একটা জামা অনেকটা ফতুয়ার মতো। গলায় একটা রেশমের চাদর দুইই জরির কাজ-কবা। মুখ-ভাব বুদ্ধিদীপ্ত, বীরত্ব-ব্যঞ্জক।

পালকির সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন মধু সামন্ত। তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন—"ধলরাজা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

নমস্কারাদি বিনিময়েব পর ধূর্জটিমঙ্গল ধলরাজাকে স-সম্ভ্রমে বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। বৈঠকখানা জন সাহেবের রুচি অনুসারে সজ্জিত। ধলরাজা ধনুকটি তাঁহার একজন পার্শ্বচরের হাতে দিয়া একটি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। চেয়ারে ঠেস দিলেন না, খাড়া হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি যে ভাষায় কথা বলিলেন তাহা ওঁরাও ভাষা।

মধু সামন্ত দো-ভাষার কাজ করিলেন। বাংলায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার বক্তব্যটি ধূর্জটিকে শুনাইলেন।

মধু সামন্ত বলিলেন, "আপনি মুর্শিদাবাদে যাচ্ছেন এই খবর পেয়েই ইনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি একটি খবর গুপ্তচরের মারফত

পেয়েছেন, জন সাহেব না কি নবাবদের হাতে বন্দী হয়ে মুর্শিদাবাদ গারদ-খানায় আছেন। তাঁর সঙ্গে যে তিনটি ওঁরাও যুবতী গিয়েছিল তাদের কিন্তু কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আমার বিশ্বাস কারারক্ষীকে কিছু ঘুষ দিলে জন সাহেব জেল থেকে পালাতে পারবেন।

ধলরাজা বলছেন জন সাহেব যদিও বিদেশী লোক তবু তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আমাকে অনেক দামী দামী মদ উপহার পাঠাতেন। আমাদের উৎসবে গিয়ে নৃত্য করতেন অনেক সময়। ভারী আমুদে লোক ছিলেন। ভালো হরিণের মাংস পেলেই উপহার পাঠাতেন আমাকে। নবাবের কাছে একবার খাজনা পাঠাবার সময় আমার পাঁচশ আসরফি কম পড়েছিল। জন সাহেব সেটা দিয়ে দিয়েছিলেন, আর ফেরত নেন নি। বলেছিলেন বন্ধুর বিপদের সময় সামান্য টাকা দিয়েছি তা আবার ফেরত নেব কেন। আমি যদি কখনও বিপদে পড়ি তখন না হয় দেবেন। জন সাহেব আজ বিপদে পড়েছেন, আমি হাজার আসরফি তাঁর জন্যে এনেছি। সেটা আপনি নিয়ে যান। আমার বিশ্বাস কারারক্ষী একশ আসরফি পেলেই তাঁকে ছেড়ে দেবে। আর ওই যুবতী তিনটিরও খোঁজখবর করবেন একটু। আমি দু'জন ঘোড়সোয়ার পাঠিয়েছি, তারা আপনার জন্যে পথে তাজা ঘোড়ার বন্দোবস্ত রাখবে। বিশ ক্রোশ অন্তর অন্তরই আপনি নূতন ঘোড়া পাবেন একটা। তাছাড়া আপনার সঙ্গে থাকবে দশটি ডুলি। আর কিছু সৈন্যসামন্ত। কিছু ঘোড়সোয়ারও আপনার সঙ্গে থাকবে। আর আগে পিছে দুটি দল তীরধনুক নিয়ে পায়ে হেঁটে যাবে। ইনি আপনাকে আর একটা কথা জিগ্যেস করছেন। জন সাহেবকে যদি আমরা উদ্ধার কবতে না পারি তাহলে তাঁর বিশাল সম্পত্তির কি হবে? তিনি কি যাওয়ার আগে আপনাকে কিছু বলে গিয়েছিলেন।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"তিনি বলে' গিয়েছিলেন আমি যদি না ফিরি তাহলে আপনিই আমার এ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন। আরও বলে গিয়েছিলেন আমি যতদিন না ফিরি এ সম্পত্তি আপনিই ভোগ দখল করবেন।"

মধু সামন্ত বলিলেন—"ধলভূমের রাজা শুনেছেন এ সম্পত্তির অধিকার

তিনি দিল্লীর বাদশাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। বাংলার নবাব সরকারে নিশ্চয় কর দিতে হয়। সেটা কি আপনি দেবেন?"

"আমিই দেব। আপনার আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলুন।"

ধলভূমের রাজা হাসিমুখে ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর যাহা বলিলেন তাহার অনুবাদও করিলেন মধু সামন্ত।

"ধলরাজা বলছেন এ আমাদের দেশ। সিংবোঙা এদেশের মালিক, আমরা তাঁর প্রজা। যদিও আমরা বাইরের লোকদের অনাদব করি না কিন্তু তবু আমরা এটা চাই না যে কোনও বিদেশী এখানে পাকাপাকি বসবাস করুক। পাকাপাকি বসবাস করলে মেয়েদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। ফলে কিছুদিন পরে এমন সব ছেলেমেয়ে জন্মাতে থাকে যারা হো নয়, ওঁরাও নয়। একটা খিচুড়ি জাত তৈরি করার পক্ষপাতী আমি নই। তাই আমার ইচ্ছা যে জন সাহেব এখানে যদি না ফিরে আসেন তাহলে তাঁর বিষয় সম্পত্তি আমিই দখল করব। আপনাকে যদি তিনি উত্তরাধিকারী করে' গিয়ে থাকেন আমি আপনাকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে তাঁর এ বিষয়টা কিনে নেব। আপনি এ কথাটা ভেবে দেখবেন। অবশ্য জন সাহেব যদি ফিরে আসেন তাহলে তাঁর সঙ্গেই এ বিষয়ে আলোচনা করব। আপনিও আমাকে বন্ধু বলে' জানবেন, আর যা বললাম তা বন্ধুর মন দিয়ে বিচার করে' দেখবেন। আর একটা কথা। ইংরেজরা এদেশে প্রভুত্ব করুক সেটা আমি চাই না। নবাবদের নানারকম অত্যাচার আছে তা মানছি কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব নবাবরা নামেই নবাব। আমাদের দেশের প্রকৃত মালিক আমরাই আছি। ইংরেজ প্রভু হ'লে হয়তো তা থাকবে না। নবাবরা নবাব! তারা নবাবি ছাড়া আর কিছু চায় না। এরা নবাব নয় ব্যবসাদার, এরা ওপর ওপর আমাদের উপর হয়তো কিছুটা সুবিচার করবার ভান করবে, কিন্তু এরা নবাব নয় এরা ব্যবসাদার এরা আমাদের শোষণ করবে। আপনি গিয়ে চেষ্টা করুন যাতে নবাব পক্ষের জয় হয়। চিঠি চারখানি দিয়ে আসুন; যদি যুদ্ধ বাধে আমরা সৈন্য দিয়ে নবাবকে সাহায্য করব। সেটা কিভাবে করা সম্ভব তা-ও জেনে আসুন। মীরজাফর শুনেছি নবাব সাহেবের সেনাপতি। পারেন তো তার সঙ্গেও দেখা করবেন। আর জন সাহেব আমাদের বন্ধু লোক তাঁর জন্য সঙ্গে

আমাদের বিবাদ নেই, তাঁকে আমরা রক্ষা করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। আর একটা কথা। শুনলাম আপনি কাল সকালে যাবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু আমার পরামর্শে এখনই বেবিয়ে পড়ুন। বাঘে আপনার পিঠে থাবা মেরেছে, মোড়ল বলছে একটু মাংস ছিঁড়ে গেছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু ওই নিয়ে আপনি যদি এখন শুয়ে পড়েন, কাল সকালে উঠতে পাববেন না। ভয়ানক ব্যথা হবে। ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারবেন না। এখন যদি বেরিয়ে পড়েন রাস্তায় চলতে চলতে ব্যথা কমে' যাবে। ঘুম ব্যথা বাড়িয়ে দেয়। আপনার সঙ্গে সঙ্গে পালকিও থাকবে। ঘোড়ায় চড়তে যদি অসুবিধা হয় পালকিতে চড়ে যাবেন। কিন্তু জেগে থাকবেন। মোড়ল বলছে আপনি ঘোড়াতে চড়েই যেতে পারবেন।"

"বেশ তাই যাব। খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ব।"

"খুব বেশী খাবেন না—"

"না। ভাত রুটি খাব না। একটু দুধ মধু, আর মহুয়া খাব"

"সেই ভালো হবে। আপনার সঙ্গে খাবার থাকবে প্রচুর। তাছাড়া শিকারী যাচ্ছে কয়েকজন, তারা পথে শিকারও করবে—ভয়ের কোনও কারণ নেই। বন্দোবস্ত সব ঠিক থাকবে। খেয়েদেয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ুন। আমি তাহলে এখন উঠি—"

ধলরাজা উঠিয়া পড়িলেন। এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। ভিতর হইতে ঝকমারি বাহির হইয়া আসিয়া ধূর্জটির দিকে চাহিয়া বলিল—"আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তারও ব্যবস্থা কর।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে! সে কি"—ধূর্জটিমঙ্গল সত্যই বিস্মিত হইয়া গেলেন।

"আমি তোমাকে একা যেতে দেব না। আমি তো ঘোড়ায় চড়তে জানি। তোমার পিছু পিছু ঘোড়ায় চড়েই যাব। আমার জন্যে একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে বল ধলরাজাকে—"

ধলরাজা নিজের নামটা শুনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মধু সামন্তের দিকে চাহিলেন।

মধু সামন্ত তাঁহাকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেই ধলরাজা বলিলেন—"স্ত্রীলোক নিয়ে পথ চলায় বিপদ আছে। কিন্তু উনি যদি না-ছোড় হন

নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। উনি ঘোড়ায় চড়তে পারবেন তো? না, পালকির ব্যবস্থা করতে হবে?"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "পারবে। ওর বাইরেটাই স্ত্রীলোকের মতো। ভিতরে ও পুরুষ!"

"উনি আপনার কে হন?"

ধলরাজার এই প্রশ্নের উত্তরে ধূর্জটি বলিলেন, "রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু ও আমাদের বাড়ীতে মানুষ হয়েছে। বারাসতের বাড়ীতে ছিল, এবার আমার সঙ্গে এসেছে—"

"আমি তাহলে তৈরী হয়ে নি?"

ঝকমারি ভিতরে চলিয়া গেল।

নীলু রায় এতক্ষণ কিছু বলেন নাই। কিছু না বলিয়াই তিনি বাহিরের প্রাঙ্গণে গিয়া পদচারণা শুরু করিলেন।

ধলরাজা এবং মধু সামন্তও ধূর্জটিমঙ্গলকে পুনরায় আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিলেন। অন্দরের দিকে গেলেন ধূর্জটিমঙ্গল। গিয়া জগদ্ধাত্রীর খোঁজ করিলেন। ঝকমারিকেও দেখা গেল না। জগদ্ধাত্রীর খাস পরিচারিকা রুলা বলিল—"মা ঠাকুরঘরে।"

ধূর্জটি ঠাকুরঘরে গিয়া দেখিলেন জগদ্ধাত্রী উপুড় হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন। ঠিক তাহার পিছনে প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া আছে ঝকমারি। ধূর্জটিমঙ্গলও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সরিয়া গেলেন।

৪

নীলু রায় অন্ধকার প্রাঙ্গণে পদচারণ করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন এবার কি করা কর্তব্য। তিনি দাবা খেলোয়াড়, সঙ্গীতবিশারদও। দাবার যে চালটা ভাবিয়া তিনি ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত কলিকাতা হইতে এতদূর আসিয়াছিলেন, অনুভব করিলেন সে চালটায় বাজি মাত করা সম্ভব নয়। সেতারের যে সুরটা বাজাইবেন ভাবিয়াছিলেন সে সুরটা বাজানো গেল না, গোড়াতেই সেতারের তারটা ছিঁড়িয়া গেল। নীলু রায়কে ধূর্জটিমঙ্গলের বন্ধু বলিয়াছি। কিন্তু সে বন্ধুত্ব লৌকিক বন্ধুত্ব, মৌখিকও বলিতে পারেন। কয়টা লোকের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় আমাদের জীবনে? নীলু রায়ও ধূর্জটিমঙ্গলের প্রকৃত বন্ধু নহেন। সুতানুটিতে উভয়ের একপাড়ায় বাড়ি, ছেলেবেলায় এক পাঠশালায় সীতারাম পণ্ডিতের হাতে উভয়েই শাস্তিভোগ করিয়াছিলেন, বন্ধুত্বের সূত্র এইটুকু। শত্রুতার সূত্রও আছে। প্রথম এবং প্রধান সূত্র অবস্থা-বৈষম্য। ধূর্জটি বড়লোক, তাঁহার অনেক বিষয়সম্পত্তি, অনেক লোক তাঁহার কথায় উঠে বসে, অনেক লোক তাঁহাকে খাতির করে। নীলু রায় সে তুলনায় নিষ্প্রভ। তিনি সাধারণ গৃহস্থ। খাওয়া-পরার অভাব নাই, কিন্তু তিনি ধনী নহেন, মধ্যবিত্ত। ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়ীতে যেমন বারো মাসে তের পার্বণ, সেখানে সর্বদাই যেমন দীয়তাং ভুজ্যতাং, নীলু রায়ের বাড়িতে তেমন নাই। ধূর্জটিমঙ্গলের মতো লোকলস্কর দারোয়ান চোপদার, ঘোড়া, পালকি, তাঞ্জাম ডুলি, নীলু রায়ের নাই। নীলু রায় পদব্রজেই ভ্রমণ করেন। দূরে যাইতে হইলে তাঁহাকে গাড়ি কিম্বা ঘোড়া ভাড়া করিতে হয়। ধূর্জটিমঙ্গলের মতো উজ্জ্বল বংশপরিচয়ও তাঁহার নাই। ধূর্জটিমঙ্গলের পিতা বিখ্যাত মহেশমঙ্গল, কিন্তু নীলু রায়ের পিতা কুখ্যাত ব্যক্তি। তিনি আগ্রায় থাকেন, আচারআচরণ মুসলমানী। যৌবনকালেই ভাগ্য অন্বেষণ মানসে তিনি আগ্রা চলিয়া যান। সেখানেই একটি ফলের দোকান করেন, এবং তাঁহার কিশোরী স্ত্রী ফুলমণিকে সেখানেই

লইয়া যান। কলিকাতার বাড়িতে তাঁহার বালবিধবা ভগ্নী দুর্গা এবং তাঁহার দেবর বালক দ্বিজদাস বসবাস করিতেন। জমিজমা হইতে যে আয় হইত, তাহাতে সংসার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবার কথা। কিন্তু নীলু রায়ের পিতা জনক রায় উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বেশী উপার্জন-আকাঙ্ক্ষায় উত্তর প্রদেশে চলিযা গেলেন। আগ্রায় ফলের দোকান করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং ফুলমণিকেও লইয়া গেলেন। তাহার পর সহসা একদিন তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন। সঙ্গে ছয় মাসের একটি শিশু। পোশাক-পরিচ্ছদ মুসলমানী। গোঁফ কামাইযা নুর রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে যে মুসলমান ভৃত্যটি আসিয়াছে সে তাঁহাকে জন্নু মিঞা বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। জন্নু মিঞা বলিলেন—এই শিশুটি প্রসব কবিবার সময় ফুলমণি মরমর হইয়াছিল। আগ্রার হেকিমদের চিকিৎসা নৈপুণ্যে কোনক্রমে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, আয়ুও শেষ হইয়াছিল, কিছুদিন আগে সে মারা গিয়াছে। তাই দুর্গার কাছেই সে শিশুপুত্রটিকে রাখিয়া যাইতে চায়। দ্বিজদাসকে কিছু টাকা দিয়া বলিলেন—ভালো দেখে গাই একটা কিনে নিও। আমি তো বিষয়-আশয় থেকে এক পয়সাও নিইনি, নেবও না। তবে ছেলেটার যেন অযত্ন না হয়। এর বেশী আমি আর কিছু চাই না। বাঙালীর ছেলে বাংলা দেশেই মানুষ হোক। ওদেশে মানুষ হলে ও আর বাঙালী থাকবে না। আমার দশা দেখছ না! আমি কি আর বাঙালী আছি?”

দ্বিজদাস জন্নু মিঞার মুসলমান ভৃত্যটির নিকট যে সংবাদটি পাইয়াছিলেন তাহা অনেকদিন কাহাকেও বলেন নাই। না বলাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন এই কারণে যে ইহা প্রকাশ করিয়া কোনও লাভ নাই বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা। জন্নু মিঞা গানবাজনা চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। সারেঙ্গী নামক যন্ত্রটি তিনি নাকি খুবই ভালো বজাইতে পারিতেন। আগ্রার ফলের দোকানটি যে কিভাবে উঠিয়া গেল তাহার খবর দ্বিজদাস জানিতে পারেন নাই। এইটুকু শুধু জানিয়াছিলেন যে জন্নু মিঞা এখন ফলের ব্যবসা করেন না, বাইজী লইয়া গানবাজনার ব্যবসা করেন, আমীর ওমরাহদের বাড়ীতে ‘মুজরা করিয়া বেড়ান, তাঁহার অধীনে নাকি কয়েকটি খপসুরৎ বাইজী আছে। এ খবরটা তিনি কাহাকেও বলেন নাই।

দ্বিজদাসবাবু যথাসময়ে বিবাহ করিয়াছিলেন। বধূ যাদুমণিকে দুর্গার কাছেই আনিয়াছিলেন তিনি। নিজের বাড়ীতে না লইয়া গিয়া দুর্গার কাছেই আনিয়াছিলেন কারণ তাঁহার নিজের বাড়ি বেহাত হইয়া গিয়াছিল। নবাব সরকারের একজন গোমস্তা রমজান আলীকে তিনি বাড়িটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেকদিন নাকি খাজনা দেওয়া হয় নাই, দ্বিজদাসের বাড়ি এবং কয়েক বিঘা জমি নাকি নীলামে উঠিয়াছিল, নবাব সরকারের উক্ত গোমস্তাটি বলিলেন 'তোমার বাড়ীতে যদি আমাকে থাকিতে দাও এবং তোমার জমি যদি আমাকে ভোগ করিতে দাও তাহা হইলে তোমার বাড়ী জমি নীলাম হইবে না। নবাব সরকারের আমলার সম্পত্তি নীলাম হয় না। এখানকার ফৌজদারও আমার ফুফা। আমি তোমাকে মাসে মাসে কিছু ভাড়া দিব এবং তাহা দিয়াই তোমার বাকি খাজনার উশুল করিব। সুতরাং সম্পত্তি তোমারই থাকিয়া যাইবে শেষ পর্যন্ত। দ্বিজদাসকে কিন্তু আমরণ তাঁহার বৌদিদি দুর্গার কাছেই থাকিতে হইয়াছিল। বাড়ি বা সম্পত্তি তিনি ফেরত পান নাই। পরিবর্তে অবশ্য পাইয়াছিলেন রমজান আলীর বন্ধুত্ব। নবাবী আমোলে সেটাও কম নয় সুতরাং দ্বিজদাস যখন বিবাহ করিলেন তখন বধূ যাদুমণিকেও দুর্গার সংসারেই আনিতে হইল। কিছুদিন বেশ ভালোভাবেই কাটিল। কিন্তু যাদুমণির একটি পুত্রসন্তান হওয়ার পর দ্বিজদাসকে উপলব্ধি করিতে হইল যে জননীরা ব্যাঘ্রিণীর মতো। দুই ব্যাঘ্রিণী একসঙ্গে থাকিতে পারে না। নীলুকে দুর্গা পুত্রবৎ মানুষ করিতেছিলেন, যাদুমণিও দেখিলেন তাহার পুত্রটির যতটা যত্ন হওয়া উচিত এ সংসারে ততটা হইতেছে না। আপাতদৃষ্টিতে যাহা অতি তুচ্ছ ইহাদের দৃষ্টিতে তাহা উচ্চ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কলহ এমন পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত উঠিল যে যাদুমণি একদিন বাপের বাড়ি চলিয়া গেলেন। হরিপালে বাপের বাড়ি। একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া চলিয়া গেলেন তিনি, স্বামী দ্বিজদাসকে বলিয়া গেলেন, আর ফিরিবেন না। যাদুমণি বাপের একমাত্র সন্তান, সুতরাং পিতৃগৃহে তাঁহাকে অমর্যাদা করিবার মতো লোক ছিল না। যাদুমণির মাতা বাতরোগে কাতর হইয়া থাকিতেন, কন্যা আসাতে সংসারের যাবতীয় ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি ঠাকুরঘর আশ্রয় করিলেন। যাদুমণির পিতা রত্নেশ্বর খুব বড়লোক না হইলেও

সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। ঘরে গাই ছিল, পুকুর ছিল, গৃহসংলগ্ন ছোটখাটো বাগানও ছিল একটা। ভাগে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াও জমি হইতে যে পরিমাণ ধান পাইতেন তাহাতে তাঁহাদের সম্বৎসর নিজেদের খাওয়াপরা তো চলিতই—অন্যান্য খরচও চলিয়া যাইত। যাতুমণি এই সংসারে সর্বেসর্বা হইয়া রহিলেন। ঘরজামাই হইয়া শ্বশুরবাড়িতে থাকিতে দ্বিজদাসের আত্মসম্মানে কিন্তু বাধিল। তিনি মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে আসিতেন দুই একদিনের জন্য, দুর্গার কাছেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন তিনি। দুর্গার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধানও করিতেন। এইভাবেই চলিতেছিল। কিন্তু বেশীদিন চলিল না। বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল। দুর্গা ম্যালেরিয়াতে ভুগিতেছিল বহুদিন হইতে। কবিরাজের পাচন, তারকেশ্বরের মানত, গ্রহশান্তির মাতুলি কোন কিছুই তাহাকে নিরাময় করিতে পারে নাই। ইহার উপর যখন সে আমাশয় রোগে পড়িল, তখন আর সামলাইতে পারিল না। ত্রিশ বৎসর বয়সেই তাহাকে জরাজীর্ণা বৃদ্ধার মতো দেখাইত। তাহার পর হজমের গোলমাল হইয়া যখন অতিসার রোগে ধরিল তখন শয্যা লইতে হইল তাহাকে। কিছুদিন পরে মারা গেল সে। মৃত্যুকালে সে দ্বিজদাসকে বলিয়া গেল—"আমার পাপের জন্যেই এই শাস্তি। তোমার বৌয়ের সঙ্গে আমি মানিয়ে চলতে পারি নি। সেটা আমার দোষ। আমি চললুম। তাকে আবার এই সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তা না হলে চারবছরের ছেলে নীলুকে দেখবে কে। তোমার ছেলে আর নীলু দু'জনেই যাতুমণির কাছে মানুষ হোক"। যাতুমণি প্রথমে আসিতে রাজি হন নাই। বুড়ো বাবা-মাকে কে দেখিবে। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায়ের স্বরূপ আবার প্রকটিত হইল। যাতুমণির বাবা সন্ন্যাসরোগে হঠাৎ মারা গেলেন। দ্বিজদাস তখন প্রস্তাব করিলেন যে যাতুমণি তাহার মাকে লইয়াই সুতানুটিতে চলুক। হরিপালের বিষয়ের তত্ত্বাবধান সে সুতানুটিতে বসিয়াই করিবে। তাহাই হইল। দুই বৎসরের শিশুপুত্র এবং বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া যাতুমণি আবার স্বামীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীলুর বয়স তখন চার বৎসর।...

নীলু রায় অঙ্গনে পরিক্রমণ করিতে করিতে নিজের অতীত জীবন পর্যালোচনা করিতেছিলেন। সবটা স্পষ্ট মনে ছিল না। কিছুটা লোক-মুখে শুনিয়াছিলেন। দুর্গাকে তাঁহার মনে পড়ে না। যাতুমণিকে পড়ে।

ছয় বৎসর যাতুমণির স্নেহের অত্যাচার তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। যাতুমণির ক্ষুধিত স্নেহ যেন নাগপাশের মতো তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। হরিপাল হইতে আসিবার বছর তুই পরেই তাহার পুত্রসন্তানটি সদিজ্বরে মারা যায়। শেষে তাহার নাকি দমবন্ধ হইয়া গিয়াছিল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে পারে নাই। দ্বিজদাস কিছুকাল পূর্বে পশ্চিমদেশীয় এক সাধুর নিকট মন্ত্র লইয়াছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। ছয় মাস তাঁহার কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। পাড়ার নিমু গোঁসাই পিতৃপিণ্ড দিবার জন্য গয়াধামে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার সহিত দ্বিজদাসের দেখা হইয়াছিল। বলিলেন দ্বিজু সন্ন্যাস লইয়াছে, সে আর সংসারে ফিরিবে না। তাহার গুরুর আশ্রম লছমন-ঝোলার কাছে। সেইখানেই সে বাকি জীবনটা কাটাইয়া দিবে। দ্বিজদাস সত্যই আর ফেরেন নাই। তখন সংসারের হাল ধরিলেন যাতুমণি। তাহার মা শয্যাগত হইয়া বহুকাল বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার সমস্ত সেবা যাতুমণি করিতেন। নীলুকে স্বহস্তে তিনি স্নান করাইতেন। নিজে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেন। কোনও ওজর-আপত্তি শুনিতেন না। নীলু খাওয়ার সময় তুর্গার কাছে নানা বায়না করিত। এটা ঝাল, এটা তেতো, পলতা খাব না, ওল খাব না ইত্যাদি নানারকম ওজর তুলিয়া খাইতে চাহিত না। তুধ খাওয়ানো একটা সমস্যাই ছিল। কিন্তু যাতুমণির আমলে ছবি বদলাইয়া গেল। তিনি তাহাকে ঘাড় ধরিয়া স্বহস্তে খাওয়াইতেন। ভাত ডাল তরকারির গোলা পাকাইয়া মুখে গুঁজিয়া দিতেন। নীলু বেশী আপত্তি করিলে ঠাস ঠাস করিয়া চড়াইয়া দিতেন তাহাকে। মুখে স্বহস্তে তুধের বাটি ধরিতেন, এবং তুধ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া থাকিতেন। সামনের মাঠে নীলু যখন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলিত তখনও তিনি সেদিকে জানালা খুলিয়া তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তাহার পালঙ্কটা খুব উঁচু ছিল, যাতুমণি তাহার চারিদিকে উঁচু কাঠের বেড়া বানাইয়া লইয়াছিলেন পাছে নীলু রাত্রে ঘুমের ঘোরে বিছানা হইতে পড়িয়া যায়। সেই বিছানাতেই তিনি নীলুর পাশে শুইতেন। রাত্রে মাঝে মাঝে নীলুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত। নীলু দেখিত যাতুমণি ঘুমের ঘোরে তাহাকে সবলে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। কিছুতেই যেন ছাড়িবে না।

বিষয়-সম্পত্তির ভারও লইয়াছিলেন যাদুমণি। তাঁহার দূর-সম্পর্কের এক জ্ঞাতিভাই সর্বেশ্বরকে মাসিক দশ টাকা বেতনে বহাল করিয়াছিলেন। সেকালের পক্ষে মাসিক দশ টাকা বেশ ভালো বেতন। সর্বেশ্বরকে হরিপালের বিষয় এবং সুতানুটির বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় কাজ করিতে হইত। প্রজাদের জমি বিলি করা, ধান আদায় করিয়া আনা, সে ধান বিক্রয় করা, জমিদারকে খাজনা দেওয়া, গোমস্তাদের সহিত ভাব-সাব রাখা—এ সবই করিতে হইত তাহাকে। হরিপালের বসত বাটিতে কৃষ্ণ বাচস্পতিকে বাস করিতে দিয়াছিলেন তিনি। কৃষ্ণ বাচস্পতি পণ্ডিত লোক, কিন্তু অতি দরিদ্র, জীর্ণ পর্ণকুটিরে বাস করিতেন। তিনি নিঃসন্তান, বৃদ্ধা পত্নীটিই তাঁহার একমাত্র আত্মীয়। বাল্যকাল হইতেই বাচস্পতি মহাশয়কে ভক্তি করিতেন যাদুমণি। ছেলেবেলায় তাঁহারই পাঠশালায় যাদুমণি কিছুদিন পড়িয়াছিলেনও। বাচস্পতি মহাশয়কে তিনি হরিপালের বাড়ির ভদ্রাসনে বসাইয়া বলিলেন, "পণ্ডিতমশায়, আপনি এখানেই থাকুন। সর্বেশ্বর আপনার দেখাশোনা করবে। আমার জমি থেকেই আপনাদের ভরণপোষণ হবে। আপনি আপত্তি করবেন না। আশীর্বাদ করুন আমার নীলু যেন বেঁচে থাকে। আমার তো সব গেছে, আপনাদের আশীর্বাদে নীলু যদি ভালো থকে, ও যদি মানুষের মতো মানুষ হয় তাহলেই যথেষ্ট। আর আমি কিছু চাই না। নীলু প্রণাম কর বাবা পণ্ডিতমশাইকে—"

হরিপালে যখনই যাইতেন যাদুমণি নীলুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন।

পিছনের দিকে হস্তনিবদ্ধ করিয়া পদচারণ করিতে করিতে নীলু রায়ের সহসা মনে হইল বিধাতা তাঁহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। যখনই তাহার জীবনে সৌভাগ্যের অঙ্কুর গজাইয়াছে অমনি সেটাকে তিনি যেন দুপায়ে মাড়াইয়া পিষিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার বয়স যখন বারো বছর তখন যাদুমণিও মারা গেলেন হঠাৎ। ওলাউঠার মহামারী বন্যায় নীলু রায়ের স্নেহের একমাত্র আশ্রয়নীড়টি ভাসিয়া গেল। নীলুর তখন ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত ভাব হইয়াছে। একই পাঠশালায় পড়েন, একই মাঠে খেলাধূলা করেন। ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। ধূর্জটিমঙ্গলের মা তাহাকে স্নেহ করিতেন। ঝকমারিকে তিনি শৈশব হইতেই দেখিয়াছেন।

ধূর্জটিমঙ্গলরা খুব ধনী, কিন্তু তাঁহাদের ঐশ্বর্যের উত্তাপ ছিল না। সাধারণ সাদা-মাটা চালই ছিল তাঁহাদের। ধূর্জটিমঙ্গল বড় হইয়া একটি ঘোড়া কিনিযাছিলেন, কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গলের বাবার আমলে নিজেদের কোনও যানবাহন ছিল না তাহাদের। পোশাক-পরিচ্ছদেও বিশেষ কোন চটক ছিল না। খাওয়াদাওয়াতেও না। সাধারণ গৃহস্থের মতই থাকিতেন তাঁহারা। বাড়িতে অবশ্য বারো মাসে তের পার্বণ হইত এবং সে পার্বণে পাড়ার সবাই যোগ দিত। অনেক দুঃস্থ এবং গরীব লোককে প্রতিপালন করিতেন তাঁহারা। যাদুমণি যখন মারা গেলেন তখন ধূর্জটির মা সর্বমঙ্গলা নীলুকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন—তুই আমাদের বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করিস। সর্বমঙ্গলার সহিত ঘনিষ্ঠতাটা এমন নিবিড় হইয়াছিল যে নীলু রায় এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচবোধ করিলেন না। ধূর্জটিমঙ্গলদের পরিবারেরই একজন হইয়া গেলেন তিনি। রাত্রে অবশ্য নিজেব বাড়িতে শুইতে যাইতেন। তাঁহার বাড়িটা ক্রমশঃ পাড়ার ছেলেদের আড্ডাঘর হইয়া পড়িল। তাস-পাশা খেলা হইত। ধূর্জটিমঙ্গল কয়েকটা হুঁকা এবং একটা বড় গড়গড়াও আমদানী করিয়াছিলেন সেখানে। যৌথভাবে তামাক খাওয়া চলিত। কিছুদিন পরে সেখানে কেরামত মিঞা নামক একটি যুবক মুসলমানও জুটিল। এখন যেমন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা শত্রুতার প্রাচীর উঠিয়াছে তখন তেমন ছিল না। নবাবসরকারেও উচ্চপদে হিন্দু কর্মচারীরা বহাল হইতেন। মুসলমানের সহিত হিন্দুর বন্ধুত্বের কোন বাধা ছিল না। কেরামত মিঞার পিতা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। দিল্লীতে, পাটনায়, মুর্শিদাবাদে, ঢাকায় কারবার ছিল তাঁহার। বেগমও অনেকগুলি ছিল। কেরামতের অনেকগুলি ভাইবোন। তাহার কয়েকটি ভাই পিতার ব্যবসাই দেখাশোনা করিত। কেরামত ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। গানবাজনা মজলিস তয়ফা লইয়াই থাকিত সে। ওই সবই ভালোবাসিত। ধূর্জটিও ভালোবাসিত বাইজিদের নাচ দেখিতে। বাইজিদের নাচের আসরেই কেরামত মিঞার সহিত তাহার আলাপ হয়। ক্রমে নীলু রায়ের সহিতও আলাপ হইল এবং সে আসিয়া হাজির হইল একদিন নীলু রায়ের বাড়িতে। কেরামত মিঞাই গান-বাজনা আরম্ভ করিল সেখানে। সেতার, এস্রাজ, সারেঙ্গি, বেহালা, ডুগিতবলা একে একে শুধু হাজিরই হইল না, নিজেদের

প্রতিপত্তিও বিস্তার করিল। নীলু রায় গানবাজনায় বেশ ওস্তাদ হইয়া উঠিলেন। ধূর্জটিমঙ্গল তুই একটা যন্ত্র বাজাইতে শিখিলেন বটে, কিন্তু উহা লইয়া মাতিয়া উঠিলেন না। ধূর্জটিমঙ্গল একটু অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। তিনি সবেতেই থাকেন, অথচ কিছুর মধ্যে ডুবিয়া যান না। পদচারণা করিতে করিতে এই কথাটাই বিশেষভাবে মনে হইতে লাগিল নীলু রায়ের। ধূর্জটি তাঁহার আবাল্য বন্ধু, কিন্তু তাঁহাকে তিনি ভালো করিয়া চেনেন না। স্বল্পবাক ধূর্জটিমঙ্গল কখন যে কি ভাবিতেছে, কোন মতলবে কোনদিকে চলিতেছেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ধূর্জটি জগদ্ধাত্রীকে এই সিংভূমের জঙ্গলে এতদিন ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন ইহাও নীলু রায় ঠিক বুঝিতে পারেন না। ধূর্জটির শ্বশুর যে মুসলমান ওমরাহটির ভয়ে জগদ্ধাত্রীকে জন সাহেবের আশ্রয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সে ওমরাহটি বহুদিন হইল ঢাকায় চলিয়া গিয়াছেন তবু জগদ্ধাত্রীকে এখানে ফেলিয়া রাখিবার অর্থ কি ইহা নীলু রায় বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে পারেন না তাহার কারণ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও ধূর্জটি কখনও তাঁহাকে বলেন নাই যে জন সাহেব তাহার সমস্ত সম্পত্তির ভার তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখানে একটা আস্তানা রাখা দরকার। জগদ্ধাত্রীকেই এই গৃহস্থালীর অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার, একথাও তিনি নীলু রায়কে বলেন নাই। অথচ সকলেই বলে নীলু রায় নাকি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। এক হিসেবে দক্ষিণ হস্ত তো বটেই। ধূর্জটির সমস্ত বিষয়-আশয়ের দেখাশোনা সেই করে। যাদুমণির বাপের বাড়ির বিষয়টা শেষ পর্যন্ত নীলু রায়ই পাইয়াছিলেন। ঠিক পাশেই ছিল ধূর্জটির ছোটখাটো একটা মহাল। বছরে হাজার পাঁচেক টাকা আয় ছিল তার। ধূর্জটি সেটা নীলু রায়কেই দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ও মহালটা তুমিই নাও। এর বদলে আমার অন্যান্য বিষয়সম্পত্তিগুলোর দেখাশোনাও তুমি কর। ওসব ঝঞ্ঝাট আমি পোয়াতে পারি না। তুমি চৌকশ লোক, তুমিই কর এসব।"

"আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে তো ঠিক"—নীলু রায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

"না পারবার কোনও হেতু নেই। তোমাকে এতদিন ধরে' দেখছি। তোমার সঙ্গে রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই, কোনও কুটুম্বিতা নেই, তুমি

আমাদের আত্মীয় নও, অথচ তোমার চেয়ে আপনার লোক আমার আর কেউ নেই। আমার যদি অবিবাহিতা একটা বোন থাকত তোমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতাম।"

নীলু রায়ের এই তো স্বপ্ন। তিনি ধূর্জটির আত্মীয় হইতে চান। এই কথার পিঠেই হঠাৎ তিনি বলিয়া বসিলেন—"কেন ঝকমারি তো আছে।"

এ কথায় ধূর্জটিমঙ্গল বিস্মিত হইবেন ইহাই নীলু রায় প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিস্মিত হন নাই। বেশ সহজভাবেই উত্তর দিয়াছিলেন—"ঝকমাবি কাউকে বিয়ে করবে না। ও বেহারী মেয়ে। আমাদেব বাড়িতে মানুষ হয়েছে। ওর মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারব না। তবে তুমি যদি ওর মত করাতে পার, আমার আপত্তি হবে না।"

কথাটা ধূর্জটিমঙ্গল এমনভাবে বলিয়াছিলেন যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়, নীলু রায় যদি ঝকমারির সম্মতিটা আদায় করিতে পারেন তাহা হইলে বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়া যাইবে। নীলু রায় ঝকমারিকে আগে অনেকবার দেখিয়াছেন, নারী হিসাবে তাহাকে তাঁহার মোটেই মনোরম মনে হয় নাই। কেমন যেন মদ্দা মদ্দা চেহারা, কাটখোট্টা ভাব। না নীলু রায় ঝকমারির প্রেমে পড়েন নাই। কিন্তু সহসা সেদিন তাঁহার মনে হইয়াছিল ঝকমাবিকে বিবাহ করিলে ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহার আপনলোক হইবেন। নীলু রায়ের জীবন মরুভূমির মতো, আত্মীয়স্বজন সব মরিয়া গিয়াছে, ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতেই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়, ধূর্জটিমঙ্গলের মা তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল কিন্তু এখনও তাঁহাকে স্নেহ করেন। সেই ধূর্জটিকে সামাজিক আত্মীয়তার গণ্ডীর মধ্যে পাইবার আগ্রহই তাঁহার প্রবল। কিন্তু বারবার তাঁহার মনে হয় ধূর্জটি রহস্যময়।

এখানেও আজ যে ঘটনাটা ঘটিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাস ধূর্জটি তাঁহাকে আগে দেন নাই। ঝকমারি ধূর্জটিকেই ভালবাসে, ধূর্জটিও তাহা জানেন। কিন্তু নীলু রায় ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতেন না। নীলু রায় যখন ঝকমারিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন ধূর্জটি বিস্ময়প্রকাশ করেন নাই। কেন করেন নাই তাহা এখন নীলু রায় বুঝিতে পারিলেন। এখন কি করিবেন তিনি? ঝকমারি তো ধূর্জটির সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া যাইবে। তাঁহার কর্তব্য কি? প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে একটা মোড়া

ছিল। তাহার উপর তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সুতামুটিতে ফিরিয়া যাইবেন? কিন্তু সেখানে গিয়া কি হইবে? নবাব সৈন্যরা সুতামুটি পুড়াইয়া দিয়াছিল, ইংরেজরাও কালা আদমীদের আশ্রয় দেয় নাই, লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। অনেক লোক কলিকাতার বাহিরে দূর গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। নীলু রায় তখন হরিপালে চলিয়া গিয়াছিলেন। হরিপালের অনেক ঘটনা মনে পড়িল তাঁহার। হরিপালে কেবল বাড়িটাই ছিল, আর কেহ ছিল না। বৃদ্ধ বাচস্পতি বহুদিন আগে সস্ত্রীক মারা গিয়াছেন। নীলু রায় খালি বাড়ির বারান্দায় একা বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় করা যায়। সেকালে গ্রামে গ্রামে হোটেল ছিল না। দুই একদিনের জন্য আসিলে গ্রামেরই চেনাশোনা কাহারও নিকট অতিথি হিসাবে থাকিতে হইত। কিন্তু নীলু রায়কে যে কতদিন এখানে থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। পাশেই গাঙ্গুলীদের বাড়ি। কিন্তু সেখানেও কাহারও দেখা পাইলেন না নীলু রায়। বাড়িতে তালাবন্ধ। গাঙ্গুলীরা থাকিলে নীলু রায় সেখানে দিনকয়েক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। শেষে ভাবিলেন—এই বাড়িতেই স্বহস্তে ভাতেভাত ফুটাইয়া লইলেই চলিবে। দেখিলেন বাগানে প্রচুর তরিতরকারি ফলিয়াছে। গোয়ালা পাড়ায় গিয়া কিছু দুধ বন্দোবস্ত করিলে চলিয়া যাইবে কোনক্রমে। তিনি রঘু গয়লাকে একটি গাভী দান করিয়া গিয়াছিলেন এখান হইতে যখন বাস তুলিয়া সুতানুটিতে চলিয়া যান। গোয়ালার খোঁজ করিতে হইবে। হঠাৎ ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে একটি কালো কিশোরী মেয়ে আসিয়া হাজির হইল।

"গড় করি দাদাঠাকুর। আপনি কখন এলেন—"

"এখুনি এসেছি। তুমি কে—"

"আমি ছিরি।"

নীলু রায়ের চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখিয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আমি খিরির মেয়ে—"

তখন সব মনে পড়িল নীলু রায়ের। খিরি তাহাদের বাড়ির ঝি ছিল। যাদুমণি খুব ভালোবাসিতেন তাহাকে। মনে পড়িল তাহার একটা খোঁড়া মেয়ে ছিল।

'খিরিদিদি কোথায়? তাকেই আমি খুঁজছি। এখানে দিনকতক থাকতে হবে। নিজে হাতেই রেঁধে খাব ভাবছি সে যদি এসে একটু যোগাড় করে দেয়—"

"মা তো মারা গেছে। কি যোগাড় করতে হবে বলুন না, আমিই করে' দিচ্ছি সব।"

নীলু রায় তখন সব বলিলেন।

"আপনি কখনও রেঁধেছেন আগে?"

"না।"

"তাহলে আপনি রাঁধবেন কেমন করে? আমিই সব রেঁধে দেব। আপনি ভাতটা নাবিয়ে নেবেন খালি। আমি কম জল দিয়ে চড়িয়ে দেব, ফ্যান গালতে হবে না। ফ্যানেভাতে ভালই হবে—"

এই বলিয়া মুচকি হাসিল সে। তাহার সেই মিষ্ট হাসিটা মনে পড়িল নীলু রায়ের। ছিরি সেদিন স্বহস্তে দুইটা উনান প্রস্তুত করিল, শুকনো কাঠ যোগাড় করিল, বঁটি এবং বাসন-কোসন আনিল। ঝাড়ু আনিয়া ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিল। নীলু রায় দিনেরবেলা সাধু ময়রার দোকানে মিষ্টান্ন খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। মণ্ডা, গজা, নিখুঁতি, মতিচুর আর দই। খাওয়া নিতান্ত মন্দ হইল না। ছিরি মুদির দোকান হইতে চাল, ডাল, মসলাপাতি কিনিয়া আনিয়াছিল। বলিল, "উনুন তো আজ শুকোয় নি। কাল আঁচ দেব। আজ চলুন সাধু-মামার দোকানেই আপনার জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করি। ওঁর উনুনেই রান্না করে দেব আজ। সাধু মামাকে চলুন বলি গিয়ে।"

সাধু ময়রা শুনিয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল,—"আমারই অতিথি হবেন উনি আজ। রাধিকে ডেকে পাঠাচ্ছি সেই সব করে' দেবে—তুমি রাঁধবে কেন।'

রাধি বেণীবাবুর বাড়ির রাঁধুনী। প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা। সে আসিয়া বলিল—"আমি ওদের রান্না সেরে তবে আসব। হয়তো একটু দেরি হবে।"

নীলু রায় বলিয়াছিলেন—"ওবেলা তোমার দোকানে অনেক খেয়েছি সাধু। খুব খিদে পায়নি এখনও। রাত্রে না খেলেও চলবে—"

"সে কি হয়—"

সেদিন অধিক রাত্রে ভূরিভোজন করিয়াছিলেন নীলু রায়।

রাধি ভাল রাঁধুনী। তাহার শাকের ঘণ্ট, মুগের ডাল, রুই মাছের ঝোল, বেগুন ভাজা, মৌরলা মাছের অম্বল প্রত্যেকটাই চমৎকার। সাধুর দোকানের ঘন ক্ষীর আর গরম সন্দেশের কথাও এখনও মনে আছে তাঁহার। সাধুব বাড়িতে নৈশভোজন সমাধা করিয়া নীলু রায় নিজের বাড়িতেই ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে বিছানা আনিয়াছিলেন। প্যাঁটরাও ছিল একটা। বেতের তৈরি প্রকাণ্ড প্যাঁটরা একটা। তাহাতে কাপড় পিরান গামছা টাকাকড়ি সব ছিল। তিনি একটা গরুর গাড়ি করিয়া আসিয়া-ছিলেন। হাঁটিয়াই আসিয়াছিলেন অবশ্য অধিকাংশ পথ, গরুর গাড়ি লইয়াছিলেন বিছানা এবং প্যাঁটরাটার জন্য। গরুর গাড়ির চালক দামোদর তাঁহার পূর্বপবিচিত ছিল। তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে বেশ আনন্দেই পথ হাঁটিয়াছেন তিনি। ক্লান্ত হইলে মাঝে মাঝে গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছেন। ছিরি একটি প্রদীপও সংগ্রহ করিয়াছিল। পিতলের একটি পিলসুজও। সাধুব বাড়ি হইতে ফিরিয়া নীলু রায় দেখিলেন ছিরি তাঁহার জন্য পরিপাটি-রূপে বিছানা করিয়া রাখিয়াছে। নীলু রায়ের অপেক্ষাতেই ছিরি বারান্দায় বসিয়াছিল। নীলু রায় আসিতেই বলিল—"আমি এবার বাড়ি যাচ্ছি। বাবাকে গিয়ে পাঠিয়ে দেব? আপনার বাইরের বারান্দায় শুয়ে থাকবে। তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাড়িটা এতদিন খালি পড়েছিল তো, একা থাকা ঠিক নয়। কাল এসে আমি রান্নাবান্না সব করে' দেব। ক'দিন থাকবেন দাদাঠাকুর?"

'থাকব এখন কিছুদিন। সুতানুটিতে বড় গোলমাল বেধেছে।"

'তাই নাকি! লক্ষ্মণ জেলেও তাই বলছিল। সে সুতানুটিতে মাছ বিক্রি করত। সে-ও পালিয়ে এসেছে—আমি বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

ছিরি চলিয়া গেল। একটু পরেই ছিরির বাবা কৈলাস আসিয়া হাজির হইল। বেশ বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তি। বয়স যদিও ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু দেখিলে মনে হয় চল্লিশ। মাথার চুল একটিও পাকে নাই। জাতিতে কর্মকার। চাষাদের জন্য ফাল, অশ্বারোহীদের জন্য ঘোড়ার নাল,

গৃহস্থদের জন্য খুন্তি, শাবল' কোদাল এই সব প্রস্তুত করে সে। বাড়ির পিছনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। সেখানে কুস্তির আখড়া আছে তাহার। সেখানে সন্ধ্যার পর গ্রামের যুবকেরা কুস্তি লড়ে। কৈলাস নিজেও একজন ভালো কুস্তিগীর। কৈলাস বগলে করিয়া একটি মাদুর এবং একটি ছোট বালিশ আনিয়াছিল। বারান্দায় সেগুলি নামাইয়া নীলু রায়কে ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

"বাবাঠাকুর, সুতোনুটি থেকে চলে এলেন কেন—"

"ওখানে ইংরেজ আর নবাবে হুজ্জুৎ লেগেছে। আমাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে সব—"

"হ্যাঁ ভাণ্ডারহাটির লক্ষ্মণ জেলে সেই কথা বলছিল এক দিন। সে-ও চলে' এসেছে। বলছে এখানেই হাটে হাটে মাছ বেচব।"

"এখানে কোনও গোলমাল হয়েছে নাকি—"

"এখানে কিছু হয় নি। যেমন চলছিল তেমনি চলছে। গোয়ালারা দুধ যোগাচ্ছে, হারাধন, মধু, নারায়ণ, মহেশ চাষ করছে, দিগু নাপতে বাড়ি-বাড়ি কাঁসার দর্পণ নিয়ে বাবুদের খেউরি করছে, সাধু ময়রা মিষ্টি বানাচ্ছে, নগেন তাঁতি কাপড় গামছা তৈরি করছে, আমি ফাল পিটছি আর তহশীলদার নবি মিঞা দিব্যি নবাবী করে যাচ্ছে। আর একটা ঘোড়া কিনেছে, আর একটা নিকেও করেছে—"

কৈলাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল—"এখানে আমরা খাসা আছি বাবাঠাকুর, আমাদের গায়ে সুতোনুটির আগুনের আঁচটি পর্যন্ত লাগে নি। রাত হয়েছে এইবার শুয়ে পড় বাবাঠাকুর। আমি এই বারান্দাটায় শুয়ে পড়ছি।"

নীলু রায় ভদ্রতা করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার তো এখানে শুতে কষ্ট হবে!"

"তা হবে। কিন্তু উপায় কি। ছিরির হুকুম অমান্য করলে আরও কষ্ট। সে বলছে দাদাঠাকুর ও বাড়িতেএকলা কি করে শোবে? তুমি গিয়ে শোও। তাই চলে এলাম। আমার জন্যে ভাবনা কোরো না। বাড়িতেও আমি এই মাদুরেই শুই—"

"ছিরি বলেছে কাল আমার রান্নাবান্নার সব ব্যবস্থা করে' দেবে।"

"দেবেই তো। ওর মা যে তোমাকে বড্ড ভালবাসত। তুমি হলে' ওর দাদাঠাকুর। দেবে বই কি, নিশ্চয়ই দেবে—"

"তোমার বাড়িতে আর কে আছে? তুমি চলে' এলে ছিরি একলা থাকবে না কি! বাড়িতে আর কে আছে তোমার? তোমার একটি ছেলে ছিল, যতদূর মনে পড়ছে—"

"সে আর নেই বাবাঠাকুর। ওলাবিবি তাকে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। ছিরির বিয়ে দিয়েছি নবীন কামারের নাতির সঙ্গে। সে-ই এখন থাকে আমার কাছে। শুয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আমাকে আবার ভোরে উঠতে হবে—"

মাদুরটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িল কৈলাস।

নীলাম্বর রায় অতীতের চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন। হরিপালে যে কয়টা দিন ছিলেন তাহার স্মৃতি-স্বপ্নে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন তিনি। চলিয়া আসিবার সময় ছিরিকে একটা রঙীন ধনেখালি শাড়ি আর কয়েকগাছ রূপার চুড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। কিছু বেতনও দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সে তাহা লইতে চাহে নাই। মাথা নাড়িয়া ঠ্যাংচাইতে ঠ্যাংচাইতে পলাইয়া গিয়াছিল। একটু দূরে গিয়া বারবার দুই হাত নাড়িয়া বলিয়াছিল, "তোমার কাছ থেকে মাইনে আমি নিতে পারবো নি দাদাবাবু। দাদার সেবা করে' কি কেউ মাইনে নেয়।"

"তাহলে আমার বাড়িতেই থাকিস তোরা। চাবি তোকে দিয়ে যাচ্ছি—"

"বেশ। তা থাকব। থাকা উচিতও। বাড়ি খালি ফেলে রাখা ঠিক নয়। আমি ঝাঁটপাট দেব। আর আমাদের বুধি গাইটাকে তোমার গোয়ালে রাখব—"

হঠাৎ নীলু রায় চমকাইয়া উঠিলেন।

"নীলু কোথা গেলে—"

ধূর্জটিমঙ্গল খুব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাছে কেহ নাই।

নীলু রায় উঠিয়া পড়িলেন।

"আমরা তো বেরুচ্ছি। তুমি যাচ্ছ তো আমার সঙ্গে—?"

"আমি আর গিয়ে কি করব। যা করবার তুমিই কর গিয়ে। আমি

এইখানেই থাকি। এখানেও তো একজনের থাকা দরকার। বৌঠান আছেন, ছেলে দুটি আছে—"

"ঝকমারি আমার সঙ্গে যাচ্ছে—"

"ভালোই তো, ভালবাসার লোক সঙ্গে থাকা ভালো।"

অন্য লোক হইলে ইহা লইয়া আলোচনা করিত। ধূর্জটিমঙ্গল কিছুই করিলেন না। চকিতদৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিলেন কেবল।

বলিলেন—"এখানে বন্দুক আছে। জগদ্ধাত্রীর হাতে কিছু টাকা দিয়াছি। তোমার হাতেও কিছু দিয়ে যাচ্ছি। এস।"

নীলু রায় তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলেন ঝকমারি পুরুষের বেশে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কোমরে একটি কোমরবন্ধ, কোমরবন্ধ হইতে তরবারি ঝুলিতেছে। মাথায় পাগড়ি, পাগড়িতে একটি লাল রঙের পালক।

নীলু রায় বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ। তুমি তলোয়ার চালাতে জান নাকি—"

"জানি—"

ঝকমারির মুখে কিন্তু হাসি নাই।

ধূর্জটিমঙ্গল একতোড়া টাকা আনিয়া নীলু রায়কে দিলেন। বলিলেন—"পাঁচ শ' মোহর আছে। আরও যদি দরকার পড়ে মধু সামন্তকে বলে' দিয়েছি, সে তোমাকে দেবে।"

বাহিরে ঘোড়াটা ডাকিয়া উঠিল। জগদ্ধাত্রী বাহির হইয়া আসিলেন। গলবস্ত্র হইয়া নীরবে ধূর্জটিমঙ্গলকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর নীরবেই চলিয়া গেলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল বাহির হইয়া গেলেন। পিছু পিছু ঝকমারিও গেল। নীলু রায়ও অনুসরণ করিলেন। বাহিরে দুইটি পাহাড়ী ঘোড়া দাঁড়াইয়া ছিল। দুইটি পালকিও ছিল। তাছাড়া আরও অনেক ঘোড়া ও অশ্বারোহী। একজন অশ্বারোহীর হাতে একটি তূর্য ছিল। সে তূর্যধ্বনি করিল। রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়া উঠিল।

৫

অন্ধকার রাত্রি। মাথার উপরে প্রকাণ্ড প্রজ্বলন্ত হীরকখণ্ডের মত লুব্ধক নক্ষত্র জ্বলিতেছে। চাবিদিকে অবণ্য। শোঁ শোঁ করিয়া শব্দ হইতেছে একটা, কিন্তু বাযুব বেগ তেমন প্রবল নয়। মাঝে মাঝে বন্য পেচকের ডাক শুনা যাইতেছে। অনেক দূরে হায়নার ডাকও। ধূর্জটিমঙ্গল অশ্বারোহণে একটি পর্বত হইতে অবতবণ কবিতেছিলেন। তাঁহার আগে পিছে কয়েকজন অশ্বাবোহী। ঝকমাবি ঠিক তাহার পিছনেই। আগে পিছে কযেকজন মশালধারী মশাল জ্বালাইয়া আসিতেছে। তাহাদের পিছনে পালকি। এই অন্ধকাবকে আর একটা জিনিসও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—মহুয়ার গন্ধে অন্ধকাবও বুঝি বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

সহসা সম্মুখে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। সামনের মশালবাকেরা পিছন দিকে ছুটিয়া আসিল। সামনের কয়েকটা ঘোড়াও উলটা মুখে দৌড়িতে লাগিল। একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "এখন এগোনো যাবে না, সামনে হাতীর দল—"

হাতীব চীৎকারও একটা শোনা গেল।

"হাতীর দল, চরবার জন্যে নেমেছে ওখানে। ওদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না এখন—। পাশের রাস্তা দিয়ে নেবে পড়ুন—"

পাশে কোন রাস্তা ছিল না। ঢালু পাহাড়ের গা বাহিয়া তবু সবাই নামিতে লাগিল। মশালের আলোকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল নীচে খানিকটা সমতলভূমি রহিয়াছে। কিছুদূর নামিয়া বোঝা গেল একটি ঝরনাও আছে। ঝরনার জলধারা সেই ক্ষুদ্র উপত্যকাটির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

সকলে নীচে যখন সমবেত হইয়াছে তখন ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—'এদিকে কোনও পথ আছে কিনা তা যখন আমাদের জানা নেই তখন এইখানেই রাতটা কাটানো যাক। তোমরা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন কর। এইখানেই কয়েকটা তাঁব খাটিয়ে দাও।"

ঝকমারি ধুর্জটিমঙ্গলের পিছনেই ছিল।

বলিল—"ওই অনেক দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। ওখানে কি কোন গ্রাম আছে?"

ধলরাজের একজন অনুচর বলিল—"না, ওখানে কোন গ্রাম নাই। আমার এ দিকটা ঘোরা আছে। ও অঞ্চলটা সব পাহাড়। পাহাড়ে গুহা আছে মাঝে মাঝে—"

"এরা ততক্ষণ তাঁবুটাবু ঠিক করুক, চল আমরা দেখে আসি আলোটা কিসের"

"বেশ চল। দুজন রক্ষীও চলুক আমাদের সঙ্গে।"

দুইজন রক্ষীকে সঙ্গে লইয়া ঝকমারি ও ধূর্জটিমঙ্গল অন্ধকারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া তাঁহারা একটি ছোট নদীরও সন্ধান পাইলেন। যে ঝরনাধারাটি দেখিয়াছিলেন সেইটিই সম্ভবতঃ নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। খরস্রোতা বটে, কিন্তু জল খুব বেশী নয়। ঘোড়াগুলি অনায়াসেই পার হইয়া গেল। হঠাৎ একদল শৃগাল একযোগে ডাকিয়া উঠিল।

একজন রক্ষী বলিল—"পহর পার হ'ল একটা"

অন্ধকারে ঘোড়া ছুটাইবার সুযোগ নাই। ঘোড়াগুলি খুব সন্তর্পণে চলিতেছিল। বেশ কিছুক্ষণ চলিবার পর তাহারা আলোকের সমীপবর্তী হইল। দেখা গেল একটা গুহার সম্মুখে একটি ছোট মশাল জ্বলিতেছে। লোকজন কেহ নাই।

"এখানে কেউ আছ না কি? সাড়া দাও।"

ধুর্জটিমঙ্গলের গম্ভীর কণ্ঠ পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইল।

কিছুক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ধূর্জটিমঙ্গল তখন একজন সহচরকে আদেশ করিলেন, "তুমি মশালটা নিয়ে গুহার ভিতরটা দেখ, কেউ আছে কি না। গুহার মুখে দু'একটা মাটির বাসনপত্র দেখছি, গুহার মুখে একটা ঝাঁপও রয়েছে। মনে হচ্ছে কোন মানুষ আছে—"

সহচরটি ঘোড়া হইতে নামিল এবং প্রথমেই গুহামুখের পরদাটা সরাইয়া ফেলিল। •

ভিতর হইতে একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'খোদা মেহেরবান'।

সহচরটি তখন মশাল লইয়া গুহার ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল গুহাটি বেশ বড়। একটি প্রশস্ত ঘরের মতো। একধারে একটি দড়ির খাটিয়ায় একটি প্রৌঢ় লোক শুইয়া আছেন। গুহার মেঝেতেও খড়ের উপর একটি বিছানা রহিয়াছে। এককোণে একটি কলসী, তাহার পাশে কিছু মাটির, ছোট ছোট বাসন। কয়েকটি হাতপাখাও রহিয়াছে। যিনি শুইয়া আছেন তাঁহার দাড়ি লাল, নাকটি শুকচঞ্চুর মতো।

"আপনি কে?"

"আমার নাম মীর মহম্মদ। আপনারা কে?"

"আমরা মুসাফির। মুর্শিদাবাদের দিকে যাচ্ছিলাম, পথে একপাল হাতী রয়েছে। তাই আমরা এইদিকে সরে' এসেছি। আপনি এই গুহায় কতদিন থেকে বাস করছেন?"

"অনেকদিন থেকে।"

"এই জঙ্গলে কে আপনার দেখাশোনা করে'?"

"আমার দুটি মেয়ে আছে। তারাই সব করে। আপনি কি একা, না সঙ্গে আরও লোকজন আছে?"

"লোকজন অনেক আছে। আমাদের মালিক আপনার খবর নিতে এসেছেন। বাইরে অপেক্ষা করছেন তিনি।"

"তাঁর পরিচয় কি?"

"তিনি মস্ত লোক। জায়গীর জমিদারি ফলাও কারবার, সব আছে তাঁর। এখানে জন সাহেবের সমস্ত জায়গীর জমিদারির ভারও তাঁর উপর—"

"জন সাহেব? জন সাহেবকে চেনেন না কি তিনি?"

"খুব চেনেন। দু'জনে খুব বন্ধুত্ব ছিল—"

"তাঁকে ভিতরে আসতে বলুন। জন সাহেবের খবর দিতে পারব—আল্লা মেহেরবান।"

প্রৌঢ় হস্ত দুইটি প্রসারিত করিয়া চক্ষু দুইটি মুদিত করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা আত্মসমর্পণের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

সহচরটি বাহিরে গিয়া সব বলিতেই ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারিকে লইয়া গুহার ভিতব প্রবেশ করিলেন।

"সেলাম আলেকুম। মনে হচ্ছে আপনি বিপন্ন। আপনার কোন সাহায্য করতে পারলে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করব। এই জঙ্গলে এই গুহায় আপনি কেন এসেছেন, আপনার পুরো পরিচয় কি তা আমাকে জানান। নির্ভয়ে জানান, আমাকে আপনার বন্ধু মনে করুন। শুনলাম আপনি আমার বন্ধু জন সাহেবের খবরও জানেন। কিন্তু সর্বাগ্রে আপনার পরিচয়টা আমি জানতে চাই। মনে হচ্ছে আপনি একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক—"

প্রৌঢ় বলিলেন, "এখন আমার একমাত্র পরিচয় আমি হতভাগ্য। আমার সবচেয়ে বেশী কষ্ট হচ্ছে আপনার মতো লোককে আমি ভালো ক'রে অভ্যর্থনা করতেও পাচ্ছি না। আপনাকে বসতে দেবার মতো আসনও এখানে নেই। পাশের ওই বিছানাটিতে আমার মেয়ে দুটি শোয়। ওইখানেই আপনারা দয়া করে' বসুন—"

"এসব তুচ্ছ কারণে আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা বসছি—"

পাশের শয্যাটির উপরই তাঁহারা উপবেশন করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"এবার বলুন আপনার কাহিনী।"

প্রৌঢ় কিন্তু যে কাহিনী বলিলেন তাহা সত্য নহে, বানানো কাহিনী। কিছুটা সত্য, কিছুটা বানানো।

"আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমি সম্ভ্রান্ত বংশেরই সন্তান। আমার পিতামহেব পিতা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। আমার পিতামহও মুর্শিদকুলি খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু সীতারাম রায়ের সঙ্গে যখন তাঁর যুদ্ধ হল তখন আমার পিতামহ গোপনে গোপনে সীতারাম রায়কে সাহায্য করেন। শুনেছি মুর্শিদকুলি খাঁ এ জন্য রেগে যান খুব। কিন্তু জায়গীর কেড়ে নেন নি। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাই সুজাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর ঝগড়া বেধে গেল। সরফরাজ খাঁই মুর্শিদকুলির মনোনীত উত্তরাধিকারী। আমার পিতামহ তারই পক্ষ নিলেন। কিন্তু সুজাউদ্দিন দখল করলেন সিংহাসন। আমার পিতামহ রাজদ্রোহ অপরাধে কারারুদ্ধ হলেন। সুজাউদ্দিনের

দরবারে হাজি আহমদ আর তাঁর ভাই আলীবর্দির খুব প্রভাব ছিল। হাজি আহমদ আমার এক পিসীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিকে করতে চাইলেন। আমার পিতামহ বললেন তাঁকে যদি কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়, তাহলে তিনি আপত্তি করবেন না। তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হলেন, আমার পিসীর সঙ্গে হাজি আহমদের নিকে হ'য়ে গেল। আমার পিতামহ রাজদরবারে সম্মানিত হলেন, কিন্তু তিনি সরফরাজ খাঁর সঙ্গে গোপনে গোপনে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন। কারণ তিনি জানতেন সুজাউদ্দিনের পর সরফরাজ খাঁই নবাব হবেন। তাই হলেন। তখন আমাব বয়স খুব কম। শুনতাম সরফরাজ খাঁ দরবারে আসেন না, অধিকাংশ সময়ই বেগমদের নিয়ে থাকেন। আমি যখন ষোল বছরের সেই সময় আলীবর্দি খাঁ পাটনা থেকে সসৈন্যে এসে বাংলা আক্রমণ করলেন। খুব যুদ্ধ হল। যুদ্ধে সরফরাজ খাঁ পরাজিত ও নিহত হলেন। আলীবর্দি দিল্লীর বাদশাহকে প্রচুর টাকা দিয়ে বাংলাদেশে সুবেদারির সনদ পেয়ে গেলেন। আমিও আলীবর্দির দরবারে একটা চাকরি পেলাম। সৈন্য বিভাগেই ছিলাম আমি। বর্গিরা যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করে তখন আমি বর্গিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম। সেই সময় আমি একটি ঘোরতর অন্যায় কাজ করেছিলাম। তা এখন স্বীকার করছি। আমি একটি হিন্দু ব্রাহ্মণকন্যাকে হরণ করি। তাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেছিলাম আমি। কিন্তু তাকে পোষ মানাতে পারি নি। মনে হত সারাজীবন যেন একটা বাঘিনীকে নিয়ে ঘর করছি। তার গর্ভে একটি মেয়ে হয়েছিল আমার। মেয়েটিও দেখলাম একটি বাঘিনী হয়েছে। তাব বয়স যখন দশ বছর তখন আসানুল্লা বলে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল। তার কাজ ছিল যুবক নবাব সিরাজের জন্য উপপত্নী সংগ্রহ করা। সে রাজ্যের অনেক যুবতী মেয়েকে ছলে বলে কৌশলে কিংবা টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যেত নবাবের ভোগের জন্য। সে একদিন আমাকে এসে বললে একটি খুব অল্পবয়স্কা কুমারী মেয়ের খোঁজ করছি আমি। নবাবের এক দোস্তের ফেরঙ্গ ব্যাধি হয়েছে। কে একজন নাকি তাঁকে বুঝিয়েছে খুব কম বয়সের প্রকৃত কুমারীব সঙ্গে বিয়ে হ'লে তাঁর ব্যাধি সেরে যাবে। আমাকে তিনি বলেছেন এক হাজার আসরফি পর্যন্ত

দাম দিতে রাজি আছেন এরকম মেয়ের জন্য। তাছাড়া আমাকে আলাদা বখশিস তো দেবেনই। তবে তিনি 'রইস্' লোক, ছোট-লোকের মেয়ের সংস্পর্শে আসতে চান না। আমি তখন অর্থাভাবে পড়েছিলাম। আলীবর্দি খাঁ খুব সুনীতিপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি চাইতেন যে তাঁর কর্মচারীরাও সুনীতিপরায়ণ হোক। যে-ই তিনি শুনলেন আমি একটি ব্রাহ্মণকন্যা অপহরণ করে' জোর করে' তাকে বিয়ে করেছি, অমনি তিনি আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। যুদ্ধে আমার পায়ে চোট লেগেছিল। তাই আমি বড় দুরবস্থায় পড়ে গেলাম। প্রজারা খাজনা দিত না এবং প্রজাদের উপর অত্যাচার করারও উপায় ছিল না আলীবর্দির আমলে। অর্থাভাবে ছিলাম খুব। হাজার আসরফির লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার স্ত্রীকে বললাম একজন খুব বড় রইসের বাড়ি থেকে মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে। সত্যি তিনি খুব ধনী লোক ছিলেন, বিবাহের কথা পাকা করবার জন্যে তিনি যে সব দামী দামী উপহার পাঠালেন তাই দেখে আমার স্ত্রীর চোখ ধেঁধে গেল। তার জন্যে তিনি যে মসলিনের ওড়না আর কাশ্মীরের শাল পাঠিয়েছিলেন তা বহুমূল্য। তাছাড়া ভালো ভালো কিংখাব, হাতীর দাঁতের বাক্স, হাতীর দাঁতের শীতলপাটি, রূপোর গোলাপ-পাশ, আতরদান, মোতিবসানো প্রকাণ্ড পানের বাটা, বহু রকম উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন তিনি। আমার স্ত্রী আর আপত্তি করলেন না। বরং বললেন, আমাদের এ দুরবস্থায় খোদাই মেহেরবানী করেছেন আমাদের উপর। তুমি আর অমত কোরো না।

আমাদের মেয়ের বয়স তখন দশ বৎসর। গয়নাপত্তর দেখে সে-ও হকচকিয়ে গেল। ভাবল বাপজান আমাকে সুপাত্রেই অর্পণ করছেন। বিয়ে হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। আর তারপরই আমি একটা বিপদে পড়ে গেলাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অফিসররা 'দস্তুক' বিক্রি করে জানেন বোধহয়। বাদশাহের ফরমান অনুসারে তারা কোন শুল্ক না দিয়ে ব্যবসা করতে পারে, এজন্য তাদের কাছে 'দসতুক' থাকে, সে দসতুক দেখালে আর সরকারকে কিছু দিতে হয় না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী বাইরের লোকের কাছে সেই দসতুক বিক্রি করে। আমি সেই রকম একটা দসতুক নিয়ে ধরা পড়ে গেলাম। সিরাজ এ নিয়ে খুব কড়াক্কড়ি করছিলেন। আমার কয়েদ হ'য়ে গেল। সেই সময় আপনার বন্ধু জন সাহেবের সঙ্গে আমার

দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে তিনটি মেয়ে ছিল। তাদেরও কয়েদ হয়েছিল এবং তাদের নিয়ে যথেচ্ছাচার চলছিল কয়েদখানায়। তারাই কারারক্ষীকে বশ করে' আমার মুক্তির ব্যবস্থা করে। টাকা অবশ্য দিতে হয়েছে অনেক। ছুটি মেয়ে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু তৃতীয় মেয়েটি জন সাহেবকে ছেড়ে আসতে চাইল না। কারারক্ষী বলল জন সাহেবকে ছাড়তে পারব না, কারণ নবাব সাহেবের হুকুম সাহেবদের উপর খুব কড়া নজর রাখতে হবে। যদি কোন সাহেব কোনরকমে পালায় তাহলে ওই কারারক্ষীরই প্রাণদণ্ড হবে। সাহেবের সঙ্গে একটি মেয়ে কিন্তু থেকে গেল। ছুটি মেয়ে আমার সঙ্গে চলে এল।"

মীর মহম্মদ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং মাথার শিয়র হইতে ছোট একটি কুঁজা লইয়া সেইটিই মুখে লাগাইয়া কি যেন পান করিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। তাহার পর আবার শুইয়া পড়িলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন--"ওষুধ খাচ্ছেন না কি!"

"আজ্ঞে না, শরাব। আগে যখন অবস্থা ভালো ছিল তখন সিরাজী খেতাম। এখন মহুয়ার মদ খাচ্ছি। আমার মেয়ে ছুটিই যোগাড় করে' এনে দেয়। মহুয়া খেয়েই এখন বেঁচে আছি।"

"মেয়ে ছুটি কি আপনার নিজের মেয়ে?"

"না। এরা আমার সেই জেলের সঙ্গিনী। এরা জন সাহেবের সঙ্গে বন্দী হয়েছিল। আমার সঙ্গে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে। সেই থেকে বরাবরই আমার সঙ্গে আছে।"

ঝকমারি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। একথা শুনিয়া বলিল, "মেয়ে ছুটির নাম কি? জন সাহেবের সঙ্গে রোমনি, শাওনি আর তির্কি গিয়েছিল।"

মীর মহম্মদ বলিলেন—"এদের নাম আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু এরা বললে—'নাম বুলব না। তুমি আমাদের নূতন নাম রাখ'। তাই একজনের নাম দিয়েছি 'রোশনি' আর একজনের নাম দিয়েছি 'খুস্‌বু'। মেয়ে ছুটি বোধহয় এই অঞ্চলের, কারণ ওরাই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। ওরাই আমার সেবা-শুশ্রূষা করছে, খাবারও যোগাড় করে' আনছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনি এই

জঙ্গলে চলে' এলেন কেন। জেল থেকে পালিয়ে অবশ্য কিছুদিন আত্মগোপন করা প্রয়োজন, কিন্তু আমার মনে হয় শহরে আত্মগোপন করা সহজ। শহরে থাকলে আপনি গোপনে কিছু রোজগারও করতে পারতেন। নবাবের আমলারা সহায় হলে আপনাকে কেউ কিছু বলত না। হয়তো শেষ পর্যন্ত নবাব সরকারেই আপনি চাকরি পর্যন্ত পেয়ে যেতেন। টাকা ছড়ালে সবই তো হয় আজকাল—"

"ঠিকই বলেছেন। টাকা ছড়ালে সবই হয়। কিন্তু আমার এখন টাকা নেই। আমি গরীব হয়ে গেছি। মেয়েকে ওই পাষণ্ডটার হাতে সঁপে দিয়ে আমি যে হাজার আসরফি পেয়েছিলাম সেটা আমার স্ত্রীকেই দিয়েছিলাম। কিন্তু স্ত্রী এখন আমার শত্রু। সে আমার প্রাণ নেবার চেষ্টা করছে। গুণ্ডা লাগিয়েছে আমাকে খুন করবার জন্যে। সেই ভয়েই আমি জঙ্গলে চলে' এসেছি—"

"আপনার স্ত্রী গুণ্ডা লাগিয়েছেন আপনাকে খুন করবার জন্যে? বলেন কি—!"

"যা বলছি তা সত্যি। কিন্তু দোষটা আমার। আমি যখন কয়েদখানায় তখন আমার মেয়ে তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল। ওই ফেরঙ্গ ব্যাধি তাকেও ধরেছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে পালিয়ে এসেছিল তার মায়ের কাছে। আর ওই আসানুল্লা লোকটা যে টাকার লোভ দেখিয়ে ওই লম্পটটার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল সে এসে জুটল আমার স্ত্রীর সঙ্গে। সে-ও একটা লম্পট। আমার স্ত্রীও অপরূপ সুন্দরী। তার বয়স তিরিশের কোঠায়, কিন্তু দেখলে মনে হয় ষোল সতেরো বছর। আসানুল্লা জুটে গেল তার সঙ্গে। তাকে বললে যে আমি সব জেনেশুনেই টাকার লোভে ওই ব্যাধিগ্রস্ত লোকটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। তারপর আরও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল একটা। আমার মেয়ে ইঁদারায় লাফিয়ে পড়ে' আত্মহত্যা করল। সে নাকি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিল না আর। শুনে আমারও খুব অনুতাপ হল। আমি ঘুষ দিয়ে কয়েদখানা থেকে ছাড়া পেলাম। বাড়ি এসে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। কিন্তু তার মায়ের চোখ দিয়ে একফোঁটা জলও পড়ল না। যখন তাকে গোর দিতে নিয়ে গেলাম তখনও সে সঙ্গে গেল না। যখন ফিরলাম তখন

দেখলাম সে বাড়ি নেই। চাকররা বললে আসানুল্লা সাহেব একটা তাঞ্জাম পাঠিয়েছিলেন, সেই তাঞ্জামে চড়ে তিনি কোথায় গেছেন। কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরল তখন দেখি মুখ থমথম করছে, চোখে অগ্নিদৃষ্টি। আমার সঙ্গে একটি কথাও না বলে' সে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল। রাত্রে শুয়ে ঘুমুচ্ছি হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার স্ত্রী একটা শাণিত ছোরা নিয়ে বাঘিনীর মতো চেয়ে আছে আমার দিকে। আমাকে জেগে উঠতে দেখে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। কিন্তু আমাকে মারতে পারে নি আমি তার হাতটা মুচড়ে কেড়ে নিয়েছিলাম ছোরাটা। তারপর পালিয়ে গিয়েছিলাম জানলা দিয়ে। সোজা গিয়ে উঠলাম জগৎ শেঠের আত্মীয় গোপাল শেঠের বাড়ি। সে আমার খুব হিতৈষী বন্ধু ছিল। সে বললে যা বলছ তা যদি সত্যি হয় তাহলে তোমাকে খুন করবার জন্য গুণ্ডা লাগাবে। তুমি এখানে থেকো না। এখান থেকে পালাও। সে যখন আসানুল্লার সঙ্গে জুটেছে তখন তোমার আর রক্ষা নেই। তাছাড়া তুমি কয়েদখানা থেকে পালিয়েছ, তোমার মুর্শিদাবাদে থাকা ঠিক হবে না। রোশনি আর খুসবুও জেল থেকে পালিয়েছিল আমার সঙ্গে। একটা সরাইখানায় তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে' দিয়েছিলাম। তাদের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি তারা নেচে গেয়ে সরাইকে মাতিয়ে তুলেছে। তাদের বললাম, আমি এখান থেকে পালাচ্ছি। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে, না থাকবে। তারা বলল—যাব। ভাগ্যে ওদের সঙ্গে এনেছিলাম, তা না হলে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি কি যে করতাম জানি না।"

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কোথায় যাবেন শেষ পর্যন্ত এখানে এভাবে তো বেশীদিন থাকা যাবে না!"

"আমি উড়িষ্যায় যাব। সেখানে এখনও মারাঠারা সর্বেসর্বা। আমার বন্ধু গোপাল শেঠ একজন মারাটা সেনানায়কের নামে চিঠি দিয়েছেন আমার হাতে। সে চিঠিতে বলেছেন আমাকে আশ্রয় দিলে আমি তাদের বাংলাদেশ পুনরাক্রমণের সুযোগ-সুবিধা করে' দেব। সিরাজের আমীর ওমরাহরা সিরাজের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, সুতরাং সিরাজ যুদ্ধে জিততে পারবে না। মীরজাফর, জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ, ইয়ারলতিফ—সবাই ইংরেজের পক্ষে। কিন্তু ইংরেজদের সৈন্যবল

বেশী নেই। এই সময় মারাঠারা যদি আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাহলে বাংলাদেশ তারা জয় করতে পারবে। কিন্তু আমার ভয় পাছে কোনও গুপ্তঘাতক আমাকে হত্যা করে। তাই আমি এই ঘুর পথে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উড়িষ্যায় যাবার চেষ্টা করছি।"

ঝকমারি এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এইবার সহসা সে বলিয়া উঠিল—"তুমি যত্ন!"

সকলে তাহার দিকে সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইল।

দেখিল ঝকমারি বিস্ফারিত নয়নে মীর মহম্মদের দিকে চাহিয়া আছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইত ঝকমারির দৃষ্টি মীর মহম্মদের উপর নিবদ্ধ ছিল না, তাহা যেন বহুদূরে অবস্থিত আর একটা কিছু দেখিতেছিল। উন্মুখ ঔৎসুক্যসহকারে সুদূর অতীতের দিকে চাহিয়াছিল সে। জাতিস্মর ঝকমারি পূর্ব কোনও জন্মে ফিরিয়া গিয়াছিল সহসা!

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"যত্ন! যত্ন কে—"

"যত্ন রাজা গণেশের ছেলে! ছেলে নয় কুলাঙ্গার"

"রাজা গণেশ! সেই বা কে—"

"পাঠান যুগের স্বাধীন হিন্দুরাজা। ভাতুড়িয়ায় তাঁর জমিদারি ছিল। ইলিয়াস শাহী বংশের আমীর ছিলেন তিনি আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করে' মুসলমান আধিপত্যকে স্তব্ধ করে দেন বাংলার। তারপর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু বাংলার দরবেশরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল।…"

"তুমি এসব কোথা থেকে জানলে—"

"আমি জানব না? আমি ছিলাম রাজা গণেশের স্ত্রীর সহচরী। আমার নাম ছিল হিঙ্গুলা! আমি সব জানি।"

"তারপর?—"

"বাংলার দরবেশদের নেতা নূর কুত্‌ব্‌ আলম্‌ চিঠি লিখলেন জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর কাছে। লিখলেন তুমি এসে এই হিন্দু কাফেরকে উচ্ছেদ কর। জৌনপুরে ছিলেন আর এক দরবেশ আশরফ সিমানী। তিনিও উৎসাহিত করলেন ইব্রাহিমকে। ইব্রাহিম সসৈন্যে বেরিয়ে পড়লেন। ত্রিহুতে রাজা শিবসিংকে হারিয়ে তিনি এলেন বাংলায়। তখন রাজা

গণেশের ছেলে যদু বাবার সিংহাসনে বসবার জন্য তার সঙ্গে যোগ দিলেন। শুধু যোগ দিলেন না, নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে হয়ে গেলেন জলালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ। ইব্রাহিম চলে যাবাব পর গণেশ আবার আক্রমণ করলেন ওই কুলাঙ্গাব জলালুদ্দিনকে। তাকে সিংহাসনচ্যুত কবে' বন্দী করলেন। নিজে দনুজমর্দনদেব নাম নিযে আবার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু তিনি দু'বছরের বেশী রাজত্ব করতে পাবেননি। হঠাৎ খাওয়ার পর তিনি খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। অনেকেব বিশ্বাস যদুই ষড়যন্ত্র করে' তাঁর খাবাবেব সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। তুমি সেই যদু। তুমি জানু নত করে' আমা প্রণয়ভিক্ষা করেছিলে, বলেছিলে আমাকেই পাটরাণী করবে। আ তোমার মুখে লাথি মেরেছিলাম। তোমার বাবার মৃত্যুর পর তুমি যখ রাজা হ'লে তখন তোমার ঘাতক আমাব শিরশ্ছেদ করেছিল। আমা সেই ছিন্ন মুণ্ডটাও আমি দেখতে পাচ্ছি। যদু, ইচ্ছে করলে সে মৃত্যু প্রতিশোধ আমি এখনই নিতে পাবি।"

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—"কি করছিস তু ঝকমারি—"

ঝকমারি আত্মস্থ হইল। লজ্জিত হইয়া মীর মহম্মদকে বলিল—"মা করবেন। আমি মাঝে মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কিন্তু যা বলল তা মিথ্যা নয়, আপনার এবং আমাব অতীত আমি স্বচক্ষে দেখলাম এখনি তবে প্রতিশোধ আমি নেব না। যদু যে অন্যায় করেছিল তার প্রতিশে মীব মহম্মদের উপর নেওয়া যায় না। ভগবানই এর শাস্তি দেবে আপনাকে। হয়তো আপনার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে—"

মীর মহম্মদ সবিস্ময়ে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

"আপনি কে! আপনার পোশাক পুরুষের মতো, কিন্তু গলার স্বর তে পুরুষের মতো নয়। কে আপনি—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"ওর পরিচয় এখন না-ই শুনলেন। খামখেয়ালী পাগল, ওব কথা এখন থাক। আমি আপনাকে দু'একটি প্রশ্ন করছি তার জবাব দিন। জন কি এখন মুর্শিদাবাদেই বন্দী হয়ে আছে?"

"মুর্শিদাবাদেই ছিল। এখন কোথায় আছে কি ক'রে বলব। আশা করি এখনও সেখানেই আছে। একটা দোতলা বাড়িতে রেখেছে ওকে

বিশ জন পাহারাদার আছে, দশজন দিনে পাহারা দেয়, দশজন রাত্রে। ওর সঙ্গে যে মেয়েটা আছে সে ওই বিশজনকেই মজিয়েছে। তাদের ওপরওলা যে দারোগা আছে—রমজান আলী, তাকেও মজিয়েছে। তারা সাহেবকে ছেড়ে দিতে রাজী, কিন্তু রমজানের যিনি ওপরওলা তুর্বক্ খাঁ তিনি অর্থপিশাচ একটি। তাঁকে প্রচুর ঘুষ না দিলে রমজান জন সাহেবকে ছেড়ে দিতে পারবে না। আমি তুর্বককে পাঁচশো আসরফি দিয়েছিলাম। তিনি টাকাটা নিলেন, কিন্তু আমাকে ছাড়লেন না। আমার বন্ধু জমীরুদ্দিন আমাকে ধার দিয়েছিলেন টাকাটা। আমাকে সে টাকাটা শোধ করতে হবে। কিন্তু কি করে' যে করব তা জানি না। গোপাল শেঠ ভরসা দিয়েছে সে সব ঠিক করে' দেবে। হয়তো দেবে। জগৎ শেঠের পেয়ারের লোক সে। সিরাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তার 'কলকাঠি' না কি গোপালেরই হাতে। জগৎ শেঠের ভয় সে যদি ব্যাপারটা সিরাজের কানে তুলে দেয় তাহলে নবাব জগৎ শেঠকে কয়েদ করতে পারে, কতলও করতে পারে—ও যে রকম দুর্দান্ত ওর অসাধ্য কিছু নেই। এই ভয়ে জগৎ শেঠ গোপালকে খুব তোয়াজ করে' রেখেছে টাকাকড়ি দিয়ে। গোপাল এখন ধনী লোক। সে অনায়াসেই আমার পাঁচশ আসরফির ধারটা শুধে দিতে পারে। দেবে কিনা জানি না। গোপালের টিকি যার কাছে বাঁধা তার সঙ্গে যদি দেখা করে' তাকে সব কথা বলে' আসতে পারতাম তাহলে দিত। সে আমাকেও খাতির করে খুব। কিন্তু দেখা করে' আসতে পারিনি—"

"কে তিনি?"

ধূর্জটিমঙ্গল প্রশ্ন করিলেন।

"মৈনি বিবি"

"তয়ফা মৈনি—"

"হ্যাঁ। চমৎকার গান গায়, চমৎকার নাচে।"

"তাকে আপনি চেনেন?"

"খুব। গোপাল শেঠ ওকে নিজের বাগানবাড়িতে নিয়ে রাখতে চেয়েছিল, ও যায় নি। বলেছিল আমি আমার মালিকের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না।"

মৈনির খবর শুনিয়া ধূর্জটিমঙ্গল হৃষ্ট হইলেন। তিনি চাপা প্রকৃতির লোক। তিনিই যে মৈনিকে বাড়িটি কিনিয়া দিয়াছেন একথা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সহিত যে ঘনিষ্ঠতা আছে সে কথাও বলিলেন না।

কেবল বলিলেন—"আমিও ওঁর নাম শুনেছি। বড় বড় ওমরাহের অন্দরমহলে ওঁর যাতায়াত আছে না কি—"

"হ্যাঁ, তা আছে। চমৎকার গান গায় যে। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গজল এমন কি হিন্দুদের কীর্তনও। সবাই ওকে ডেকে নিয়ে যায়। পয়সাও করেছে খুব। কিন্তু কারো ওখানে ও চাকরি নিতে চায় না। গোপাল শেঠ ওকে বাঁধা মাইনে দিয়ে নিজের বাগানবাড়িতে রাখতে চেয়েছিল, গেল না। আমি যদি ওকে বলে' আসতে পারতুম, তাহলে গোপাল শেঠকে দিয়ে আমার ধারটা ও শোধ করে' দিত। আমাকে খুব ভালোবাসে মৈনি বিবি—"

"ভালবাসে? তাই না কি?"

ধূর্জটিমঙ্গলের গলার স্বরটা কেমন যেন রুক্ষ শুনাইল।

মীর মহম্মদ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয় হইল তাঁহার কাহিনীটা যে বানানো ইহা ধূর্জটিমঙ্গল ধরিয়া ফেলিয়াছে না কি!

প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন তিনি।

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"মুর্শিদাবাদ যাব। কলকাতায় যাওয়ারও ইচ্ছা আছে। সুতানুটিতে আমার বাড়ি ঘরদোর তো নবাবের সৈন্যরা পুড়িয়ে দিয়েছে। সেগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে—"

ধূর্জটিমঙ্গল ইহার বেশী আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু মীর মহম্মদ ইহার উত্তরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহা বলিলেন তাহাতে উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন তিনি। এই সব খবরই তো তিনি চান। বস্তুতঃ এই সব খবর সংগ্রহ করাই তো তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

"যে লোকটার হুকুমে আপনাদের বাড়িঘর পুড়েছিল সেই আসফ আলীকে আমি চিনি। আসফ আলী নবাবের প্রিয়পাত্র।"

"তাকে আপনি চিনলেন কি করে'? আত্মীয়তা আছে না কি?"

"না, আত্মীয়তা নেই। উমর বেগ জমাদার তিন হাজার ঘোড়সোওয়ার

নিয়ে ইংরেজদের কাশিমবাজার আক্রমণ করেছিল এ খবর আপনি নিশ্চয়ই জানেন।"

"শুনেছি।"

"উমর বেগ চার দিন ওই বিরাট সৈন্য নিয়ে ইংরেজ কুঠির সামনে চুপ করে' ছিলেন। আক্রমণ করেন নি। হয়তো নবাব আক্রমণ করতে বলেন নি। হয়তো ওদের ভয় দেখানই উদ্দেশ্য ছিল। এরা খুব ভয়ও পেয়েছিল। ওয়াটস্ সায়েব এসে একটা মুচলেকায় সই করে'ও মুক্তি পেলেন না। নবাব তাঁকে আর চেম্বার্সকে আটকে রেখেছিলেন। সেই সময় বিবি ওয়াটস্ বেগমদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি জুড়লেন। সিরাজের মায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। মায়ের অনুরোধে সিরাজ শেষ পর্যন্ত ওদের ছেড়ে দিলেন, কিন্তু বললেন তাঁরা যে মুচলেকানামায় সই করেছেন সেই মুচলেকানামার তিনটি শর্তই পালন করতে হবে। নবাবের সেনা যখন কাশিমবাজারে, তখন ঘোড়ার খাবার সংগ্রহের একটা ঠিকা পেয়েছিলাম আমি। কিছু ঘুষ খেয়ে আসফ আলী ঠিকাটি দিয়েছিলেন আমাকে। সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ। মুচলেকানামায় শর্ত যখন ইংরেজরা মানলেন না, তখন নবাব কলকাতা আক্রমণ করেন। তখনও আমি নবাব ফৌজের সঙ্গে ছিলাম। তখনও ঘোড়ার দানা সংগ্রহ করবার ভার আমার উপর ছিল। সেইজন্য জানি আসফ আলীই আগুন লাগাবার হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু তার আগে ইংরেজদের মিলিটারিও ব্ল্যাক টাউনে আগুন ধরিয়েছিল। সব বাঙালীরাই তো পালিয়েছিল। কিছু কিছু বাঙালী মেয়ে অবশ্য নবাবের সেনাদের কবলে পড়ে' যায়। একটা খবর জানি—উজির আহম্মদ বলে' একটা লোক একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তুমেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।'

ধূর্জটিমঙ্গল সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"উজির আহমদ থাকে কোথায় ?"

"মুর্শিদাবাদেই আছে। মৈনি বিবি চেনে তাকে।"

ধূর্জটিমঙ্গল আর কিছু প্রশ্ন করলেন না। কিন্তু আসফ আলী ও উজির আহমদ—এই নাম দুইটি তিনি বুকের ভিতর গাঁথিয়া রাখিলেন। একটু পরেই বাহিরে একটা শব্দ শোনা গেল। মিহি গলায় গানের শব্দ। গানও অদ্ভুত। তিনিনিনি, তিনিনিনি তিনাক্ তিনা তিন, মনরঙিলা গাছের

ডালে ফুল ফুটেছে বে, ফুল লয় গো মন, তিনাক তিনা তিন। তাহার পর উচ্চ কলকণ্ঠের হাসি।

মীর মহম্মদ বলিলেন—"রোশনি আর খুসবু আসছে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তুইটি ছোট মশাল লইয়া তির্কি ও শাওনী প্রবেশ করিল। ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল তাহারা।

"আরে রাজা তুই এখানে কি করে' এলি! তোর সাথে উ কে!"

ঝকমারিকে তাহারা প্রথমে চিনিতে পাবে নাই।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "চেয়ে দেখ্ ভাল করে'। চিনতে পাববি।"

তুজনেই ঝকমাবিব দিকে চাহিয়া রহিল সবিস্ময়ে। তাহার পর হঠাৎ শাওনী হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিল।

"চিনেছি, চিনেছি। ঝকমকি। আমাদের ঝকমিক রে তির্কি। বেটা ছেলে সেজে আইছে। আমবা যেমন এসেছিলম সায়েবের সঙ্গে—"

তুইজনেই গিয়া জড়াইয়া ধবিল ঝকমারিকে।

তাহাব পর তুইজনেই গান গাহিয়া উঠিল একসঙ্গে।

মনরঙোলি ডালে ফুল ফুটেছে রে
ফুল লয় বে—মন
তিনাক তিনা তিন্।
দেখ না চুপি চুপি
মেঘেব আড়ে চন্দা বহুরূপী
তিনাক তিনা তিন।

মীব মহম্মদ প্রশ্ন কবিল—"খাবার কিছু পেয়েছিস?"

"পেয়েছি। মুর্গি চুরি করেছি তুটো। আর ভিখ মেঙে একটা ডিংলা এনেছি। চালও এনেছি বিশ কড়ির।"

"কই সে সব?"

মুর্গি তুটোর টুঁটি ছিঁড়ে দিয়ে চাল আর ডিংলাব সঙ্গে একটা পুঁটলিতে বেঁধেছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় একটা মেয়ার সঙ্গে দেখা। সে চীৎকার করছিল আমি কংসকে খুন কবব। আমাদের দেখে বলল—বড় খিদা লেগেছে, খেতে দিবি? বললাম আমাদের মোটটা বয়ে নিয়ে চল দেব। সেই মোটটা বয়ে আনছে। তাকে ওবেলার ভাত যে ক'টা আছে তাই দিব।"

মীর মহম্মদ বলিলেন, "অচেনা লোকেব মাথায় জিনিসগুলো দিয়েছিস, পালাবে না তো জিনিসগুলো নিয়ে—"

"না গো না। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভালো ঘবেব মেয়ে। মাঝে মাঝে কেবল বলছে কংসকে খুন কবব। কে জানে বাবা কোন কংসকে খুন করবে উ—ওই যে আসছে—"

দ্বারপ্রান্তে একটি ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল। মাথায় একটা বেশ বড় পুঁটুলি।

"ভিতরে আয়—"

মেয়েটি ভিতবে আসিয়া মাথাব মোট নামাইল। তাহাব পর ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া হঠাৎ সে চীৎকাব কবিযা উঠিল "দাদা—দাদা—তুমি—"

তাহাব পবই অজ্ঞান হইযা গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহাব ছোটবোন বারাহীকে চিনিতে পাবিলেন। কিন্তু সে কথা খুলিয়া বলিলেন না।

বলিলেন—"ও যখন আমাকে দাদা বলেছে তখন আমিই ওকে আশ্রয় দেব।"

বারাহীর কোনও সন্তান হয় নাই। বয়সও মাত্র একুশ বৎসর। রূপসী ছিল সে। বাপেব বড় আদবিণী ছিল। তাহাব শীর্ণ দেহ, ছিন্ন বস্ত্র, রুক্ষ চুল দেখিয়া ধূর্জটিমঙ্গলের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সে অশ্রু তিনি সংবরণ কবিয়াছিলেন, গাল বাহিয়া গড়াইয়া পডিতে দেন নাই।

তাঁহার রক্ষকদের আদেশ দিলেন—"একটা পালকি এনে একে নিয়ে যাও। এ আমাদের সঙ্গে যাবে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল।

একজন অশ্বারোহী আসিয়া খবব দিল হাতীব দল অন্যদিকে সরিয়া গিয়াছে। পথে আব কোন বাধা নাই। ঝকমারিও বারাহীকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গল যখন প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না, তখন সে-ও চুপ করিয়া রহিল।

ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া পড়িলেন—"মীর সাহেব, আমি এখন তাহলে উঠি। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। আপনি বড় দুরবস্থায় পড়েছেন দেখতে

পাচ্ছি। আমি আপনাকে পঞ্চাশটি আসরফি দিচ্ছি। আপনি তাড়াতাড়ি উড়িষ্যায় চলে' যান। আপনি যদি মুর্শিদাবাদে মৈনি বিবিকে খবর দিতে পারেন তাহলে সে খবর আমি পাব। মুর্শিদাবাদে গিয়ে জন সায়েবকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করব আমি। এ মেয়ে দুটো আপনার সঙ্গে থাক।"

তিনি তির্কি আর শাওনীকেও পাঁচটি করিয়া আসরফি দিলেন। তাহারা আনন্দে গদগদ হইয়া পড়িল। ধূর্জটিমঙ্গলকে ঘিরিয়া তাহারা আনন্দের একটা বান বহাইয়া দিল যেন। তাহাকে বারবার জড়াইয়া ধরিল, হাত তুলিয়া নাচিল, দুই এক কলি গানও গাহিয়া দিল। ঝকমারিকে বারবার চুম্বন করিয়া বলিল—

"বেটাছেলের পোশাকে তুকে খুব ভালো দেখাচ্ছে। মন যাচ্ছে তুকে বিয়ে করি।"

একটা হাসির হুল্লোড় তুলিয়া তাহারা গড়াইয়া পড়িল।

মীর মহম্মদ বলিলেন—"আপনি আমার এত উপকার করলেন আপনার নামটা কিন্তু জানতে পারলাম না। আপনার এ উপকারের কিছু প্রত্যুপকার যদি করতে পারি—"

"একটি প্রত্যুপকার করতে পারেন। উড়িষ্যায় গিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে পারলেন কিনা, ফল কিছু হল কিনা সেটা আমাকে জানাবেন।"

"কিন্তু আপনার নাম ঠিকানা না জানলে কোথায় জানাব? যদি সুবিধে করতে পারি উড়িষ্যা থেকে কোন লোককে আমি মুর্শিদাবাদে পাঠাবার চেষ্টা করব—"

"মৈনি বিবির কাছেই খবর পাঠাবেন। মৈনি বিবির কাছেই থাকব আমি। ওখানে খবর গেলে আমি পেয়ে যাব—"

"আপনি হিন্দু কি মুসলমান তাতো বললেন না—"

"তা বলবার তো কোনও প্রয়োজন নেই। দেখুন, সব দেশে, সব সমাজে দুটি জাত থাকে—একটি সৎজাত আর একটি বজ্জাত। আমি সৎজাতের দলে। আমার দলে হিন্দু মুসলমান দুইই আছেন।"

বাহিরে তুর্যধ্বনি শোনা গেল।

"এবার আমি চলি। আপনার কথা বলব আমি মৈনিকে।"

"তাহারা বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিল। ধূর্জটিমঙ্গলের রক্ষকেরা ডালপালা কাটিয়া ছোট একটি ডুলির মতো বানাইয়া ছিল। অজ্ঞান বারাহীকে তাহার উপর শোওয়াইয়াই তাহারা লইয়া চলিল। এখানে পালাক আনা সম্ভব হয় নাই। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল হাত তুলিয়া আবার বলিল—"শাওনা তিকি চলনাম—"

উহারা গান গাহিয়া উঠিল—

আবার কবে আসবে তুরা
সেই আশাতে থাকব
আকাশে চান থাকবে
বুকেতে প্রাণ থাকবে
পথের পানে চোখটি মেলে রাখব।
মনবগোলীর রঙিন পাতায়
তুদের ছবি আঁকব।

গান শেষ করিয়া হাসিতে হাসিতে আবার তাহারা গুহায় ঢুকিয়া পড়িল। মীর মহম্মদের সহিত কেন তাহারা যাইতেছে সে কথাটা কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গলকে তাহারাও বলিল না। বলা সম্ভব ছিল না বলিয়াই বোধহয় বলিল না।

৬

সেদিন ধূর্জটিমঙ্গল যখন চলিয়া গেলেন নীলু রায় তখনই ঘরের ভিতর গেলেন না। অন্ধকারে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্ষতবিক্ষত অতীত জীবনের পটভূমিকায় নিজের জীবনটা আর একবার প্রত্যক্ষ করিলেন। হ্যাঁ, সত্যিই তিনি নিঃসঙ্গ, সত্যই তাঁহার আত্মীয় কেহ নাই। তাঁহার রক্ত-সম্পর্কিত সব আত্মীয়স্বজনই কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। দুইজন বন্ধু তাঁহার জীবনে আসিয়াছিল। একজন কেরামত খাঁ, আর একজন ধূর্জটিমঙ্গল। কেরামত খাঁ শুধু তাঁহার বন্ধুই ছিল না, গুরুও ছিল। তাহার কাছেই তিনি গানবাজনা শিক্ষা

করিয়াছিলেন। অসামান্য শিল্পী ওই কেরামত খাঁ। শুধু সে সুর-শিল্পী নহে, জীবন-শিল্পীও। সংসারের কোনও বন্ধন নাই। অনেকটা সন্ন্যাসীর মতো। কিন্তু তাহার আরাধ্য ভগবান নহেন, তাহার আরাধ্য সুর। সুরের আহ্বানে সে ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। আজ দিল্লী, কাল ঢাকা, পরশু বিষ্ণুপুর, তাহার পরদিন মুর্শিদাবাদ। সুরের টানে কেরামত সদা চঞ্চল। এখন কোথায় আছে কে জানে। সুতরাং তাহার বন্ধুত্ব নীলু রায়ের জীবনে এমন কোন প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই যাহার উপর তিনি নির্ভর করিতে পারেন। তাঁহার সুখ দুঃখের সে অংশীদার নয়, সে কখন কোথায় থাকে ঠিক নাই। তবু কেরামত খাঁয়ের বন্ধুত্ব তাঁহার জীবনে পরম সম্পদ, একখণ্ড মাণিক্যেব মতো তাহা তাঁহার আঁধার জীবনে যেন জ্বলিতেছে। যতক্ষণ সে কাছে থাকে ততক্ষণ সে পারিপার্শ্বিককে যেন আলোকিত করিয়া রাখে। শুধু গানবাজনা নয়, তাহার চরিত্রের মধ্যে এমন একটা অগাধ অথৈ ভাব আছে, এমন একটা প্রদীপ্তি আছে যে, তাহাকে ভালো না বাসিয়া থাকা যায় না। কেবামত সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিরাসক্তও। কোন ভালবাসার আকর্ষণে কোথাও সে বাঁধা পড়ে না। সে যদিও মুসলমান কিন্তু একটির বেশী বিবাহ করে নাই। অনেক তরফী, অনেক বাঈজী এমন কি ভদ্রঘরের অনেক কন্যাও তাহার প্রণয়াসক্ত। কিন্তু কেরামত আর কোথাও বাঁধা পড়ে নাই। তাহার বউ পুত্লী বিবি নাকি অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু সে পর্দানশীন, যখন বাহিরে যায় তখন বোরখা পরে। নীলু রায় কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। লোকমুখে তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ির ঝি বলিয়াছিল—মেয়ে নয় তো পরী। রং দুধে-আলতা, একপিঠ কালো চুল, কুচকুচে কালো টানা টানা চোখ। দাঁতগুলো মুক্তোব মত। বুড়ী ঝি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। পুতলী বিবি কয়েকটি যন্ত্র নাকি খুব ভালো বাজাইতে পারেন। বিশেষ করিয়া বীণা। কিন্তু তিনি কেরামত ছাড়া আর কাহাকেও বাজনা শোনাইতে চান না। আমীরওমারহদের অন্তঃপুর হইতে নিমন্ত্রণ আসিলে অসুখের ভান করেন। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। লোকে বলে তাঁহার জন্যই নাকি কেরামতকে দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কেরামতের

একটি পুত্র সরফুদ্দীন মুর্শিদাবাদে তাহার বৃদ্ধা পিসীর কাছে থাকে। ধূর্জটিমঙ্গলই তাহাদের তত্ত্বাবধান করেন। তাহাদেব দেখাশোনা করিবার নিমিত্ত বক্তিয়ার নামক একটি লোককেই নিযুক্ত করিয়াছে সে। মাসে মাসে তাহাদের টাকাও দেয়। ধূর্জটিমঙ্গল অনেক সৎকাজে লিপ্ত, নীলু রায়ও তাঁহার দাক্ষিণ্য ভোগ করিতেছেন, তিনি তাঁহার বন্ধুস্থানীয় আত্মীয়েব মতো। কিন্তু তাঁহার আদি-অন্ত তিনি বুঝিতে পারেন না। অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত স্বল্পবাক ধূর্জটিমঙ্গলকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়াও নীলু বায় তাঁহাব উপর নির্ভর করিতে পারেন না। তাহাকে বুঝিতেই পারেন না তিনি। এতদিন তাঁহার সঙ্গে আছেন, কিন্তু মনে হয় একটা বন্ধ বাক্সের সম্মুখেই সাবাজীবন যেন বসিয়া আছেন। প্রকাণ্ড বাক্স। লম্বাচওড়া ভারিক্কী চেহারা, গায়ে অসীম শক্তি, মনে প্রচুর সাহস কিন্তু বন্ধ-বাক্স। কখন কি যে করিবে তাহা পূর্বাহ্নে কখনও জানাইবে না, এই তাহার স্বভাব। এই সিংভূমের জঙ্গলে সে যে সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, একথা নীলু রায় আসিবার আগের দিন পর্যন্ত জানিতেন না। হঠাৎ লুৎফুন্নিসাব চিঠিগুলি লইয়া সে যে মুর্শিদাবাদে যাইবে একথাও নীলু রায় কল্পনা করেন নাই, যাত্রা করিবার আগে সে যে হঠাৎ বাঘ শিকার করিতে যাইবে ইহাও একটা অদ্ভুত আকস্মিক কাণ্ড। না, ধূর্জটিমঙ্গলকে নীলু রায় বুঝিতে পাবেন না। তিনি যদি সঙ্গে যাইতে চাহিতেন তাহা হইলে সে আপত্তি কবিত না, তিনি যাইতে চাহিলেন না তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই। ঝকমাবিকে সঙ্গে না লওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গল নিজের মতে নিজের পথে চলেন, কে তাঁহার সঙ্গী হইবে না হইবে সে সম্বন্ধে মাথাই ঘামান না। অদ্ভুত একবগ্‌গা অন্যমনস্ক গোছের লোক। কেরামত ধূর্জটিমঙ্গল—দুইজনকেই ভালবাসেন নীলু রায়, কিন্তু দুইজনই তাঁহার নাগালের বাহিরে। এখন কি কর্তব্য ? হঠাৎ তাঁহাব হবিপালের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল খোঁড়া ছিরিকে, ছিরির বাবা কৈলাসকে, ময়রা সাধুচরণকে, ব্রাহ্মণী রাধীকে। ইহারা তো তাঁহার নাগালের বাহিরে নয়। হবিপালে তাঁহার বাড়িটাও পড়িয়া আছে। সেখানে গিয়ে বাস কবিলে কেমন হয় ? কিন্তু মন সায় দিল না। ছিরি, কৈলাস সাধুচরণদের গ্রাম্য ভালবাসায় মন ভরে না। সে ভালবাসা নিখাদ, সে ভালবাসা পবিত্র, কিন্তু তাহাতেই মন ভরে না। ভালবাসা

ছাড়াও মন আরও কিছু চায়। সে বস্তুটা কি। নীলু রায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু মনের মধ্যে কোনও সদুত্তর পাইলেন না। আমি কিন্তু উত্তরটা জানি। পশুরা যাহাতে সন্তুষ্ট হয় মানুষের তাহাতে সন্তোষ নাই। স্বাভাবিক আহার-বিহার স্নেহ-ভালবাসার বাহিরে সে এমন একটা জগতে বিচরণ করিতে চায় যে জগতে মানুষের সৃষ্টি, যে জগতে মানুষের প্রতিভা আপন খামখেয়ালে অভিনব শোভা সৃষ্টি করিয়াছে, যে জগতে কেরামতরা সঙ্গীতসাধনা করে, ধূর্জটিমঙ্গলদের রহস্যময় গাম্ভীর্য, বিপুল সাহস, বিরাট দাক্ষিণ্য যে জগতের ভূষণ—সেই জগতে বিচরণ করিবার জন্য মানুষের মন উন্মুখ সৃষ্টির নিত্যনূতন প্রকাশ দেখিয়া সে আত্মহারা হইতে চায়। স্বাভাবিক জীবনযাপন তাহার মনের এ ক্ষুধা মিটাইতে পারে না। নীলু রায়ের পক্ষে আর হরিপালে গিয়া বসবাস করা সম্ভবপর নহে। তিনি যে সংস্কৃতির স্বাদ পাইয়াছেন তাহা শহরেই সুলভ, একমাত্র সুশিক্ষিত লোকের সঙ্গলাভ করিলেই তাহা পাওয়া যায় এ রকম লোকেরা পল্লীগ্রামে বড় একটা থাকেন না। তাঁহাদের বাস শহরে। পল্লীবাসীদের সারল্য, পল্লীবাসীদের স্নেহ ভালবাসার মধ্যে একটা মাধুর্য আছে বটে, কিন্তু সে মাধুর্য ধূর্জটিমঙ্গলের রহস্যময় আভিজাত্য বা কেরামতের অপরূপ গজলের সহিত তুলনায় নয়। নীলু রায়কে আবার সুতানুটিতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ইহাই তিনি আবার অনুভব করিলেন যে তিনি নিঃসঙ্গ। কেরামত বা ধূর্জটিমঙ্গলকে তিনি যেমন করিয়া পাইতে চান তাহারা তেমন করিয়া ধরা দেয় না। তাহারা বন্ধু বটে, কিন্তু বড় সুদূরের। ঝকমারিকে বিবাহ করিতে পারিলে হয়তো তিনি এ পরিবারের আত্মীয় হইতে পারিতেন, কিন্তু আজ বুঝিলেন তাহা হইবার নয়। সুতানুটিতে এখন গিয়াই বা কি করিবেন? কাজকর্ম সব তো বন্ধ। ইংরেজদের এবং নবাবের অত্যাচারে মধ্যবিত্ত বাঙালী পল্লীগুলি তো শূন্য। অনেক বাড়ি পুড়িয়াছে। ইংরেজদের সহিত নবাবের কলহে সেখানকার আকাশবাতাস থমথম করিতেছে। যে কোন সময় ঝড় উঠিতে পারে। তাহা ছাড়া তিনি যাইবেনই বা কেমন করিয়া? স্বেচ্ছায় যে তিনি জগদ্ধাত্রী ও তাঁহার ছেলে দুইটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন।

নীলু রায় বাহির হইতে ধীরে ধীরে ভিতর গেলেন।

বাহির ঘর হইতে ধূর্জটিমঙ্গলের শয়নঘরটি দেখা যায়। অত রাত্রেও

সে ঘরের কপাট খোলা দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন জগদ্ধাত্রী বোধহয় এতক্ষণ ঘরে খিল দিয়া ঘুমাইতেছে। তিনি খোলা দ্বারটার দিকে আগাইয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন—জগদ্ধাত্রী বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। ক্রন্দনাবেগে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

নীলু রায় একবার গলা খাঁকারি দিলেন। ইহাতেই কাজ হইল। জগদ্ধাত্রী সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিল।

"কে—"

"আমি নীলু।"

"আপনি যান নি?"

"না। সবাই চলে গেলে আপনাকে দেখবে কে বৌঠান!"

"কেন, দানিয়েল আছে, কস্তুরী আছে, লালী আছে, স্বয়ং ধলরাজাই আছেন—"

জগদ্ধাত্রীর কণ্ঠস্বরে যে সুর বাজিয়া উঠিল তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। তাহা কোমল অথচ কঠিন, তাহা নিরুত্তাপ অথচ উত্তপ্ত, তাহা সরল অথচ বক্র, তাহাতে বিলাপের ভাষা নাই কিন্তু অশ্রুর আভাস আছে। নীলু রায় নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"আপনার খাওয়া হ'য়ে গেছে তো? এইবার শুয়ে পড়ুন—"

"আমি খেয়েছি। ভেবেছিলাম আপনিও আপনার বন্ধুর সঙ্গে চলে' গেছেন। আপনি আছেন জানলে আপনাকে আগে খাইয়ে তবে খেতাম বসুন, আপনার খাবার নিয়ে আসি।"

"আমার তেমন ক্ষিধে পায় নি। আমার জন্যে কিছু করতে হবে না। আমিও শুতে যাচ্ছি—"

"আপনার জন্যে আমার কিছুই করতে হবে না। আপনার বন্ধুর জন্যই রান্না করেছিলাম। কিন্তু তিনি দুধ মধু আর মহুয়া ছাড়া আর তো কিছুই খেলেন না। সব রান্না করা আছে, আপনি বসুন—"

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া মেজেতে একটি আসন বিছাইয়া দিলেন।

"বসুন আপনি। আমি খাবার আনছি।"

মাথায় আধঘোমটা টানিয়া জগদ্ধাত্রী ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

যে ওঁরাও বালিকাটি তাঁহার নিকট সদাসর্বদা থাকিত সে এক গ্লাস জল লইয়া প্রবেশ করিল। আগেকার গ্লাসে ঢাকনা দেওয়া থাকিত। এ গ্লাসটি রূপার এবং ইহার ঢাকনাটি বেশী কারুকার্যময় বলিয়া নীলু রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মনে হইল ঢাকনাটির উপর দামী পাথর বসানো রহিয়াছে। তিনি আসনে বসিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

জগদ্ধাত্রী খাবারের থালা লইয়া প্রবেশ করিলেন। বালিকাটি পিছুপিছু আর একটি থালা আনিল। তাহাতে নানারকম ব্যঞ্জন সাজানো। তাহার পর আসিল আরও ছুইটি ছোট থালা।

নীলু রায় বলিলেন—"এত খাবার তো আমি খেতে পারব না। এত খাবার আপনি রেঁধেছেন ?"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—"সব আমার রান্না নয়। ওই ছোট থালা ছুটো দানিয়েলের বাড়ি থেকে এসেছে। ও আজ শিকারে বেরিয়েছিল সকালে। একটা বরা মেরেছে আর কয়েকটা বনমুরগী। উনি এসব ভালবাসেন তাই লালী বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু উনি তো চলে গেলেন, আমি ওসব খাই না। ভাবছিলাম ফেরত দেব। আপনি তো ও সব খান—"

"খাই।"

"তাহলে তো ভালই হল।"

জগদ্ধাত্রী খাবার সব সাজাইয়া দিয়া, মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া একটি ছোট পাখা হাতে তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। মৃছু মৃছু বাতাস করিতে লাগিলেন। নীলু রায়ের বিসদৃশ বোধ হইল না। ইহাই তখন রেওয়াজ ছিল। আতপ চালের চমৎকার ভাত, ভাজা মুগের ডাল, বড়ার ডালনা, ডুমুরের ঘণ্ট, ছুবিয়া মাছের ঝাল, শোল মাছের অম্বল, এসব ছাড়া একটু ক্ষীর এবং মিষ্টান্ন। সেই বালিকাটি কিছু গরম লুচি ভাজিয়া আনিল।

"লুচি দিয়ে মাংস দিয়ে খান। উনি খুব ভালবাসেন। ওঁর জন্মে ময়দা মেখেই রেখেছিলাম, কিন্তু উনি তো কিছু না খেয়েই চলে' গেলেন।"

একথাগুলির মধ্যেও নীলু রায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন ছুঃখের আভাস পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না, নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। প্রতিটি ব্যঞ্জন অপূর্ব। এমন ডুমুরের ডালনা এবং ছুধির মাছের ঝাল তিনি

ইতিপূর্বে খাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়িল না। বনমুরগী এবং বরাহের মাংসও চমৎকার। নীলু রায় নিঃশব্দে সমস্ত নিঃশেষ করিলেন। তিনি যে পরিমাণ আহার করিলেন তাহা আজকালকার হিসাবে ভূরিভোজন হিসাবে গণ্য হইবে। আজকাল আমরা একটুকরা পাঁউরুটি, একটা সন্দেশ, আধখানা ফ্রাই খাইয়া উদ্‌গার তুলিয়া বলি—উঃ খুব খেয়েছি, আর পারব না। কিন্তু সেকালে নীলু রায়রা ওই পরিমাণ ভোজ্যই দুইবেলা উদরস্থ করিয়া স্বচ্ছন্দে হজম করিতেন। বিস্ময়ের কিছু ছিল না ইহাতে।

জল খাইবাব সময় নীলু রায় রূপার গ্লাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

"এমন গ্লাস কোথায় পেলেন বৌঠান। রূপোর ঢাকনিতে যে হীরে, মুক্তো, প্রবাল, চুনী বসানো সেগুলো আসল বলেই মনে হচ্ছে। এ গেলাস কি ধূর্জটি কিনেছিল, না ফরমাস দিয়ে তৈরি করিয়েছিল?"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—"আমার বিয়ের সময় শেঠ উমির্চাদ আমাকে ওটা উপহার-স্বরূপ দিয়েছিলেন—"

"উমির্চাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কিরকম? আত্মীয় নয় নিশ্চয়, উনি তো বাঙালী নন, পশ্চিমদেশের লোক—"

"না। আত্মীয় নন। কিন্তু উনি আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। আমাদেব বাড়িতে প্রায়ই এসে দাবা খেলতেন। ওঁর একটি খুব সুন্দবী ভাগনী ছিল। নাম লাখপতিয়া। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল খুব—"

নীলু রায় মনে মনে চমকিত হইলেন। উমিচাঁদ বৌঠানের বাবার বন্ধু? উমির্চাদের খবর কি জানেন তিনি?

"উমির্চাদ আপনার বাবার বন্ধু? তা জানতাম না তো। কতদিন তাঁর খবর পান নি?"

"খবর অনেকদিন পাইনি। বিয়ের পর তো সুতানুটিতে বেশীদিন থাকা হয় নি। বেশির ভাগ বারাসতেই ছিলাম। সেখানে ওই মুখপোড়া নবাবের কে একটা লোক বারবার আমাদের বাড়িতে আসতে লাগল। বাবা ভয় পেয়ে তাই আমাদের জন সায়েবের কাছে নিয়ে এলেন। সেই থেকে তো এখানেই আছি। আর কোন খবর পাইনি। লাখপতিয়ার এতদিন বিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চয়। আপনি তাদের খবর জানেন?"

"আমি যে খবর জানি তা তো ভয়ানক। ধূর্জটি আপনাকে কিছু বলে নি?"

"না। তাকে তো চেনেন আপনি। কথাই বলে না মোটে। অন্যমনস্ক লোক। তরকারিতে যদি কোনদিন নুন দিতে ভুলে যাই, আলোনাই খেয়ে যাবে, বলবে না তরকাবিতে নুন দাও নি। আপনি বলুন না, কি খবর ওদের। ভয়ানক খবর?"

"ভয়ানক খবর।"

নীলু রায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

"জগন্নাথকে চিনতেন আপনি?"

"খুব চিনতাম। জগন্নাথ তো ওদের বাড়ির জমাদার ছিল। খুব ভালো লোক—"

"হাজারিমলকে?"

"হ্যাঁ। তিনি তো উমিচাঁদের আত্মীয়। ওদের বাড়ির সব তদ্বির তদারক করতেন। আমাদেব বাড়িতেও আসতেন মাঝে মাঝে কি হয়েছে ওদের—"

"এখনি যদি বলি আপনার রাত্রে আর ঘুম হবে না।"

"তবু বলুন। না শুনলে আরও ঘুম হবে না।"

নীলু রায় বলিতে লাগিলেন।

"নবাববাহাদুর যে কলকাতা আক্রমণ করে' ইংরেজদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এ খবর নিশ্চয়ই জানেন আপনি।"

"আমি তো কিছুই জানি না। আপনার বন্ধু তো আমাকে কিছুই বলেন নি। আপনি সব খুলে বলুন—"

"ইংরেজদের উপর রেগে গিয়ে নবাব সাহেব কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। কলকাতার নামটা পর্যন্ত বদলে দিয়ে আলিপুর নাম রেখেছিলেন। আমাদের দেশী লোকদের বড় কষ্ট হয়েছিল। ব্যবসাবাণিজ্য তো বন্ধ হয়েই গিয়েছিল, আমাদের বাড়িঘরও পুড়ে গিয়েছিল। নবাব কলকাতা আক্রমণ করবার কিছু আগে আমি চরাধিপতি রামরাম সিংহের বাড়িতে একটা গানের মজলিসে গিয়েছিলাম। তিনি শিকারেরও কিছু আয়োজন করেছিলেন। রামরাম সিংহের বাড়ি থেকে যেদিন ফিরছি

সেদিন তিনি আমাকে বললেন—'নবাব কলকাতা আক্রমণ করবেন। যুদ্ধে সাধারণ লোকদের বড় মুশকিল হয়। তোমরা যতশীঘ্র পার কলকাতা থেকে অন্যত্র চলে' যাও। আর উমিচাঁদকে এই চিঠিটা দিও। সে আমার বন্ধু, তাকেও আমি এই পরামর্শ দিয়েছি চিঠিতে ' আমি চিঠিটা নিয়ে এলাম। এসে দেখি যুদ্ধ প্রায় বাধ-বাধ। নবাব সৈন্যেব সঙ্গে ইংবেজদের টালায় ছোটখাটো একটা যুদ্ধ হয়েও গেছে। শুনলাম ঘসেটি বেগমেব পেয়ারের লোক নবাবের চিরশত্রু রাজবল্লভের সঙ্গে না কি নবাবের সন্ধি হয়ে গেছে। রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লব নবাবের ভয়ে অনেকদিন আগে পালিয়ে এসে ইংরেজদেব আশ্রয় নিয়েছিল। ইংরেজরা যেই জানল যে রাজবল্লভের সঙ্গে নবাবের মিটমাট হয়ে গেছে, অমনি তারা কৃষ্ণবল্লভকে কয়েদ করে' ফেলল। ঠিক এই সময়েই আমি রামরাম সিংহের চিঠি নিয়ে সুতানুটিতে হাজিব হলাম। ধূর্জটিমঙ্গলেব সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ভার আমার উপব ছিল। কয়েকটা সিন্দুকে অনেক নগদ টাকা, রূপোর বাসন আর গয়নাপত্তব ছিল। আমি সেগুলো তাড়াতাড়ি বাবাসতে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। উমিচাঁদের বাড়িতে আর যাওয়া হল না। উমিচাঁদের সঙ্গে আমার জানাশোনাও তেমন ছিল না, ওরা খুব বড়লোক তো, পাইক বরকন্দাজ পেরিয়ে তবে মালিকের নাগাল পেতে হয়, তাই যাবার তেমন উৎসাহও পাচ্ছিলাম না। এমন সময় আমাব দেখা হ'য়ে গেল মীর মহম্মদের সঙ্গে। সে ফৌজে চাকরি করত, কিন্তু কি কারণে জানি না, তার চাকরি আর ছিল না। আলাপ ছিল তার সঙ্গে। সে এসে আমার কাছে টাকা ধার চাইলে।"

জগদ্ধাত্রী বলিয়া উঠিলেন—"মীর মহম্মদ! তাকে চেনেন না কি আপনি—?"

"আলাপ ছিল। কেন?"

"একজন মীর মহম্মদের ভয়েই তো বাবা আমাকে এই জঙ্গলে তাঁর বন্ধু জন সাহেবের আশ্রয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মীর মহম্মদ একদিন আমাকে পুকুরে স্নান করতে দেখেছিল, তারপর থেকে ঘন ঘন আমাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করল। সবাই বলতে লাগল উনি নবাব সিরাজের একজন দোস্ত। ফৌজে চাকরি আছে কিন্তু ওঁর আসল কাজ নবাবের রঙমহলের

জন্য মেয়েমানুষ যোগাড় করা। এই কথা শুনবার পরদিনই বাবা আমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। চলে এলেন জন সাহেবের আশ্রয়ে। আপনি যে মীর মহম্মদের কথা বলেছেন সে কেমন দেখতে বলুন তো—"

"দেখতে সুপুরুষ। লাল দাড়ি, টিয়াপাখীব ঠোঁটের মতো নাক।"

"এ তো তাহলে সেই লোক। তাকে আমি দেখেছি। একদিন আমাদের বাড়িব ভিতরে ঢুকে পড়েছিল!"

"তাই না কি!"

"এর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল? লোকটাকে আপনি টাকা ধার দিলেন—?"

"না দিই নি। তখন আমার হাতে টাকা ছিল না। শুনে সে বলল তাহলে উমিচাঁদের কাছে যাই। উমিচাঁদ কৃপণ বটে, কিন্তু আমাকে 'না' করতে পারবে না। তখন আমি তাকে বললাম—চরাধিপতি রামরাম সিংহ উমিচাঁদকে দেবার জন্য একটা চিঠি দিয়েছিলেন আমাকে। আমি এখনও গিয়ে উঠতে পারি নি। আপনি যখন সেখানে যাচ্ছেন নিয়ে যান চিঠিখানা। চিঠিখানা দিলাম। কিন্তু লোকটা শয়তান। চিঠি সে উমিচাঁদকে দেয় নি। সে চিঠি বিক্রি করেছিল ফোর্ট উইলিয়মের সাহেবদের কাছে। সাহেবরা চিঠি পেয়েই সন্দেহ করল যে উমিচাঁদ নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে নবাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা উমিচাঁদকে বন্দী করে ফোর্ট উইলিয়মে পুরে ফেলল। হাজারিমল তখন ভয় পেয়ে বাড়ির মেয়েদের আর বাড়িতে টাকাকড়ি গয়নাপত্র যা ছিল সব নিয়ে অন্য জায়গায় পালাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু এ-ও ইংরেজদের সহ্য হল না। তারা দলে দলে সেনা পাঠিয়ে ঘিরে ফেলল উমিচাঁদের বাড়ি। তারা যখন মেয়েদের মহলে ঢোকবার চেষ্টা করছে বুড়ো জগন্নাথ জাতে ছিল সে ক্ষত্রিয়, বাধা দিলে তাদের লোকলস্কর নিয়ে। রক্তারক্তি কাণ্ড হল একটা। জগন্নাথ শেষে দেখলে সাহেবগুলোকে আর রোখা যাচ্ছে না, তারা অন্দরে ঢুকবেই, তখন সে এক ভয়ানক কাণ্ড করে' বসল। সে দৌড়ে ভিতরে ঢুকে গিয়ে অন্দরমহলের কপাটটা বন্ধ করে দিল। তারপর মেয়েদের বলল—আমি চিতা তৈরি করছি, তোমরা যদি আত্মসম্মান বাঁচাতে চাও এই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দাও। স্মরণ কর পদ্মিনীর কথা, জহরব্রতের কাহিনী। মেয়েরা

অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে ভয় পেতে লাগল। তখন ক্ষত্রিয় জগন্নাথ কি করল জানেন? তার হাতে শাণিত তলোয়ার ছিল, সে টপাটপ তেরজন মেয়ের মুণ্ডু কেটে তাদের জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দিল একে একে। তারপর আত্মহত্যা করবার জন্মে নিজের বুকে ছুরি বসাল। কিন্তু মরল না সে। ফিরিঙ্গীরা তাকে ধরাধরি করে' বাইরে নিয়ে এল। আহত অবস্থায় তাকে বাইরে রেখে আবার অন্তঃপুরে ঢোকবার চেষ্টা করল তারা। কিন্তু পারল না। তখন চারিদিকে আগুন লেগে গেছে। ফিরে এসে তারা জগন্নাথকে পায় নি। আহত অবস্থাতেই সে অন্তর্ধান করেছিল। শুধু অন্তর্ধান করে নি, প্রতিশোধও নিয়েছিল। নবাব সৈন্যের ছাউনিতে গিয়ে নবাব সৈন্যদের কলকাতায় ঢোকবার টালার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল সে। সেই রাস্তায় ঢুকে নবাব ইংরেজদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল কলকাতা থেকে।"

নীলু রায় চুপ করিলেন।

"উমিচাঁদের বাড়ির মেয়েরা সব মরে' গেছে তাহলে? লাখপতিয়া বেঁচে নেই?"

"ঠিক বলতে পারব না। তবে খুব সম্ভবতঃ নেই।"

জগদ্ধাত্রী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর প্রশ্ন করিলেন—"ঠাকুরপো আমার একটি উপকার করবেন?"

"কি বলুন—"

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া ভিতরে গেলেন। তাহার পর প্রকাণ্ড একটি রামদা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

"এই দা দিয়ে আমাকে হত্যা করুন আপনি। আমাকে মুক্তি দিন। এদেশে মেয়েমানুষ হয়ে বাঁচবার আর ইচ্ছে নেই আমার। এদেশে একদিকে মুসলমান, অন্যদিকে ইংরেজ। যে সমাজে বাস করি সে সমাজের পুরুষরা নিষ্ঠুর ভীতু, অমানুষ। তারা গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করে কিন্তু স্ত্রীদের রক্ষা করতে পারে না। স্ত্রীদের দিকে ফিরেও চায় না। তারা নিজেদের নিয়েই মত্ত।"

নীলু রায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথাই সরিল না।

তাহার পর বলিলেন—"আমি আপনার ঘাতক হব? একথা ভাবলেন আপনি কেমন করে'। স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তা মিথ্যা নয়। এদেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই বড় অসহায়। কিন্তু আপনি তো ওই অধিকাংশের দলে পড়েন না। আপনি মহেশমঙ্গলের পুত্রবধূ, ধূর্জটিমঙ্গলের স্ত্রী। কলকাতার দেশী সমাজে ওঁরা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ধূর্জটিমঙ্গল আপনাকে রক্ষা করবার জন্যেই এখানে একটা গৃহস্থালী পত্তন করেছে। জন সাহেবের বিশাল সম্পত্তির অধীশ্বরী করে' সে আপনাকে এখানে রেখেছে। জন সাহেবের কালাপল্টনের দল আপনাকে পাহারা দিচ্ছে। স্বয়ং ধলরাজা আপনার সহায়। আপনি নিজেকে অসহায় মনে করছেন কেন?"

"স্বামী কাছে না থাকলে স্ত্রীলোকমাত্রই নিজেকে অসহায় মনে করে। সুতানুটিতে আমাদের বাড়িতে লোকজনের অভাব ছিল না। তবু আমার দুই জাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে, আমার ননদ বারাহীকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। অন্য ননদদের জগদম্বা, দুর্গা, জয়া, শ্যামাঙ্গিনীকে বেইজ্জত করে' মেরে ফেলেছে ওরা। এখানেই বা কখন নবাবের ফৌজ বা ইংরেজের ফৌজ এসে পড়বে কে জানে। যদি আসে তখন আমাকে রক্ষা করবে কে?"

নীলু রায় বলিলেন, "আমি। ধূর্জটি আমাকে সেইজন্যই রেখে গেছে।"

"কিন্তু আপনি একা কি করবেন—"

"কেন দানিয়েল আর তার পল্টন আছে—"

"নবাবের ফৌজ কিংবা ইংরেজের গোরাদের সামনে কি ওরা দাঁড়াতে পারবে? পারবে না। সবাই পালাবে।"

"নবাবের ফৌজ কিংবা ইংরেজের গোরাদের এখানে আসার সম্ভাবনা দেখি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"নিশ্চিন্ত থাকুন বললেই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। উনি থাকলে পারতাম, কিন্তু বাংলাদেশের যে খবর আপনি বললেন তাতে মনে হয় না উনি তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন।"

"আমি থাকলে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না বলছেন, ধূর্জটি থাকলেই পারতেন—এটা কি রকম কথা হল বৌঠান?"

"একথা বলছি কারণ স্বামীর চেয়ে বড় ভরসা স্ত্রীলোকের আর কেউ নেই। কিন্তু আমার এমন কপাল যে আমার স্বামী প্রায়ই আমার কাছে থাকেন

না। কখন কোথায় যান, কেন যান, তাও বলেন না। এখন হঠাৎ মুর্শিদাবাদ গেলেন কেন সেটার কারণ একটা বলেছেন কিন্তু বিশ্বাস হয় না।"

"না জরুরি দরকারে গেছে।"

"আপনি সব খুলে বলুন।"

নীলু রায় মিথ্যাভাষণ করিলেন।

বলিলেন—"আমি জানি না। একটি কথা বিশ্বাস করুন আপনাকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব।"

"তাতে আপনার প্রাণটাও যাবে, আমিও বক্ষা পাব না। আমাব বাঁচাব আর তো দরকার নেই। বংশরক্ষা তো আমি করেছি। আমার দুটো ছেলে হযেছে। বড় জা বাঁজা ছিলেন বলে' উনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সেজ জাব সঙ্গে ওঁর মনের মিল হয় নি। তাই আমাকে বিয়ে করলেন। আমি তো যমজ ছেলে দিয়েছি ওঁকে। আর আমার বাচার দরকার কি ?"

"ওই ছেলে দুটির জন্যই আপনার বাঁচার দরকাব।"

"ছেলেরা তো মানুষ হচ্ছে লালী আর কস্তুবীর কাছে। আমার দিকে তো ফিরেও চায় না। ওদের কাছেই খায় শোয়। ওদের সঙ্গেই খেলাধুলো কবে'। আমাকে তো কারুরই প্রয়োজন নেই। ঝকমারিটা এসেছিল, সে-ও চলে' গেল।"

সহসা নীলু রায় যেন জগদ্ধাত্রীর মনের নিগূঢ় বেদনাটাব আভাস পাইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিলেন যে সে বেদনা উপশম করিবার সাধ্য তাঁহার নেই। ইহা লইয়া আলোচনা করিলে বেদনা কমিবে না, বাড়িবে। তাই তিনি প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"এবার শুয়ে পড়ুন। আপনার যদি ভয় করে তাহলে আমি না হয় ধলরাজার সঙ্গে দেখা ক'রে আরও লোকজন আনবার ব্যবস্থা করব। দিন, ওটা দিন আমাকে—"

রামদাখানা লইয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"আপাততঃ আমিই আপনাকে পাহাবা দিই এইটে নিয়ে—"

দাখানা লইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

জগদ্ধাত্রী যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীলু রায় বিছানায় গিয়া শুইলেন বটে কিন্তু তাঁহার ঘুম আসিল না। অনেকক্ষণ এপাশ

ওপাশ করিয়া তিনি অবশেষে উঠিয়া পড়িলেন এবং আবার অন্দরে আসিলেন। দেখিলেন জগদ্ধাত্রী নাই। আর একটু আগাইয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন ঠাকুরঘরের কপাট খোলা। সেই খোলা কপাট দিয়া প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল তাঁহার। ঠাকুরঘরেব দেওয়ালেব গায়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রীব পট, মাটির উপর লক্ষ্মীজনার্দনের রৌপ্যনির্মিত আসন, আসনেব চারিদিকে ছোটবড় নানারকম কড়ির ঝাঁপি, ছোটবড় নানারকম পাথরও, কোনটা সিঁদুর মাখানো, কোনটা চন্দনলিপ্ত। চারিদিকে ফুল বিল্বপত্র। ধুপাধারে ধুনা পুড়িতেছে। জগদ্ধাত্রী প্রতিমাবৎ কবজোড়ে বসিয়া আছেন। নীলু রায় তাঁহার মুখটা দেখিতে পাইলেন না। পাইলে দেখিতেন মুদিত নয়ন দুইটি হইতে অবিরলধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। সহসা চতুর্দিকে পাখী ডাকিয়া উঠিল। নীলু রায় বুঝিলেন রাত পোহাইয়া গেল। সন্তর্পণে তিনি আবার বাহিবে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন পূর্বাকাশে উষা হাসিতেছে।

নীলু রায় সরদার মাখনলালের বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। কাছাকাছি গিয়াই দেখিতে পাইলেন মাখনলাল একটা খোলা জায়গায় একটা খাটিয়ার উপর চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে। আর তাহার পাশেব খাটিয়াতেই শুইয়া আছে একটা প্রায়-উলঙ্গিনী আদিবাসী রমণী।

নীলু রায় আর কাছে গেলেন না। দূর হইতেই ডাকিলেন—"মাখনলাল ওঠ—"

মাখনলাল ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহার পর নিজের গায়েব চাদরটা মেয়েটির গায়ে ফেলিয়া দিয়া তাহাব আব্রু রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইল। মেয়েটি উঠিয়া চলিয়া গেল ঘবেব ভিতরে।

"নীলুবাবু না কি! আসেন, আসেন—এত ভোরে কি মনে করে?'

"ধূর্জটি চলে যাওয়াতে বৌঠান বড় ভয় পেয়েছেন। তোমার কালা পলটন কত আছে এখানে?"

"এক শ'।"

"ইংরেজের ফৌজ যদি আসে—"

"এতদূরে ইংরেজের ফৌজ আসবে না। ওরা এখন ওদেশেই ব্যস্ত।"

"নবাবের ফৌজ—"

"তারা আমাদের দলের লোক। ধলরাজা তাদের তোয়াজ করে' রেখেছেন। তারা আমাদের কিছু বলবে না। এখানে নবাবের ফৌজ নেইও বেশী।"

"তাহলে কোনও ভয় নেই বলছ?"

"কিচ্ছু ভয় নেই। মাকে নির্ভয়ে থাকতে বলুন।"

জগদ্ধাত্রীর ভয় যে কি এবং অশান্তির কারণ যে কোথায় তাহার আভাস একটু আগেই তিনি পাইয়াছিলেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে পলটন মোতায়েন করিয়া সে ভয় বা অশান্তি দূর করা যাইবে না। তবু তিনি বলিলেন—"বৌঠানের বাড়ির সামনে তবু তুমি একটু পাহারার বন্দোবস্ত কর। ওদিকটা রাত্রে যেন খাঁ খাঁ করে। সিপাহীদের হাঁকডাক শুনলে বৌঠান নিশ্চিন্ত হবেন—"

"বেশ তার ব্যবস্থা আজ থেকেই করব। তবে কি জানেন কর্তা, ওরা বলবে হুঁ জেগে পাহারা দিব। কিন্তু দেবে না। মহুয়ার মদ খেয়ে বেহুঁশ হ'য়ে ঘুমুবে। তবে ব্যবস্থা করব আমি—"

"আচ্ছা, আমি চলি তাহলে। আসব আবার। দাবা খেলবে আজ?"

"আজ একটা কিন্তু অন্য রকম মানস করেছি কর্তা। আপনিও যদি সঙ্গে আসেন তাহলে খুব ভাল হয়। আপনি তো বন্দুকে সিদ্ধহস্ত শুনেছি—"

"শিকারে যাবে না কি?"

"হ্যাঁ, কাছের জঙ্গলে কিছু বটের এসেছে শুনলাম। কিছু মেরে আনব ভেবেছি। খাসা মাংস। তবে জন পিছু দশ বারোটা না হলে পেট ভরবে না। বিশ ত্রিশটা মারতে হবে।"

"বৌঠানকে দিয়ে আর ওসব রাঁধাতে চাই না।"

"বুধু রাঁধবে। ও চমৎকার রাঁধে। জন সাহেব ওর হাতের রোস্ট খুব ভালবাসতেন।"

"বুধু? সে আবার কে!"

"আমার রাঁধুনী। ওই যে ছুঁড়ীটা শুয়েছিল এখানে।"

"বেশ, আসছি তাহলে একটু পরে—। আমিও অনেকদিন বটের খাই নি।"

নীলু রায় পাশেই একটা সরু পথ দিয়া কইলি নদীর দিকে চলিলেন। পথে একটা নিমগাছও চোখে পড়িল। একটা ডাল বেশ নীচু। নীলু রায় লাফাইয়া ডালটা ধরিলেন এবং একটা দাঁতন ভাঙিয়া লইলেন। উদ্দেশ্য কইলির তীরে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিবেন। পথে ঝামরির সহিত দেখা হইল। তাহার হাতে একটি ছোট কচ্ছপ। দড়িতে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার গায়ে একটা কোট।

"কি ঝামরি। কাছিম না কি ওটা? কি করবি?"

"আমি আর কি করব। রঙ্কিনী খাবেক। ভারি নোলা যে উয়ার। লিত্যি লতুন জিনিস খেতে চায়। ক'দিন থেকে রোজ আমাকে স্বপন দিচ্ছে—কাছিম আন, কাছিম আন, কাছিম আন। পায়রা ভাল লাগে না। আজ পেয়ে গেলাম একটা। রেঁধে দিব। বুধি রাঁধবে, আমি সামনে ধরে দিব।"

"এ কোট কে দিল তোকে?"

"ওই কালা পল্টনের এক মিনসে। আমার সঙ্গে পীরিত জমাতে চায়। কোটটা গায়ে দিয়ে তাকে বললাম—ওরে খালভরা মাগারেঁড়ে আমি যে রঙ্কিনীর সেবাদাসী, বনের বাঘ সিংহ কাড়া আমার নাগর—তুই আমাকে ছুঁলে তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে—বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেবার বুদ্ধি কে দিলেক তোকে?"

ঝামরি হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার পর সে হঠাৎ কাছিমটা মাটিতে নামাইয়া দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিল কাহাকে। নীলু রায় দেখিলেন একটা গাছের মগডালে একটা বাদামী রঙের গ্যাট্টাগোঁট্টা পাখী বসিয়া রহিয়াছে। ল্যাজে বাদামী রঙের চওড়া ডোরা। দেখিলেই হিংস্র বলিয়া মনে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি পাখী ওটা?"

"সাপমার বাজ। সাপ খায়। রঙ্কিনীও সাপের শত্রু। মনে হয় রঙ্কিনীর সঙ্গে ওর পীরিত আছে। তাই ওকে দেখলেই গড় করি। আরে এই ফাঁকে, কাছিমটো পালাবার তালে আছে—"

কাছিমটা সত্যই কিছুদূর চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার গায়ে দড়ি বাঁধা ছিল, ঝামরি আবার তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর গাছের একটা ডাল ভাঙিয়া শপাশপ মারিতে লাগিল তাহাকে।

"পালাছেন! তোর ভাগ্যি কত যে রঙ্কিণীর ভোগে লাগবি তুই।"

নীলু রায় এই পাগলীর নিকট বেশীক্ষণ আর দাঁড়াইলেন না। আগাইয়া গেলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন জগদ্ধাত্রী তাঁহার অপেক্ষায় চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "এত ভোরে কোথা গিয়েছিলেন ঠাকুরপো?"

"এই একটু বেড়িয়ে এলাম।"

"আমি খাবার নিয়ে কতক্ষণ থেকে বসে আছি। ওরে রুলা দুধটা আবার গরম কর। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আসুন ভিতরে আসুন—"

৭

এইবার মীর মহম্মদের খোঁজ লওয়া যাক।

এই মীর মহম্মদই জগদ্ধাত্রীকে দেখিয়া মুগ্ধ এবং প্রলুব্ধ হইয়াছিল। এই মীর মহম্মদই জগদ্ধাত্রীর পিতৃগৃহে বারবার যাতায়াত শুরু করিয়াছিল বলিয়া জগদ্ধাত্রীর পিতা রামলোচন একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া সিংভূমের জঙ্গলে আসিয়া জন সাহেবের আশ্রয়প্রার্থী হন। এই মীর মহম্মদের সঙ্গে নীলু রায়েরও আলাপ ছিল, কারণ নীলু রায় সকলের সহিতই, বিশেষ করিয়া নবাবের কর্মচারীদের সহিত হৃদ্যতা রক্ষা করা পছন্দ করিতেন। তাঁহার মনে হইত নিজের এবং ধূর্জটির বিষয়আশয় তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, রাজকর্মচারীদের সহিত ভাব করিয়া রাখাই ভালো। ধূর্জটিমঙ্গলের সহিত মীর মহম্মদের আলাপ ছিল না, তাহাকে তিনি চিনিতেনও না। মীর মহম্মদ খবর লইবারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই যে তাঁহার হৃদয়হারিণীর কোনও স্বামী আছে কি না। রামলোচন যখন জগদ্ধাত্রীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন তখন মীর মহম্মদের মাথাতেও বজ্র পড়িয়াছিল। সিরাজ জানিতে পারিয়াছিলেন যে মীরমহম্মদের সহিত ইংরেজ বণিকদের দহরম মহরম আছে। সেই সময় ঢাকায় ঘসেটি বেগমের আশ্রয় না পাইলে মীর মহম্মদ মহা বিপদে পড়িতেন। ইংরেজেরই অনুরোধে ঘসেটি বেগমের দক্ষিণ হস্ত

রাজা রাজবল্লভ মীর মহম্মদকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বেশীদিন এ সৌভাগ্য রহিল না। কিছুদিন পরেই ঘসেটি বেগম মুর্শিদাবাদে আসিয়া মতিঝিলে বসবাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় মীর মহম্মদকেও মুর্শিদাবাদ আসিতে হইল। আসিবামাত্র তিনি কয়েদ হইলেন। ইংরেজদের 'দস্তুক' লইয়া তিনি ব্যবসায় করিতেন এ কথা কাজী সাহেবের নিকট প্রমাণিত হইয়া গেল। মীর মহম্মদ প্রেমিক লোক। রূপসী রমণী দেখিলেই তিনি প্রেমে পড়িয়া যাইতেন। কারাগারে বিগত জীবনের প্রেমাস্পদাদের স্মৃতিচারণই তাঁহার অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় ছিল। যাহাদের তিনি ভোগ করিয়াছিলেন তাহাদের মুখ তাঁহার মনে তেমন একটা জাগিত না, কিন্তু যাহাদের তিনি ভোগ করিতে পারেন নাই, যাহারা আলেয়ার মতো তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া অন্ধকারে আবার মিলাইয়া গিয়াছে তাহাদের কথাই বারবার মনে পড়িত তাঁহার। বিশেষ করিয়া মনে পড়িত নাচওয়ালী ফৈজু বাঈয়ের মুখটা। তাহাকে মীর মহম্মদই আবিষ্কার করিয়াছিল দিল্লীতে। কিন্তু তাহাকে গ্রাস করিলেন সিরাজ। দুই লক্ষ টাকা দিয়া তাহাকে কিনিয়া লইলেন। কিন্তু অমন রূপসী বাঈজী কি রূপার শিকলে চিরকাল বাঁধা থাকিতে পারে? কিছুদিন পরেই সিরাজের এক আত্মীয়ের সহিতই ফৈজু ধরা পড়িল। সিরাজ তাহাকে যে শাস্তি দিলেন তাহা ভয়ানক। তিনি একটা শূন্য কক্ষে ফৈজুকে পুরিয়া তাহার জানালা দরজা বন্ধ করিয়া চারিদিক ইঁট আর পাথর দিয়া গাঁথিয়া দিলেন। ফৈজুর জীবন্ত সমাধি হইয়া গেল। ফৈজুর মুখখানা মীর মহম্মদের মনে বারবার ভাসিয়া উঠিত। আর ভাসিয়া উঠিত জগদ্ধাত্রীর মুখটা। সে তো মরে নাই—সে নিশ্চয়ই কোথাও বাঁচিয়া আছে। খোঁজ করিলেই আবার হয়তো তাহার নাগাল পাইতে পারিত। রামলোচনকে চাপ দিলেই কাজ হইত এবং সে চাপ তিনি মনসবদার সাহেবকে দিয়াই দেওয়াইতে পারিতেন। কিন্তু সিরাজের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া কারাগারে আসিতে হইল, সমস্ত বরবাদ হইয়া গেল। এখন চিন্তাতেই সুখ, সিরাজের কারাগার তাঁহার মনকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে বিধি প্রসন্ন হইলেন। নিরাশার অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর রেখা দেখা গেল। বন্দী হইয়া জন সাহেব রোমনী, শাওনী এবং ভিকিকে লইয়া ঠিক তাঁহার পাশের ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মেয়ে তিনটি কালো, কিন্তু যৌবনরসে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, হাসিখুশি। আনন্দের ফোয়ারা যেন তিনটি। শুধু মীর মহম্মদই নয়, স্বয়ং কারাধ্যক্ষ পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কারাধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত মীর মহম্মদের আলাপ ছিল। তিনি যদি ভীতু লোক না হইতেন তাহা হইলে মীর মহম্মদকে হয়তো ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার ভয় ছিল মীর মহম্মদকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহার চাকরি তো যাইবেই, গর্দানও যাইতে পারে। খামখেয়ালী সিরাজের অসাধ্য কাজ কিছু নাই। কিন্তু তিনি মীব মহম্মদকে একটি পরামর্শ দিলেন। মীবজাফবের পাষণ্ড পুত্র এবং সিরাজেব শত্রু মীরণের সহিত এককালে মীর মহম্মদের না কি পবিচয় ছিল। কারাধ্যক্ষ বলিলেন, এই পরিচয় সূত্র ধরিয়া আপনি মীবণকে অনুনয়-বিনয় করিয়া একটি পত্র লিখুন যাহাতে তিনি আপনার মুক্তিব ব্যবস্থা কবেন। মীবণ চেষ্টা করিলেই মীরজাফরকে দিয়া অনায়াসে আপনার খালাসের ব্যবস্থা করিতে পাবিবেন। তুকি খাঁ তখন বাধা দিতে পাবিবেন না। আপনি ফৌজে চাকুবি করিতেন, মীরজাফরই এখন সেনাপতি। তাঁহার হুকুম-নামা পাইলেই আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিব। সেকালে বিনা অর্থে কোন কিছু হইবার উপায় ছিল না। কারাধ্যক্ষ বলিলেন—আপনি এক হাজার এক আসবফি যোগাড় করুন। আমি আপনাব পত্রের সহিত মীবণ সাহেবকে ওই আসরফিগুলি পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা কবিব। মনে হয় ইহাতে কাজ হইবে। কিন্তু কাবাগারে বসিয়া এক হাজার এক আসবফি যোগাড় কবিতে তাঁহাব বিলম্ব হইয়া গেল। তিনি তাঁহার অন্দরমহলে খবর পাঠাইলেন। তাঁহার অনেকগুলি বিবি ছিল, তাঁহারাই নিজ নিজ 'জেবর' (গহনা) বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় কবিয়া অর্থটা সংগ্রহ কবিলেন। যে ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে অপহবণ কবিয়া তিনি হারেমে পুবিয়াছিলেন সে-ই না কি সর্বাপেক্ষা বেশী দিয়াছিল। তিনি তাহার নামে যে গল্পটা বানাইয়া ধূর্জটিমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন, তাহা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি পতিব্রতা রমণী, গুণ্ডা লাগাইয়া স্বামীকে খুন করিবেন ইহা তাঁহার কল্পনাতীত। গুপ্তঘাতকের ভয়ে নয়, অন্য কাবণে মীর মহম্মদ সিংভূমের জঙ্গলে ঢুকিয়াছিলেন। জন সাহেব তাঁহার সঙ্গিনী তিনজনকে লইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। আগেই বলিযাছি বোমনি, শাওনী ও তির্কি কারাধ্যক্ষ এবং মীর মহম্মদকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ইহাদেরই সহায়তায়

জন সাহেবের সহিত মীর মহম্মদের যোগাযোগ ঘটিল। অবশ্য বে-আইনী-ভাবে। যেখানে তিন তিনটি প্রস্ফুটিত-যৌবনা রমণী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সেখানে পুরুষ আইন রক্ষক কতক্ষণ আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন? পারিলেন না। জন সাহেবের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে সহসা জন সাহেবের নিকট মীর মহম্মদ জানিতে পারিলেন যে কমলপুরের রামলোচনের কন্যা 'জাগট্রিকে' তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। কথাটা বলিয়াই জন সাহেব বুঝিতে পারিলেন ভুল করিয়াছেন। মুসলমানদের ভয়েই সে জর্জেটি জাগ্‌ট্রিকে তাঁহার আশ্রয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সে খবরটা তিনি একজন মুসলমানকে বলিতে গেলেন কেন। খবরটা শুনিবামাত্র মীর মহম্মদ সাগ্রহে বলিলেন—"তাই না কি। রামলোচনের মেয়ে আপনার আশ্রয়ে আছে? রামলোচন যে আমার বন্ধু। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গেও আমার ভাব হয়েছিল। যদি ছাড়া পাই তার সঙ্গে দেখা করে আসব। কোন কোন পথ দিয়ে আপনার মুলুকে পৌছতে হয় তা আমাকে বলুন না।" জন সাহেব বলিলেন, "মুখে বললে আপনি ঠিক যেতে পারবেন না। আমার সঙ্গে যে মেয়েগুলি আছে তাদের সঙ্গে যদি যান তাহলে তারা দেখিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে। আর আমাকে যদি কয়েদ থেকে খালাস করতে পারেন তাহলে তো আমিই সব ব্যবস্থা করব।" মীর মহম্মদ বলিলেন—"বেশ বেশ, আমি সে চেষ্টা করব।" মীরণ সাহেবকে টাকা খাওয়াইয়া ফল হইয়াছিল। মীরজাফরের আদেশে মীর মহম্মদ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। জন সাহেব সাহেব বলিয়া মুক্তি পান নাই। মীর মহম্মদ মীরণকে কুর্নিশ করিয়া নিবেদন করিলেন—খোদাবন্দ অন্ততঃপক্ষে ওই তিনটি সিংভূমী আওরতকে যদি ছাড়িয়া দেন ভালো হয়। সিংভূম হইতে আপনার জন্য একটি খুপসুরৎ হিন্দু বিবি আনিয়া দিব মনস্থ করিয়াছি, সে বিবি যেখানে আছে তাহার ঠিকানা উহারা জানে। উহাদের ছাড়িয়া দিলে আমাকে উহারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে বলিয়াছে। বিবিটি অপরূপ, ফৈজু নাচওয়ালীর চেয়েও দেখিতে ভালো। পবিত্র হিন্দুবংশের মেয়ে বলিয়া তাহার একটা খুশবাই আছে। মীরণ পাষণ্ড ছিলেন, কিন্তু বেরসিক ছিলেন না। তিনি বুঝিলেন বেতমিজটা ওই মেয়ে তিনটির প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তাহাদেরও ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন তিনি। রোমনী

জন সাহেবকে ছাড়িয়া গেল না। পথপ্রদর্শক হইয়া শাওনী ও তির্কি মীর মহম্মদের সঙ্গী হইল। যাত্রা করিবার পূর্বে জন সাহেবের সঙ্গে শাওনী ও তির্কির গোপন পরামর্শ হইয়াছিল একটা। জন সাহেব তাহাদের একটি আঙটি দিয়া বিশেষ করিয়া দুইটি নাম মনে করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন ধুমশা আর টন্টা। দুইজনেই গভীর অরণ্যনিবাসী। মীর মহম্মদ শাওনী ও তির্কিকে লইয়া কিছুদূর অশ্বারোহণে গিয়াছিলেন। কিন্তু সিংভূমের জঙ্গল আরম্ভ হইতেই শাওনী এবং তির্কি বলিল—"আর ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া যাইবে না। এবার জঙ্গলের পথে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। এখন ঘোড়া তিনটিকে বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।" মীর মহম্মদ তাহাই করিলেন এবং তাহাদের সহিত হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করা তাঁহার তেমন অভ্যাস ছিল না। পাহাড়ে ওঠা-নামা বিস্তর, তাছাড়া জঙ্গলের পথও ক্রমশঃ দুর্গম হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু মীর মহম্মদের অন্তরে জগদ্ধাত্রীর মুখখানি ভাসিয়া উঠিতেছিল, যে বহ্নি এতদিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল তাহা ক্রমশঃ শিখাময়ী হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। পদব্রজেই তিনি পাহাড়ের চড়াই ওতরাই ভাঙিয়া প্রস্তরাকীর্ণ অরণ্যপথে ক্ষতবিক্ষত চরণ হইতে লাগিলেন। প্রেমের জন্য এতদপেক্ষা অনেক কষ্ট অনেকে ভোগ করিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্তু মীর মহম্মদকে যাহা দুর্নিবার টানে টানিতেছিল তাহা প্রেম নয় রিরংসা। কিন্তু তিনি সুখী মানুষ, ঘোড়ায় তাঞ্জামে চড়িয়া ভ্রমণ করাই তাঁহার অভ্যাস, তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছিল। মাঝে মাঝে তিনি পথে বসিয়া পড়িতেছিলেন। শাওনী আর তির্কির কিন্তু শ্রান্তি নাই। তাহারা বন্য হরিণীর মত ক্ষিপ্র চপল-গতিতে হাসিতে হাসিতে গান গাহিতে গাহিতে কিছুদূর আগাইয়া যাইতেছিল, মীর মহম্মদ বসিয়া পড়িলে আবার ফিরিয়া আসিতেছিল, ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর জঙ্গলে প্রবেশ করিতেছিল তাহারা। শেষে ঠিক হইয়াছিল একদিন বিশ্রাম করিয়া একদিন পথ চলিবেন মীর মহম্মদ। এ দুরূহ পথে একটানা হাঁটা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতেছিলেন তিনি।

এইরূপ একটি বিশ্রামস্থানে পর্বতগুহায় তাঁহার সহিত ধূর্জটিমঙ্গলের যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার বিবরণ পাঠক-পাঠিকা ইতিপূর্বেই পাঠ করিয়াছেন।

....বন ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। শাল, পিয়াল, শিশু, শিমুল, দেবদারু, শিরিষ—বহু রকম গাছ। মহুয়া গাছও প্রচুর। মাঝে মাঝে গাছগুলি এত ঘন এবং তাহাদের ঘিরিয়া বন্য লতাসমূহের এমন ঘনবিতান যে দিনের বেলাতেও পথ দেখা যায় না। একটা অস্পষ্ট সরু পায়ে চলার পথ আছে কিন্তু মীর মহম্মদ তাহা ঠিক মতো অনুসরণ করিতে পারিতেছিলেন না। মাঝে মাঝে বন্য জন্তুর চীৎকার শোনা যাইতেছিল, হরিণ খরগোশ তাহাদের সাড়া পাইয়া গহন বনে আত্মগোপন করিতেছিল, তীক্ষ্ণকণ্ঠ পক্ষীর চীৎকার বন্য স্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করিয়া আতঙ্কিত করিয়া তুলিতেছিল মীর মহম্মদকে। শাওনী ও তির্কি তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। সত্যই তিনি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশাল মহীরুহ পরিবৃত রৌদ্রকরশূন্য, লতাআচ্ছাদিত বনস্থলীকে বিরাট রহস্যময় একটা প্রেতপুরী বলিয়া মনে হইতেছিল। বড়ই আতঙ্কিত হইয়াছিলেন তিনি। যদিও খুব পরিশ্রান্ত, তবু এখানে বিশ্রাম করিবার সাহস হইতেছিল না তাঁহার। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। হঠাৎ শাওনী ও তির্কি তাঁহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে গিয়া আত্মগোপন করিল! ক্ষণপরেই তিনি দেখিলেন বিরাট একটা ভালুক হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

"আর চলতে পারছি না আমি খুসবু।"

"তাহলে ওই ছোট গাছটায় ওঠ। আমরাও আর একটা গাছে উঠি।"

"বড় ক্ষিধে পেয়েছে"

"কলা খাও।"

দুইজনেই কোঁচড়ে করিয়া অনেক পাকা কলা আনিয়াছিল। একটি ছোট গাছে মীর মহম্মদকে তাহারা উঠাইয়া দিল। পাশের গাছটিতে তাহারাও চড়িল।

এইভাবেই পথ চলিতে লাগিল তাহারা।

সাতদিন এইভাবে চলিবার পর সহসা তাহারা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া একটা খোলা-মেলা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জায়গাটা পর্বতের একটা সানুদেশ। ঠিক তাহার নীচেই প্রকাণ্ড একটা লম্বা গভীর

গর্ত, চওড়াও কম নয়। পাহাড়ী নদীর শুষ্ক াহার পর বলিল—"লাগরকে
দিয়া প্রবল বেগে জলধারা প্রবাহিত হয়। লাগরীর কাছে পাঠাতে
অনেকখানি জায়গা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
একটা বাড়িও রহিয়াছে। বাহিরে কয়েকটা হরি ন।

তিকি বলিল—"এবার আমরা এস্যা গিছি।"

শাওনী বলিল—"এ খাতটা কিন্তু পার হতে হবেক।" াছে।

খাদের দিকে চাহিয়া মীর মহম্মদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। বলিলেন—"ও খাত আমি পার হতে পারব না—"

"আচ্ছা আমরা লোক আনাচ্ছি তাহলে—"

তরতর করিয়া তাহারা দুইজন খাতের মধ্যে নামিয়া গেল। মীর মহম্মদ বসিয়া রহিলেন। দেখিলেন দূরে আরও গভীর জঙ্গল। বড় বড় গগনস্পর্শী গাছ ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে পাইলেন—ওই জঙ্গলের ধারে প্রকাণ্ড আর একটা ঘর রহিয়াছে। ঘরের দেওয়াল ছাদ সব বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়া তৈরী। প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু দেওয়াল। দেওয়াল বাহিয়া অনেক বন্য লতা উঠিয়াছে। মীর মহম্মদ ভাবিতে লাগিলেন—ইহাই কি জন সাহেবের আস্তানা? এইখানেই কি জগদ্ধাত্রী আছে? আকুল উৎসুক নয়নে তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

এ স্থানটা জন সাহেবেরই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে এই আস্তানার হর্তাকর্তাবিধাতা ধুম্‌সা এবং টণ্টা। তাহারা এইখানে বাস করিয়া বন্য পশুপক্ষী ধরে, কখনও তাহাদের মারিয়া চামড়া ছাড়াইয়া লয়, কখনও বা জীবন্ত অবস্থায় তাহাদের খাঁচায় পুরিয়া রাখে। উদ্দেশ্য—বিদেশে চালান দিয়া অর্থোপার্জন করা। ধুমসা এবং টণ্টা দুইজনেই ভীষণাকৃতি, দুইজনেই শালপ্রাংশুমহাভুজ ব্যূঢ়োরস্ক তালজঙ্ঘা গজস্কন্ধ দানব। দুইজনেরই মুখে প্রচুর শ্মশ্রুগুম্ফ মাথায় জটা, দুইজনেরই হাতে বড় বড় নখ, দুজনেরই চোখে তীক্ষ্ণ ধূর্ত দৃষ্টি, দুইজনেই বৃকোদর, দুইজনেরই সর্বাঙ্গে বহু ক্ষত চিহ্ন। টণ্টার নাকের খানিকটা নাই, বৃহৎ একটা ভালুকের সহিত মল্লযুদ্ধ করিবার সময় ভালুক নাকে থাবা মারিয়াছিল। ইহারা সাধারণতঃ ফাঁদ পাতিয়া বন্য পশুপক্ষী ধরে, প্রয়োজন হইলে সম্মুখ যুদ্ধেও পশ্চাৎপদ হয় না। ধুম্‌সা সম্মুখ যুদ্ধে গদাঘাতে যে বাইসনটাকে মারিয়াছিল তাহার

····বন ক্রমশঃ গভীর হবাখিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে সেটাকে নমস্কার শিশু, শিমুল, দেবদারু, শিরিছিলে তুমি। তোমাকে গড় করি। ইহাদের মাঝে মাঝে গাছগুলি এত ঘন।ষা। আদিবাসী বমণীর গর্ভে এবং বিদেশী ঘনবিতান যে দিনের বেলাতেই জন্ম। পূর্বে ইহারাও ডাকাতি করিত। পায়ে চলার পথ আর বাংলা ভাষা, উড়িয়া ভাষা, ইংরিজির বুকনি, ওলন্দাজ পারিতেছিলেন ভাষায় টুকরো সব মিলাইয়া ইহাদের ভাষা। ইহারা ডাকাত ছিলি। জন সাহেব ইহাদের চাকরি দিয়াছেন। ইহাদের সব ভার বহন করেন, সব আবদাব সহ্য করেন, এই অঞ্চলটায় মালিকই কবিয়া দিয়াছেন ইহাদের। ইহাবা কেবল তাঁহাকে পশু ধরিয়া দেয়, কিংবা পশু মারিয়া, পাখী মারিয়া তাহাদের চামড়া ছাড়াইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেয়। পশু এবং পক্ষীর চর্ম বিক্রয় জন সাহেবের লাভজনক ব্যবসায়। ধুম্‌সা এবং টণ্টা জন সাহেবকে দেবতার মতো ভক্তি করে। জন সাহেব শাওনীকে তাঁহার আঙটিটি খুলিয়া দিয়াছিলেন। এই আঙটিই তাঁহার ফরমান। এইরূপ আঙটি তাঁহার অনেক আছে। যখনই যেখানে দূত পাঠান এবং যেখানে দূতের হাতে চিঠি পাঠানো সম্ভব নয়, সেখানে তিনি এই আঙটি পাঠান। আঙটিতে বিশেষত্ব তেমন নাই। লোহাব আংটি, তাহার সহিত একটা লোহার মোহরও যুক্ত। মোহরের উপর একটি ক্রশ চিহ্ন। ক্রশেব লম্বা দাঁড়িটা ইংরেজি J অক্ষর। এই আংটি যে নীরব বার্তা বহন করে সে বার্তাটি এই—আংটির বাহক বা বাহিকা আমার বিশ্বাসভাজন। তুমিও ইহাকে বিশ্বাস করিও এবং এ যাহা বলে তদনুসারে কাজ করিও।

শাওনী বলিল—"খালের উ পারে লোকটি বসে আছে সে সাহেবের স্যাঙাতের পরিবারের সঙ্গে পীরিত করতে চায়। আমরা উয়াকে ভুলিয়ে এখানে লিয়ে এসেছি তুদের কাছে। তুরা উয়ার ব্যবস্থা কর।"

ধুম্‌সা গর্জন করিয়া উঠিল—"লিশ্চয় করব। ফট্।"

প্রতি কথার শেষে 'ফট্' উচ্চারণ করা ধুম্‌সার একটা মুদ্রাদোষ।

তিকি বলিল—"সায়েব বলেছে উয়াকে নিকাশ করে দাও একেবারে। আপদ চুকিয়ে দাও।"

টণ্টা বলিল—"তাই দেব। একটা আছাড় মারলেই দফা শেষ হয়ে যাবে বাছাধনের—"

ধুম্‌সা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল—"লাগরকে আছাড় মারবি কি রে? ফট্‌। লাগরকে লাগরীর কাছে পাঠাতে হবেক। ফট্‌।"

তির্কি শাওনী দুইজনেই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

"এখানে লাগরী কোথা পাবি তুরা?"

"কাল একটা বাঘিনী ধরেছি। ওই ঘরটায় আটকানো আছে। তারই মুখে ফেলে দিব উকে। ফট্‌।

মীর মহম্মদ দূর হইতে কাঠের গুঁড়িনির্মিত যে ঘরটা দেখিতে পাইয়াছিলেন ধুম্‌সা হাত তুলিয়া সেই ঘরটা দেখাইল তির্কিকে।

"উটাকে এখানে আনা করা তাহলে। উ বলছে খাল পেরাতে লারবেক।"

"এখনি আনা করাচ্ছি। ফট্‌। তালতা, ও তালতা—শুনে যা—"

ঘরের পিছন হইতে দীর্ঘ বলিষ্ঠ এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল।

"তাল্‌তা তুই মুর্গাকে নিয়ে খালের ওপারে যা। ফট্‌। সেখানে একটা লোক আছে। তাকে বেঁধে টানতে টানতে লিয়ে আয় এখানে। ফট্‌। মজবুত কাতা দড়ি নিয়ে যা—"

তালতা ও মুর্গা চলিয়া গেল।

শাওনী বলিল—"সাহেব কয়েদ হয়ে আছে মুক্‌সুদাবাদে। আমরা সেখানেই ফিরে যাই এবার। সাহেবকে কয়েদ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবেক। চল রে তির্কি—"

"আজ আর গিয়ে কাজ নাই। ফট্‌। কাল যাবি—"

ধুম্‌সা হঠাৎ শাওনীকে দুই হাত দিয়া শূন্যে তুলিয়া ধরিল। শাওনী খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "নামায়ে দাও, নামায়ে দাও, এসব কি কাণ্ড তোমার!"

"আচ্ছা তাহলে আমার কাঁধের উপর বস্‌। তোকে কাঁধে করে' নাচি একটু। ফট্‌। বেশ ডাগর মেয়ে বটিস তুই। ফট্‌—"

ধুম্‌সা শাওনীকে কাঁধে করিয়া নাচিতে লাগিল।

টণ্টা তির্কিকে ধরিতে গেল। তির্কি ধরা দিল না, ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু টণ্টার সহিত পারা শক্ত। অবশেষে সেও ধরা পড়িয়া গেল।

তালুতা আর মুর্গা খাল পার হইয়া দেখিল কেহ নাই। মীর মহম্মদ অন্তর্ধান করিয়াছেন।

শাওনী ও তির্কি চলিয়া যাইবার পর মীর মহম্মদের অন্তর্যামীই সম্ভবতঃ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন গতিক সুবিধাব নহে, অবিলম্বে সরিয়া পড়। এরকম নির্জন গভীর অরণ্যে রামলোচনের কন্যা বাস করিতেছেন একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তাহার পর তিনি এপারে বসিয়াই ধুম্‌সা ও টণ্টাকে দেখিতে পাইলেন। মানুষ নয় যেন পাহাড়। তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না। পুনরায় অরণ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রান্ত ছিলেন বলিয়া ছুটিতে পারিলেন না, কিন্তু যতটা সম্ভব দ্রুতবেগেই গেলেন তিনি। তালুতা ও মুর্গা আসিবার পূর্বেই তিনি অরণ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। জগদ্ধাত্রীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার মনে যে লালসা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, এই দুর্গম পথে চলিতে চলিতে তাহাও যেন অনেকটা নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে একটি রমণীর জন্য এতটা পরিশ্রম করা পণ্ডশ্রম মাত্র। শেষ পর্যন্ত তাহাকে পাইবেন কিনা তাহারও স্থিরতা নাই। তাছাড়া ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিবার পর হইতে তাঁহার মনে আব একটা কাণ্ড ঘটিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন যে লোকটা এত ভদ্র, যে লোকটা এত ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী, যাহার সঙ্গে অশ্বারোহী সেনাদল রক্ষীস্বরূপ মোতায়েন থাকে—সেরূপ লোকের সহিত শত্রুতা করিয়া লাভ কি। বন্ধুত্ব করিলেই বরং লাভ বেশী। যিনি অযাচিতভাবে তাঁহাকে পঞ্চাশ আসরফি দিয়া যাইতে পারেন তিনি শুধু ধনী নন, উদারও। ইহাব পত্নীকে নষ্ট করিবাব চেষ্টা খুবই অন্যায়। ইহার শত্রুতা কাম্য নয়, বন্ধুত্বই কাম্য। এসব কথা তাঁহার আগে হইতেই মনে হইতেছিল। এখানে আসিয়া এবং ওই দুটি মনুষ্যপর্বতকে দেখিয়া তিনি স্থির করিয়া ফেলিলেন পলাইতে হইবে। মুর্শিদাবাদেই ফিরিতে হইবে আবার। সম্ভব হইলে ধূর্জটিমঙ্গলকে আবাব খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইবে।

৮

ধূর্জটিমঙ্গল নির্বিঘ্নেই মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলেন। দেখিলেন মুর্শিদাবাদের সকলেই বেশ চঞ্চল। কিছুদিন আগেই ইংরেজরা না কি হুগলি আক্রমণ করিয়া শহরটিকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। অনেক বাড়ি পুড়িয়াছে, অনেক প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস হইয়াছে, বহুলোকের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, বণিকবেশী ইংরেজ দস্যুরা হুগলিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। নররূপী পশু গোরাদের হস্তে পুরস্ত্রীরাও লাঞ্ছিত হইয়াছেন। আপামরভদ্র সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকে মুর্শিদাবাদে পলাইয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা তাহা পারেন নাই তাঁহারা অনেকে হুগলি ছাড়িয়া দুর্গম পল্লীগ্রামে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। ধূর্জটিমঙ্গলের পিতৃবন্ধু পাণ্ডবপ্রধান খাঁন মহাশয়ের মুর্শিদাবাদে বাড়ি ছিল তিনি যদিও ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত কিন্তু আলীবর্দী খাঁর অনুগ্রহভাজন ছিলেন বলিয়া খাঁন উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন! ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদে আসিলে তাঁহার বাড়িতে ওঠেন। এবারও উঠিয়াছেন। খাঁন মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। বয়স সত্তর পার হইয়াছে। মাথায় একমাথা পাকা বাবরি চুল। শৌখিন গোঁফ দাড়িও পাকা। এ বয়সে লোকে সাধারণতঃ ধর্ম চর্চা করেন, কিন্তু খাঁন মহাশয়ের ধর্মে মতি নাই, মতি রাজনীতিতে। তিনি ধূর্জটিমঙ্গলকে বলিলেন, "দেখ ধূর্জু, তুমি এসময় এসেছ, বড় ভাল হয়েছে। আমি অকূলপাথারে পড়ে' গেছি: মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছা হয় এ দেশ ত্যাগ করে জঙ্গলমহলে চলে যাই। এখানে ভদ্রলোকেরা আর ভদ্রস্থ নেই। তুমি শুনলাম সিংভূমে পরিবারকে নিয়ে গেছ, "খুব উত্তম কাছ করেছ। আমাকেও নিয়ে চল সেখানে। যাবে?"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"যাব। কিন্তু আপনি কি সেই জংলী দেশে থাকতে পারবেন?"

"পারা উচিত। কিন্তু পারব না। মুশকিল হয়েছে কি জান? ঘুগনি খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে, সেখানে ঘুগনি তো পাওয়া যাবে না।"

"ঘুগনি? তা যাবে না কেন?"

"আই দেখ, তুমি কি বুঝতে কি বুঝলে। ছোলার ঘুগনি নয়, খবরের ঘুগনি। নবাব পক্ষের খবব, নবাবের আমীরওমরাহদের খবর, ইংরেজদের খবর, ফবাসীদের খবব, এইসব পাঁচবকম খবব মিলিয়ে যে ঘুগনি-খবব তৈরী হয় তা তো জংলী দেশে পাওয়া যাবে না। ওই ঘুগনি খাওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আমি আপিং খাই। কিন্তু ওই খবরেব ঘুগনি না হলে আপিঙের মৌতাতও জমে না। কি কবি বল তো। অথচ এদিকে ভয়ে প্রাণ ধুকপুক করছে কখন কি হয়!"

"আপনাব ছেলেবা কোথায়?"

"তাদের কেউ নবাব পক্ষে, কেউ ইংবেজ ওয়াটসেব মোকামে, কেউ মীরজাফবেব মোসাহেবদেব দলে, মোহনলালেব বাড়িতেও যাতায়াত কবছে একজন। ওরাই ঘুগনিব মালমসলা যোগাড় করে আনে। ঘুগনি মজাদাব, কিন্তু ধুকপুকুনি যায় না। ছিলাম পাণ্ডব দেবশর্মা, হয়েছি পাণ্ডব খাঁ। অদৃষ্টে আরও কি আছে জানি না!"

ধূর্জটিমঙ্গল সসম্ভ্রমে বলিলেন—"ভয় কববেন না। আমি আপনার বক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কবব। আমাব সঙ্গে কিছু সিপাহী সান্ত্রী আছে। তারা—"

"আই দেখ, তুমি কি বুঝতে কি বুঝলে। সিপাই সান্ত্রী আমারও আছে। কিন্তু আপৎকালে কেউ থাকবে না, সবাই চোঁ চোঁ দৌড় দেবে। আমিও যাতে দৌড় দিতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করে' রাখতে হবে। আমার ঘোড়াটা মারা গেছে, খুব ভালো ঘোড়া ছিল, একটানা বিশক্রোশ ছুটতে পাবত। আমার ছেলেদেব বারবার বলছি, আমাকে একটা ভালো ঘোড়া কিনে দাও, বেগতিক দেখলে তার পিঠে চড়ে' চম্পট দেব। কিন্তু ওরা গড়িমসি কবছে, কিনে দিচ্ছে না। ভাল ঘোড়া পাওয়াও শক্ত, এ অঞ্চলে কাছাকাছি যত ভাল ঘোড়া ছিল নবাবের ফৌজ নিয়ে নিয়েছে সব—"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি আজই একটা ভালো ঘোড়া আপনাকে দেব। আমার সঙ্গে খুব ভালো একটা ঘোড়া আছে—"

"তোমার কথা শুনে ভরসা পেলাম বাবা। মহেশেব ছেলে তুমি, তুমি তো একথা বলবেই। মহেশ দিকপাল ছিল একটা।"

পাণ্ডব খাঁ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। মহেশমঙ্গলের স্মৃতিই

বোধহয় তাঁহাকে নির্বাক করিয়া রাখিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তাহাব পর তিনি প্রশ্ন করিলেন—"এই হট্টগোলের সময় তুমি এসে পড়লে কেন ?"

"আমি একটু বিশেষ বৈষয়িক কাজে এসেছি—"

"কলকাতায় তোমাদের সম্পত্তি ছিল। কলকাতা তো পুড়ে গেছে শুনেছি। তোমাদের বাড়িও পুড়েছে নিশ্চয় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"নবাব সাহেব শুনছি ইংবেজদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন একটা। তাতে একটা শর্ত না কি আছে যে তাঁব সৈন্যরা যে সব বাড়িঘর কলকাতায় পুড়িয়েছে তার খেসাবত দেবেন তিনি। খাজাঞ্চি বিভাগের আলাউদ্দিন মিঞাকে একটু তোযাজ কব গিয়ে। মবলগ কিছু পেয়ে যাবে। তোয়াজ মানে বুঝেচ তো ? এই—"

তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে তিনি টাকা বাজাইবার মুদ্রাটি প্রদর্শন করিলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলিলেন না।

বলিলেন—"আমি একটু বেরুচ্ছি। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব।"

"খাওয়াদাওয়া করেছ তো ?"

"করেছি। মা আমাকে অনেক খাইয়ে দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ। বুড়ীর তো আর কোন কাজ নেই। লোক পেলেই ধরে' ধরে' খাইয়ে দেয়।"

"আমি চললাম তাহলে—"

যাইবার পূর্বে ধূর্জটিমঙ্গল হেঁট হইয়া প্রণাম কবিলেন তাঁহাকে।

"জয়োস্তু। তুমি আলাউদ্দিনকে আমার নাম করে' বোলো তাহলে ঠিক ব্যবস্থা করে' দেবে। আমার সঙ্গে খাতির আছে ওর।"

ধূর্জটিমঙ্গল আলাউদ্দিনের কাছে গেলেন না, গেলেন মৈনি বিবির কাছে। আসিয়াই তাহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন তিনি। চিঠিগুলিও দিয়া আসিয়াছিলেন। মৈনির আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও কিন্তু তাহার বাড়িতে তিনি থাকিতে সম্মত হন নাই। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল মৈনি। বলিয়াছিল—"এ বাড়ি তো আপনার। আপনি কিন্তু একদিনও এখানে থাকেননি।"

মৃদু হাসিয়া ধূর্জটিমঙ্গল উত্তর দিয়াছিলেন—"তুমি তো আছ। ওসব কথা থাক, আমার কাজের কতদূর কি হল?"

"চিঠি সব ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। কি আছে চিঠিতে?"

"তা বলব না, সেটা গোপনীয়। একটা কথা বল তো—তুমি তো সব জায়গায় ঘোর, হালচাল কি রকম বুঝছ? নবাবের আশপাশে যারা আছেন তাঁদের ভাবগতিক কি রকম?"

মৈনি জবাব না দিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"যদি বলি ওসব খবরও গোপনীয়, আমিও বলব না?"

"বেশ, তাহলে চললাম। বিভীষণ 'সিন্দুকীর কাছে গেলেই সব খবর পাব।'

মৈনি বিভীষণ সিন্দুকীর নাম শুনিয়া ভয় পাইয়া গেল। সেকালে এদেশে 'সিন্দুকী' বলিয়া এক প্রকার জীব ছিল। তাহারা নবাব এবং নবাবের সহচরদের খবর সরবরাহ করিত কোন বাড়িতে সুন্দরী নারী আছে, কোন বাড়িতে স্বর্ণপ্রতিমা বা রৌপ্যপ্রতিমা প্রস্তুত হয়। খবর পাইলেই নবাবরা সেগুলি আত্মসাৎ করিতেন। আজকালকার চলিত বাংলায় যাহাদের আমরা 'টিকটিকি' বলি, ইংরেজিতে যাহাদের বলি 'স্পাই' সেকালে সিন্দুকীরা ছিল তাহাদেরই সমগোত্র।

"না, না, আপনি বিভীষণের কাছে যাবেন না। সে জাতে চণ্ডাল, স্বভাবেও চণ্ডাল। টাকা পেলে সে আপনাকে হয়তো কিছু খবর দেবে, কিন্তু আপনি যে এসব খবর সংগ্রহ করছেন এ সংবাদটিও নবাব সরকারে বিক্রয় করবে। তখন বিপদে পড়ে যাবেন। কারণ এসব খবর চালাচালি করা আজকাল বিপজ্জনক।"

"কিন্তু খবরগুলো আমার চাই।"

"আমি তাহলে ইঙ্গিতে বলে দিচ্ছি। আসুন আমার সঙ্গে।"

মৈনির সঙ্গে ধূর্জটিমঙ্গল পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে মৈনির সবরকম বাদ্যযন্ত্র সাজানো ছিল।

"বসুন।"

ধূর্জটিমঙ্গল একটি আসনে উপবেশন করিলেন।

তখন মৈনি বীণাটা তুলিয়া একবার ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজাইয়া দিল

পরমুহূর্তেই ডুগিতবলায় চাপড় দিয়া বিকট আওয়াজ করিল একটা। সারেঙ্গীতেও অনুরূপ বেসুরা শব্দ বাহির করিল একটা এবং খচমচ করিয়া বাজাইয়া দিল খঞ্জনিটা। তাহার পর কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল সে।

"এর মানে কিছু বুঝলেন ?"

"বুঝলাম সব বেসুরো। একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই।"

"এইটেই তো আপনি জানতে চাইছিলেন ?"

তাহার চোখের তারা দুইটি তখন হাসিতে লাগিল। মৈনির এই একটি বৈশিষ্ট্য, মুখে যখন হাসির লেশমাত্র নাই' চোখ দুইটি তখন হাসিতে থাকে। মৈনির রং কালো, মুখে বসন্তের দাগ, পরিপূর্ণ যৌবনের প্রাবল্য তাহার অঙ্গে প্রকটিত নয়, মৈনি রোগা। কিন্তু তবু তাহাকে ঘিরিয়া এমন একটা কি যেন আছে যে তাহাকে দেখিলেই ভালো লাগে। তাহার এ রূপ দৈহিক মাংসল রূপ নয়, ইহা তাহার মানসিক উৎকর্ষের সূক্ষ্ম প্রকাশ। হীরক হইতে যেমন আলোক বিচ্ছুরিত হয়, মৈনির মনের লুকানো হীরকটিও তেমনি অপরূপ প্রভায় তাহাকে সর্বদা ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তাহা স্পর্শ করা যায় না, অনুভব করা যায়।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি আরও বিশদ ক'রে জানতে চাই।"

"বিশদ করে' বলার একটু বিপদ আছে। প্রকাশ পেলে গর্দানা যেতে পারে।"

"প্রকাশ পাবে কেন ?"

"পাবে না ? বেশ বলছি। থামুন আগে দেখে আসি, কাছে-পিঠে কেউ আছে কি না। সিঁড়ির দরজাটায় খিল দিয়ে আসি।"

মৈনি বাহিরে গেল। ধূর্জটিমঙ্গল খিল বন্ধ করার শব্দ পাইলেন। একটু পরে সে ফিরিয়া আসিল, তাহার পর আবার কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। —"একটি শর্তে বলতে পারি—আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন তাহলেই বলব—"

"অপরাধ করেছি। আপনি যে আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারেন একথা একবারের জন্যও আমার মনে হয়েছিল।"

"কিন্তু আমি শাস্তি দেবার কে। শাস্তি দেন কাজি সাহেব। আমি তো কাজি নই।"

"আপনি আমার মালিক।"

"আমি তোমার মালিক নই, তোমার বন্ধু।"

মৈনি হঠাৎ আবদারমাখা সুরে বলিল, "না আপনাকে শাস্তি দিতে হবে।"

ধূর্জটিমঙ্গলেব গম্ভীর মুখমণ্ডলে একটা চাপা হাসি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নীরবে তিনি তাঁহার গুম্ফপ্রান্তে তা দিতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন, "বেশ শাস্তি দেব। কিন্তু আগে নয়, পরে। যা জান আগে সব বল—"

মৈনি বিবির চোখ দুইটি হাসিতে লাগিল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন, "চেয়ে আছ কেন? বল—"

মৈনি বিবি তবু হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল।

"কি দেখছ?"

"দেখছি নির্বিকার মহাদেবকে।"

"তোমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চেগেছে দেখছি। আমি উঠলাম—"

"না, না বসুন বসুন, বলছি। একটা জিনিস মাথায় ঢুকছে না, সামান্য একটা নবাবকে নিয়ে মহাদেব মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?"

"কেন তা তিনি বলবেন না। তবে এটা জেনে রেখ তাঁর ভাবনার জালে তোমাকেও জড়াতে চান তিনি। তোমার যদি আপত্তি থাকে উঠছি আমি—"

"না, না বসুন—',

তাহার পর হঠাৎ সে গান গাহিয়া উঠিল

> দিলো মে পাওনিয়া আ গয়ী
>
> কৈসে দেখুঁ, কৈসে চলুঁ
>
> মন মে বরখা ছা গয়ী
>
> মন কা বাতেঁ কৈসে বোলুঁ

তাহার পর হঠাৎ গান থামাইয়া বলিল—"এইবার বলছি শুনুন। প্রথমেই বলছি ওরা পাপ, ওদেব সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। কিন্তু আপনি তো আমার কথা শুনবেন না, কোনদিনই আমার কোনও মানা আপনি শোনেন নি, কোনও অনুরোধও রাখেন নি, জানি এটাও রাখবেন না। শুনুন তবে।

সমস্ত বাংলাদেশে নবাব সিরাজের একটি মাত্র হিতৈষী বন্ধু আছে, তার নাম বেগম লুৎফুন্নিসা বাকী সবাই তার শত্রু। মীবজাফর নিজে বাংলার মসনদে বসতে চান, তিনি বুঝেছেন ইংরেজদের যদি তোয়াজ করা যায় তাহলে ইংরেজরা হয়তো তাঁকে সিংহাসনে চড়িয়ে দেবেন। জগৎ শেঠকে সিরাজ অপমান করেছিলেন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন সিবাজকে যেন-তেন-প্রকারেণ সিংহাসন থেকে সরাবেন। তাঁর আশা ছিল ঘসেটি বেগমেব স্বামী নওয়াজেস বা পূর্ণিয়াব শওকৎজঙ্গ এসে সিংহাসন দখল কববেন, তাঁদেব তিনি গোপনে সাহায্যও করেছিলেন কিন্তু তা হল না, তাই তিনি এখন ইংরেজদের সহায় হয়েছেন। রাজা রাজবল্লভ ঘসেটি বেগমের লোক। ঘসেটি বেগম আব সিরাজের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। তিনি প্রথমে সিবাজেবই ছোট্টভাই আক্রামউদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ তিনি নিঃসন্তান। আক্রমকে পুষ্যি নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আক্রাম বসন্ত-রোগে মারা গেল। তাবপর তিনি চেষ্টা করলেন তাঁর আব এক বোনের ছেলে পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎজঙ্গকে সিংহাসনে বসাতে। মনিহারির বলদিয়াবাড়িতে শওকৎজঙ্গের সঙ্গে সিরাজের যুদ্ধ হল। শওকৎজঙ্গ মারা গেলেন। স্বামীর মৃত্যুর পব ঘসেটি বেগম ঢাকা থেকে চলে' এসে মুর্শিদাবাদে মতিঝিলে বাস করতে লাগলেন। ধনবত্নপূর্ণ মতিঝিলের মতো এমন চমৎকাব প্রাসাদ মুর্শিদাবাদে খুব বেশী নেই। আপনি দেখেছেন মতিঝিল? আমি একবার গান গাইতে গিয়েছিলাম সেখানে। মনে হচ্ছিল স্বর্ণপুরীতে বসে' আছি। সেই মতিঝিল সিরাজ লুঠ করেছেন এবং ঘসেটি বেগমকে বন্দী ক'রে রেখেছেন নিজের অন্তঃপুরে। রাজা রাজবল্লভ ছিলেন ঘসেটি বেগমের দেওয়ান। তিনি নিজের যা কিছু টাকাকড়ি ধনবত্ন গয়নাগাঁটি ছিল সব ছেলের মারফত পাচাব করে' দিয়েছেন কলকাতায় ইংরেজদেব কাছে। তাঁর ছেলে কৃষ্ণদাস ইংরেজদের আশ্রয়ে এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন। এখন শুনছি রাজবল্লভের সঙ্গে নবাবের মিটমাট হয়ে গেছে। সিরাজ না কি বাজবল্লভকে অভয় দিয়েছেন। কিন্তু বাজবল্লভ বদ্যিব ছেলে, খুব চতুর, খুব ধূর্ত। তিনি বাইরে বাইরে নবাবের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের ভাব রাখছেন, কিন্তু মনে মনে তিনি সিরাজের ঘোর শত্রু। ভিতরে ভিতরে তিনি ইংরেজের পক্ষে। দুর্লভরামও সিরাজের উপর চটা। সিরাজ মসনদে

উঠেই যে ধবাকে সরা জ্ঞান করেছিল। মানী লোককে অপমান করে', উঁচু রাজকর্মচারীদের মাথাব উপরে নীচু কর্মচারীদের বসিয়ে, উচ্ছৃঙ্খল মোসায়েব আব গুণ্ডার দল দিয়ে সিরাজের রাজত্ব চলছে। ফৈজু বিবিকে জীয়ন্তে গোব দিয়ে দিলে। দানেশ ফকিবের নাক কেটে দিলে। রানী ভবানীর বিধবা মেয়ে তারাব প্রতি কুনজর দিলে। কেউ ওর উপর সন্তুষ্ট নয়।"

"উমির্চাদ ?"

"উমির্চাদ একটা বেহায়া আত্মসম্মানহীন লোক। ইংরেজরা ওকে ধরে' কয়েদ কবেছিল, ইংরেজের গোরা সৈন্যরা ওর অন্দর-মহলে ঢুকে মেয়েদেব বেইজ্জত কবতে গিয়েছিল। ওদের জমাদাব জগন্নাথ নাকি চিতা জ্বেলে মেয়েদেব খুন' কবে ফেলে দিয়েছিল চিতায়, এই খবব না কি বটেছে। জগন্নাথ কিন্তু কিছু বলে না।"

"জগন্নাথকে তুমি চেন না কি ?"

"চিনি। উমির্চাদের বাড়িতে একবার মুজরা করতে গিয়েছিলাম, জগন্নাথই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়। কি চমৎকার বজরা যে এনেছিল আমার জন্যে। সেখানে লাখপতিয়া বলে' একটি সুন্দরী মেয়েব সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কিন্তু এখন তারা কেউ নাকি বেঁচে নেই। এত কাণ্ডের পরও ওই উমির্চাদ না কি ইংরেজদের দলে যোগ দিয়ে ক্লাইভ আব ওয়াটসনকে সেলাম করছে।"

"জগন্নাথ কোথায় এখন ?"

"মুর্শিদাবাদেই আছে। সে উমির্চাদের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এখানে তার এক ভাইপো নবাবের ফৌজে কাজ করে। সেইখানেই সে থাকে, কোথাও কাজ কবে না। কি রকম যেন পাগলাটে গোছের হয়ে গেছে। আসে আমার কাছে মাঝে মাঝে। আমাকে এসে বলে রাম নাম শুনা বেটি। ঠুমক চলত রামচন্দ্র বাজতো পাঁয়জানিয়া—এই ভজনটা ওব ভারী প্রিয়।"

"আমিও ওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

"বেশ তো। ওকে খবর পাঠাব। আমি যতটুকু জানি সব বললাম, আর কিছু জানতে চান ?"

"তুমি আসফ আলী আর উজির আহমদকে চেন?"

"আসফ আলী ফৌজে বড় কাজ করেন। একদিন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমার এখানে গান শুনতে এসেছিলেন। উজির আহমদকে চিনি না।"

"আচ্ছা, আমি এবার উঠি!"

"সে কি এখনই? কিছু খাবেন না?"

"এখনও ক্ষিধে পায় নি। আচ্ছা, এক গ্লাস নিরামিষ শরবত আনো।"

নিরামিষ মানে?"

"মদটদ মিশিয়ো না। অনেক জায়গায় ঘুবতে হবে আমাকে—সরফুদ্দিন কেমন আছে জান?"

"কেরামতের ছেলে সরফুদ্দিন? সে তো প্রায়ই আমার কাছে আসে। চমৎকার বাজনা শিখেছে। সেদিন এখানে দিলরুবা এমন বাজালে যে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কত বয়স হবে? পনেরো ষোলো, কিন্তু এই বয়সেই চমৎকার শিখেছে। দেখতেও অতি চমৎকার। যেন রাজপুত্র। কিন্তু শুনছি এই বয়সেই ও বদ সঙ্গে মিশছে। ওর বাবা কোথায় কখন থাকেন তাতো কেউ জানে না—অমন ছেলে বখে' না যায়।"

"আমি যাব ওর কাছে। তুমি শরবতটা তাড়াতাড়ি নিয়ে এস—"

"শরবত খেয়েই কিন্তু আপনার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"আপনি বলেছেন সব শোনবার পর আমাকে শাস্তি দেবেন। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন—"

"ও হ্যাঁ। আচ্ছা ভাবি দাঁড়াও কি শাস্তি দেব। তুমি শরবতটা আন।"

মৈনি শরবত আনিতে গেল।

একটু পরেই সে স্ফটিকের গ্লাসে শরবত, আর সোনার রেকাবীতে এক গোছা আঙুর লইয়া আসিল।

ধূর্জটিমঙ্গল গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বড়লোক হয়েছ দেখছি।"

মৈনি বিবির চোখ দুইটি হাসিতে লাগিল। ধূর্জটিমঙ্গল একটি একটি আঙুর মুখে দিতে দিতে বলিলেন—"তোমার শাস্তি ঠিক করেছি। একটা দরবারি কানাড়ার আলাপ শোনাও আমাকে সেতারে।"

"কিন্তু এটা কি দরবারি কানাড়া বাজাবার সময়?"

"সেইটিই তো তোমার শাস্তি। অসময়ে দরবারি কানাড়া বাজাতে হবে।"

মৈনি মুচকি হাসিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত তাহার পর বলিল—"বেশ। কিন্তু দরবারি কানাড়া বাজাবার আগে আমাকে দববাব সাজাবার অনুমতি দিন—"

"এখানে দরবার সাজাবে কি করে ?"

"দেখুন না ; এখানে নবাবের দরবার হবে না, আপনার দরবার হবে।"

মৈনি আবাব উঠিয়া চলিযা গেল। একটু পবে সে ফিরিল একটি দামী সোনার বুটি দেওয়া লাল বঙের জমকালো বেনারসী শাড়ি লইয়া। ঘরেব এক কোণে একটা উঁচু কেদারা ছিল। তাহার উপব সে শাড়িটি নিপুন করিয়া পাতিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দুইটি দাসী একটি পারস্যেব গালিচা বহিয়া আনিল এবং সেটিও কেদারার সামনে পাতিয়া দিল।

ধূর্জটিমঙ্গল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপাব কি ?"

"আপনি ওই উঁচু আসনটায় গিয়ে বসুন। আমি গালচেব ওপর বসে' বাজাব। একটু অপেক্ষা করুন ফুল আনতে পাঠিয়েছি।"

তাহার পর সে আবার বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিল একটি চমৎকার মুর্শিদাবাদী গরদেব শাড়ি পরিয়া। হাতে গোলাপপাশ আতরদান। ধূর্জটিমঙ্গলকে তুলা করিয়া আতর দিল, গোলাপপাশ ঝাড়িয়া গোলাপজল ছিটাইল চতুর্দিকে। গন্ধে ঘব আমোদিত হইয়া গেল।

"তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ মৈনি। আমি উঠি, আমার কাজ আছে—"

"আমারও কাজ আছে। লুৎফা বেগমেব মহল থেকে আমার ডাক এসেছে। তিনি নাকি দিনরাত কাঁদছেন। গান-বাজনা দিয়ে তাঁকে ভোলাতে হবে।"

"তাহলে এসব কাণ্ড করছ কেন ? সেইখানেই যাও তুমি, আমিও উঠি। বাজনা আর একদিন শুনব—"

"না, লক্ষ্মীটি একটু বসুন। আপনি একবাব চলে' গেলে যে আসবেন না তা আমি জানি। কত দিন পরে এলেন বলুন তো—"

মৈনি বিবির কণ্ঠস্বরে বেদনার একটু আভাস পাওয়া গেল। মুখে কিন্তু হাসি। মৈনি আবার বাহিরে চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল নীরবে আঙুরগুলি শেষ করিয়া বেদানার রসাপ্লুত বাদামের

সুগন্ধি শরবত পান করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মের দুইটি প্রকাণ্ড তোড়া লইযা মৈনি প্রবেশ করিল। তাহার সহিত সোনা-রূপার উপর মীনার কারুকার্যখচিত দুইটি ফুলদানী লইয়া প্রবেশ করিল দুইজন দাসী। ফুলদানীতে পদ্ম সাজাইয়া কেদারার দুই পার্শ্বে তাহা রাখিয়া মৈনি বলিল—"এইবার আপনি ওখানে বসুন।"

দাসীরা চলিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল তবু ওঠেন না।

"বসুন, দেরী করছেন কেন—"

"আমাকে কি মনে কর তুমি মৈনি? আমি কি তোমার হাতের পুতুল? যেখানে বসাবে, সেইখানেই বসব?"

"না আপনি আমার রাজা। আপনার উপযুক্ত এ দরবার নয়। কিন্তু আপনি দরবারি কানাড়া শুনতে চেয়েছেন তাই যা হোক তা হোক করে' একটা দরবার খাড়া করেছি। আপনি বসবেন না? আমি আপনার কাছে কি দোষ করেছি যে আপনি আমাকে এত বড় অপমান করবেন?"

ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন যে চোখ দুটি একটু আগে হাসিতে ঝলমল করিতেছিল তাহাতেই এখন অশ্রু টলমল করিতেছে।

তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, উচ্চাসনে উঠিয়া বসিলেন।

মৈনির মুখে আবার হাসি ফুটিল। সে সেতার আনিয়া গালিচার উপর বসিল। হাসিমুখে নীরবে সেতারের সুর বাঁধিতে লাগিল। একটু পরেই সুরু হইয়া গেল দরবাড়ি কানাড়া। ধূর্জটিমঙ্গল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কখন যে তাঁহার চক্ষু দুইটি মুদিত হইয়াছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, কতটা সময় যে কাটিয়া গিয়াছে তাহাও তাঁহার খেয়াল ছিল না। সেতার থামিতে তিনি চোখ খুলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি দাসী আসিয়া খবর দিল, "মহম্মদী বেগ্ আপনার জন্য বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।"

"তাকে ডেকে নিয়ে এস।"

একটি বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তি প্রবেশ করিল। মৈনি বিবিকে সেলাম করিয়া উর্দুতে যাহা বলিল তাহার বাংলা মর্ম এই—আমি লুৎফা বেগমের রঙমহল হইতে আপনাকে লইতে আসিয়াছি। অনেকক্ষণ হইতে আপনার 'এনতেজার করিতেছি। আপনি আপনার তশ্‌রিফ লইয়া কখন যাইবেন?

মৈনি উত্তর দিলে—"একটু পরেই যাচ্ছি। আপনার অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

মহম্মদী বেগ তবু দাঁড়াইয়া রহিল।

বলিল, "বঙমহলের পালকি এসেছে। সেটা তাহলে অপেক্ষা করুক।"

মৈনি ধূর্জটিমঙ্গলেব দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি এখন কি কববেন?"

"আমি সরফুব কাছে যাব। তাবপব উজিব আহমদের খোঁজ করব। কেউ যদি তাব সন্ধান দিতে পাবে ইনাম দেব তাকে।"

তসলিম করিয়া মহম্মদী বেগ বলিল—"আমি পাবি হুজুব—"

"ও তুমি পাব, ভালই হ'ল। তুমি আমাব বাসায় আসতে পারবে?"

"হুজুবেব দৌলতখানা কোথায়?"

"জাফরাগঞ্জে ঢুকতেই যে একটা লাল বংয়েব কুঠি আছে, সেইখানেই আমার বাসা।"

"ওটা ইদমৃত্উল্লা সাহেবেব খালি বাগান বাড়ি কি?"

"হ্যাঁ। ওইটেই আমি ভাড়া নিয়েছি।"

"বেশ, আমি আজ সন্ধ্যাবেলাই সেখানে যাব।"

"বেশ।"

৯

নীলু রায় এবং জগদ্ধাত্রী উভয়েই স্ব স্ব কর্মে নিজেদেব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নীলু রায় ভাবিয়াছিলেন এ অঞ্চলে জন সাহেবের যত সম্পত্তি আছে তাহা কার্যতঃ এখন ধূর্জটিমঙ্গলেরই সম্পত্তি। সুতবাং সে সম্পত্তি কত, তাহার একটা প্রকৃত ধারণা করা তাঁহার কর্তব্য। ধূর্জটিমঙ্গলের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা কবাব ভাব তো তাঁহার উপর। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া মহালে মহালে ঘুবিয়া বেড়াইতেন, কোথায় কি আছে তাহার হিসাব রাখিতেন, জন সাহেবের কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কত টাকা আদায় হইয়াছে, খাজনাব টাকা দেওয়া হইয়াছে কি না তাহারও খোঁজ লইতেন। একটি পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন তিনি।

যে সব খবর সংগ্রহ করিতেন তাহা একটি খাতায় লিখিয়া রাখিতেন। মাঝে মাঝে মাখনলালের সহিত শিকারে বাহির হইয়া বনমুর্গি, তিতির, লীখ, নওরং, হরিয়াল প্রভৃতি মারিয়া আনিতেন। মাখনলালের বুধু সেগুলি পরিপাটিরূপে রন্ধন করিত। রন্ধনের সময় মাখনলালও রান্নাঘরে বসিয়া থাকিত। একদিন নীলু রায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি রান্নাঘরে বসে' থাক কেন?"

"আজ্ঞে পাহারা দি। পাহারা না দিলে রাঁধতে রাঁধতেই ও অর্ধেক খেয়ে ফেলবে। ভারী পেটুকি যে—"

"বল কি।"

"ঠিকই বলছি। একদিন একটা বেশ বড় পতীলু মেরে এনেছিলাম। আমাকে বাইরে একটা কাজে যেতে হয়েছিল, বাড়ি ফিরে দেখি বুধু সবটা খেয়ে বসে আছে। খেতে বসে বললাম—কই মাংস আন। হেসে বললে পতীলুটাকে বিলারে নিয়ে গেছে। চুলের ঝুঁটি ধরে যখন ঠ্যাঙালাম তখন বলল 'বড় লোভ লাগাছিল, একটু একটু করে খেতে খেতে সব ফুরিয়ে গেল যে! একটাই তো মোটে এনেছিলে, কাল বেশী ক'রে এনো রেঁধে দিব।' তাও দেখুন। তারপর থেকে পাহারা দি। কতবার দূর করে' দিয়েছি, কিন্তু যেতে চায় না, মার খেয়েও ঘুরে আসে। তাছাড়া রাঁধেও ভালো।"

মাখনলাল হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাখনলালের ওপর রাগ করা শক্ত। ভালো দাবা খেলে, লোকও বেশ ভালো। তাহার নির্দেশে কয়েকজন সিপাহী রাত্রে হাঁকডাক দিয়া পাহারাও দেয়। নীলু রায়ের জন্য জগদ্ধাত্রী দুইবেলা নানারকম রন্ধন করেন। নিরামিষ বহুরকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানেন তিনি। নীলু রায়কে উপর্যুপরি এক তরকারী দুইদিন খাইতে হয় নাই। খোসাচচ্চড়িও তাঁহার হাতে অপূর্ব হইয়া ওঠে। জগদ্ধাত্রী কিন্তু বড় গম্ভীর। প্রতিদিন নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেন, পাখা হাতে সামনে বসেন, কিন্তু বড় গম্ভীর। প্রয়োজনীয় আলাপ ছাড়া অন্য কথা বলেন না। রান্নাবান্না, ঠাকুরঘর ছাড়া, তাঁহার আর একটি অবলম্বন চরখা। রোজই অনেকক্ষণ ধরিয়া চরখা কাটেন। চরখার সুতায় গামছা চাদর এবং মোটা গোড়ে কাপড় প্রস্তুত হয়। অদূরে একটি তাঁতীর ঘর আছে। ছোট তাঁতও আছে একটি তাহার। এ অঞ্চলের অনেকের কাপড় গামছা সেই

বুনিয়া দেয়। সে সদা ব্যস্ত। তবু সে জগদ্ধাত্রীর সুতা পাইলে সর্বাগ্রে তাঁহার কাজই করে। সে জানে এসব কাপড়, গামছা, চাদর এই অঞ্চলের গরীব দুঃখীরাই পাইবে। বিতরণের ভারও জগদ্ধাত্রী তাহার উপরই দিয়াছেন। কারণ, তিনি এদেশের কাহাকেও চেনেন না, কে গরীব কে ধনী তাহা জানেন না। কে ধনী কে গরীব তাহা বাহির হইতে দেখিয়া চিনিবারও উপায় নাই। সকলেরই বেশবাস অনাড়ম্বর। স্বয়ং ধলরাজাই বাড়িতে যে পোশাক পরিয়া থাকেন তাহা সাধারণ আদিবাসীর পোশাক। এই সব লইয়াই জগদ্ধাত্রী নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। তাঁহার ছেলে দুটি তাঁহার নিকট থাকিতে চায় না। লালী এবং কস্তুরীর কাছেই থাকিতে ভালবাসে তাহারা। দিনের বেলায় একবার মায়েব কাছে আসে অবশ্য, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নহে। কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া আবার চলিয়া যায় তাহারা। লালী আর কস্তুরী কখনও তাহাদের পিঠে করিয়া কখনও কাঁধে লইয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়। জঙ্গলে জঙ্গলে নিত্য নূতন পরিবেশে ভ্রমণ করা তাহাদের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা বাড়িতে থাকিতেই চায় না। বন্য খরগোশের বাচ্চা, কয়েকটা দেশী কুকুর, আর লালীর পোষা ময়নাটার সঙ্গে তাহাদের খুব ভাব। জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক বড়ই কম। নালু রায় জগদ্ধাত্রীর দুঃখ বোঝেন, কিন্তু ইহাও বোঝেন, এ দুঃখ মোচন করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। তবু তিনি জগদ্ধাত্রীকে অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার ঘরের সামনে বসিয়া মাঝে মাঝে দিলরুবা বাজান। কিন্তু জগদ্ধাত্রীর দিক হইতে কোনও সাড়া আসে না। নীলু রায়ের মাঝে মাঝে ভয় হয় হয়তো তাঁহার বিরক্তি উৎপাদনই করিতেছেন তিনি। একদিন তিনি ধলরাজার নিকটে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিলেন—বৌঠান একা একা বড় চুপচাপ থাকেন। তাঁর বেড়াবার জন্য যদি একটা ভালো পালকি আর কয়েকজন বাহক দেন তাহালে তিনি একটু আধটু বেড়াতে পারেন। ধলরাজা দিলদরিয়া লোক। একটি রৌপ্যখচিত ভালো পালকি এবং আটজন বাহক পাঠাইয়া দিলেন তাহার পরদিনই। পালকি কিন্তু বাহিরেই পড়িয়া রহিল এবং আটজন বাহক বসিয়া বসিয়া অন্ন ধ্বংস করিতে লাগিল। - জগদ্ধাত্রী বেড়াইতে যাইবার কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কয়েকদিন পরে ধলরাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কি একটি পরবে তাঁহার

বাড়িতে আদিবাসীদের নৃত্যোৎসব ছিল, সেই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য তিনি জগদ্ধাত্রীকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। মধু সামন্ত তাঁহার অনুরোধটি বহন করিয়া আনিলেন। নীলু রায়কে বলিলেন, "রাজার নিমন্ত্রণ রাখতেই হবে। না রাখলে তিনি অপমানিত বোধ করবেন। আপনার বৌঠানকে বুঝিয়ে বলুন, নাচ তাঁর ভালো লাগবে। ধলরাজা আমাকে বলেছেন মিতিনকে খুব খাতির করে' এনো।"

নীলু রায় জগদ্ধাত্রীকে এ সংবাদ দিলে প্রথমে তিনি রাজী হন নাই। বলিলেন—"আমার অবসর কই। রান্নাবাড়া আছে, পূজো আছে, খুঁটি আর খাম্বা আসবে, তাছাড়া তাঁতীকে কিছু সুতো দিতে হবে, মাখনলালের রাঁধুনীর জন্যে একটা কাপড় বুনতে দিয়েছি' সুতোয় কম পড়ে গেছে—"

নীলু রায় বলিলেন—"বৌঠান, অবসর আপনাকে করতেই হবে। আপনি পূজো সেরে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়বেন—খাওয়াদাওয়া ওখানেই হবে।"

"আমি অন্য কোথাও খেতে পারব না। তাছাড়া দেখুন একা কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। উনি থাকলে উনি যদি যেতেন আমি সঙ্গে যেতাম, একা একা কোথাও যেতে ভাল লাগে না।"

"এখানে কিন্তু যেতেই হবে বৌঠান। রাজারাজড়াব ব্যাপার, না গেলে অপমানিত বোধ করবেন। ওঁকে চটিয়ে এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। যাবেন, একটু নাচ দেখে ঘুরে আসবেন। বেশীক্ষণ থাকব না আমরা।"

জগদ্ধাত্রীকে অবশেষে রাজী হইতে হইল।

ঠিক হইল, তিনি পূজা করিয়া দুধ, চিঁড়া আর কলা দিয়া ফলাহার কবিয়া লইবেন। তাহার পর একটু বিশ্রাম করিয়া ধলরাজার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবেন। রুলার কাছে খাম্বা-খুঁটির জন্য খাবার থাকিবে। জগদ্ধাত্রী পালকিতে গেলেন। নীলু রায় বন্দুকটি পৃষ্ঠে বাধিয়া অশ্বারোহণে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ধলরাজা সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন জগদ্ধাত্রীকে। তিনি যাইবামাত্র একসঙ্গে অনেক মাদল বাজিয়া উঠিল, তূর্যধ্বনি হইল। একদল মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া অভিবাদন করিল তাঁহাকে। মেয়েগুলি ফুলের সাজে সাজিয়াছিল। মাথায় কোমরে কৃষ্ণচূড়া পলাশ আর জবা ফুল। কটিদেশের

বন্ধনীতে মহুয়া আর জারুল ফুলের গুচ্ছ, হস্তের বাজুবন্দে কর্নিকার। তাহাদের বক্ষে কোন আবরণ নাই, তাহাদের রঙীন ছোট কাপড় আঁটসাঁট করিয়া পরা। তাহাদের সর্বাঙ্গ এরণ্ড তৈলের মর্দনে কোমল, হরিদ্রার অবলেপে স্বর্ণাভ। তাহাদের অনাবৃত বক্ষের দিকে চাহিয়া জগদ্ধাত্রী বিব্রত হইলেন, তাহাদের কিন্তু কোনও লজ্জা নাই। জন সাহেবের কুঠিতে যেসব মেয়েরা কাজ করে জন সাহেবই তাহাদের জামা পরিতে, বুকে কাপড় দিতে শিখাইয়াছেন। ধলরাজার নর্তকীরা প্রায় উলঙ্গিনী। জগদ্ধাত্রী মনে মনে বিব্রত হইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিলেন না। ধলরাজার রানী এবং সহচরীগণ জগদ্ধাত্রীকে সমাদরে একটি পুষ্পপত্রসজ্জিত বিতানে লইয়া গেলেন। সেখানে কয়েকটি অলঙ্কৃত আসন ছিল, তাহারই একটিতে জগদ্ধাত্রীকে বসাইলেন তাঁহারা, নিজেরাও তাঁহার আশেপাশে বসিলেন। তাহার পর আসিল প্রকাণ্ড একটি স্বর্ণরৌপ্যখচিত পরাত, তাহাতে পান সুপারী এলাচ লবঙ্গ এবং আতরদানী। জগদ্ধাত্রী একটি এলাচ তুলিয়া লইলেন। তাহার পর নাচ শুরু হইল। নানারকমের নাচ, নানারকমের গান। নর্তক-নর্তকীদের প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সুরে গানে লাস্যলীলায় সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। স্বয়ং ধলরাজা উঠিয়া কাঁধে মাদল ঝুলাইয়া মাদল বাজাইতে বাজাইতে সকলের সহিত নাচিতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রী কিন্তু পাষাণপ্রতিমার মতো বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচ হইল। জগদ্ধাত্রী স্থির নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। নাচ শেষ হইবার পর খাওয়ার আয়োজন হইল। জগদ্ধাত্রীকে অন্দরমহলে লইয়া গেলেন রানী। পোলাও, রুটি পরোটা কচুরি, মাছ মাংস, নিরামিষ নানারকম তরকারী, ফল নানাবিধ। কেঁদ হইতে শুরু করিয়া পেঁপে, আনারস, আম, জাম, আপেল আঙুর, কিসমিস পেস্তা বাদাম। তাছাড়া পর্যাপ্ত মিষ্টান্ন, দু তিন রকম পরমান্ন। শূল্যপক্ক কয়েক-রকম পাখী। আরও কত কি। কিন্তু জগদ্ধাত্রী কিছুই স্পর্শ করিলেন না। অনেক অনুরোধের পর একটি আঙুর মুখে দিলেন। ভূরি-ভোজন করিলেন নীলু রায়।

সব শেষ হইতে বেশ রাত হইয়া গেল। ধলরাজা তাঁহাকে বলিলেন, মিতেন কিছু খাইলেন না। বলিতেছেন তাঁহার কি একটা ব্রত আছে।

তাই তিনি তাঁহার সঙ্গে সামান্য কিছু ভেট পাঠাইয়া দিতে চান। নীলু রায় ইহাতে আপত্তি করিতে পারিলেন না। যাইবার সময় দেখা গেল সামান্য ভেট মোটেই সামান্য নয়—দুই গাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র। মূল্যবান শাড়ি, এক চুপড়ি সিঁদুর এবং একজোড়া স্বর্ণবলয়ের সহিত প্রচুর খাদ্যদ্রব্য। চাল, ডাল, মাড়োয়া, মকাই, বাজরা, অনেক ফল, দুই হাঁড়ি দই এবং কয়েকরকম মিষ্টান্ন। তাছাড়া দুইটি পাঁঠা এবং একটি নধর ভেড়া।

নীলু রায় অশ্বারোহণে গাড়িগুলির পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলেন। জগদ্ধাত্রীর পালকিটা আগাইয়া গেল।

অন্ধকার রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সেটাকে একটা প্রেতের মুখ বলিয়া মনে হইতেছে। জগদ্ধাত্রী পালকীতে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এক টুকরা মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া দিল, একটু পরেই আবার চাঁদ মেঘের ফাঁক হইতে উঁকি দিল। জগদ্ধাত্রীর মনে হইল একটা প্রেতমূর্তি পরদার আড়াল হইতে তাঁহাকে দেখিতেছে। আবার শিহরিয়া উঠিলেন তিনি। পালকির সামনে ও পিছনে মশালধারীরা আসিতেছিল। মহিষের গাড়ি দুইটি পিছাইয়া পড়িয়াছিল, নীলু রায়ও গাড়ি দুইটির পিছনে ছিলেন। অন্ধকারে পাহাড়ী সংকীর্ণ পথে তিনি জোরে ঘোড়া চালাইতে পারিতেছিলেন না। জগদ্ধাত্রীর পালকিটা বনজঙ্গল ভেদ করিয়া দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিয়াছিল। সহসা জগদ্ধাত্রী পালকি বাহকদের থামাইয়া দিলেন তিনি শুনিতে পাইলেন বনের ভিতর কে যেন—মা মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছে। শিশুর কণ্ঠ। তাঁহার মনে হইল তাহার খান্দার গলা। পালকি থামিতেই আবার বনের ভিতর হইতে সেই শিশুকণ্ঠ শোনা গেল—মা—মা—মা।

"ও কিসের শব্দ, কে ডাকছে?"

একজন বাহক বলিল, "হরিণরা অনেক সময় ওইরকম শব্দ করে।"

"হরিণ নয়। এ আমার খান্দার গলা। তোমরা কেউ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে দেখ দিকি—"

বাহকেরা ইতস্তত করিতে লাগিল! অন্ধকার রাত্রে কেহই বনের ভিতর প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নয়।

"যাবি না কেন, গিয়ে দেখ, তোদের টাকা দেব।"

বাহকেরা তবু যাইতে রাজী নয়।

একজন মশালধারী বলিল—"এই বনের মধ্যে মৌলা গাঁ আছে। সেখানে আছেন অষ্টভূজা রঙ্কিণী। কৃষ্ণপক্ষে তাঁর পূজো হচ্ছে হয়তো। ওখানে এখন যাওয়া ঠিক নয়।"

জগদ্ধাত্রী পালকী হইতে নামিয়া পড়িলেন।

"তোমবা কেউ না যাও তো, আমি একাই যাব"

"না, না মা যাবেন না।"

বাহক এবং মশালধাবীবা তাঁহাকে বাবণ কবিতে লাগিল।

"তোবা কেউ না যাস তো আমাকে যেতেই হবে। আমাব ছেলেব গলা শুনেছি আমি। আমাব ভুল হয় নি, আমি যাব। আমাকে একটা মশাল দাও।"

হঠাৎ একজন মশালধাবী মত বদলাইয়া ফেলিল।

"চলুন মা যা থাকে কপালে আমি আপনাব সঙ্গে যাই। আপনি যখন যাবেনই তখন আপনাকে একা যেতে দিব না—"

"তাই চল।"

একজন বাহক বলিল—"ওই যে গাড়ি দুটাও পৌঁছে গেছে। বাবুও আইছেন—"

নীলু রায় গাড়ি দুইটিকে পাশ কাটাইয়া আগাইয়া আসিলেন।

"ব্যাপাব কি! আপনি বৌঠান এখানে নাবলেন কেন?"

"আমাব কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। আমি যেন খাম্বাব গলা পেলাম জঙ্গলের মধ্যে, মা মা বলে ডাকছে।"

"সে কি! খাম্বার গলা?"

একজন বাহক বলিল—"হবিণটরিণ অনেক সময় হবেকরকম ডাকে। বনবিড়ালের ডাকও ওই বকম হয়।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—"আমি বনের মধ্যে ঢুকব। নিজেব কানে আমি খাম্বার গলা শুনেছি। আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে ঠাকুবপো।"

"আপনি বৌঠান ওই জঙ্গলে তো ঢুকতে পাববেন না। পথ নেই, তাছাড়া এই জঙ্গলের ভিতর ছোট ছোট পাহাড়, টিলা অনেক আছে, কোনদিকে যাবেন আপনি—"

"কিন্তু একটু খোঁজ না নিয়ে আমি যাব না। আমি তার কান্না শুনেছি, আমার ভুল হয়নি।"

নীলু রায় জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন তিনি সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

একজন বাহক বলিল—"এই জঙ্গলের ভিতর পাহাড়ঘেরা মৌলা গাঁ আছে। সেখানে অষ্টভুজা রঙ্কিণীর মূর্তি আছে, সেখানে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর দিন পূজা হয় মায়ের, বলি হয়। ঝামরি আসে সেখানে—কাপালিক আসে, খণ্ডোবাবা।"

নীলু রায় বলিলেন, "ঝামরি যে রঙ্কিণীর পূজো করে সেটা তো একটা পাথর শুধু। আমাদের বাড়ির কাছেই সেটা—"

"আসল রঙ্কিণী নয় সেটা। আসল রঙ্কিণী বনদেবী। বনের মধ্যে থাকেন তিনি। প্রতি কৃষ্ণপক্ষে তার পূজা করে ঝামরি আর খণ্ডোবাবা।"

নীলু রায় তখন জগদ্ধাত্রীকে বলিলেন—"আপনি তাহলে এই পালকিতে বসে' থাকুন। আমি কয়েকজন লোক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে খোঁজ করি। আপনার কাছে সবাই থাকুক, আমি একজন মশালধারী আর একজন গাড়োয়ানকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকি--ভাগ্যে বন্দুকটা সঙ্গে এনেছিলাম।"

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, "বেশ, কিন্তু আপনার ফিরতে দেরি হলে আমি স্থির থাকতে পারব না। আমিও জঙ্গলে ঢুকে পড়ব।"

জঙ্গল শুধু জঙ্গলই নহে, প্রস্তরসমাকীর্ণ। প্রতিপদে ছোট বড় নানারকম রুক্ষ পাথর গতিরোধ করে। তবু নীলু রায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যদিও মশাল ছিল, তবু অরণ্যের পুঞ্জীভূত অন্ধকার আলোকিত হইতেছিল না। তাহাতে সম্মুখের পথটুকুমাত্র দেখা যাইতেছিল। তবু নীলু রায় চলিতেছিলেন। কিছুদূর গিয়াই কিন্তু তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সামনেই একটি প্রকাণ্ড গাছের বাঁকানো গুঁড়ি ছিল, গাছটি বেশ খানিকটা বাঁকিয়া তবে ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে। সেই বাঁকানো গুঁড়ির উপর পা দোলাইয়া তিনি বসিলেন। লক্ষ্য করিলেন। গাছটি প্রকাণ্ড শাখাপ্রশাখাময় মহীরুহ একটি। বাঁকিয়া যেখান হইতে সে ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে সেখানে গুঁড়ির উপর প্রকাণ্ড একটি গর্তও রহিয়াছে। নীলু রায়ের মনে হইল বৃক্ষটি যেন একচক্ষু

দানবের মতো নির্নিমেষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। সহসা সেই গর্তের ভিতর হইতে ফোঁস করিয়া একটা শব্দ হইল। নীলু রায় চমকিয়া উঠিলেন। সাপ নাকি? কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড একটা পাখী সবেগে গর্তটার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং তাঁহার মুখে প্রচণ্ড ডানার ঝাপটা দিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। তাঁহার সহচরটি বলিল—জংলী প্যাঁচা একটা। একটু পরেই প্যাঁচাটার কর্কশ চীৎকারে সমস্ত বনস্থলী কাঁপিয়া উঠিল। বুউউউ বোওওও—এই শব্দ বারবার শোনা যাইতে লাগিল। নীলু রায়ের মনে হইল কে যেন বলিতেছে ভু—য়ো, ভু—য়ো। নীলু রায় আবার চলিতে শুরু করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দূরে হায়নার হাহা শব্দ রাত্রির অন্ধকারকে মথিত করিয়া যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। নীলু রায় তবু চলিতে লাগিলেন। একটু পরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল তিনি যেন ক্রমশঃ একটা পর্বতের উপর আরোহণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আর একটা অপ্রত্যাশিত শব্দে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। সহসা কোথায় যেন ঢোল কাঁসর ঝাঁজর একযোগে বাজিয়া উঠিল। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন নীলু রায়। কোথাও পূজো হইতেছে নাকি? তাঁহার সহচরটি বলিল, "বঙ্কিনী মায়ের মন্দিরের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা। আর একটু উঠতে হবে। পাহাড়ের উপরে উঠলে তখন দেখা যাবে সব।" নীলু রায় পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পাহাড়ের শীর্ষে উঠিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন পর্বতবেষ্টিতে একটা সমতল স্থানে অনেক মশাল জ্বলিতেছে, অনেক লোক বাজনা বাজাইতে বাজাইতে উন্মাদের মতো নৃত্য করিতেছে। একটা মন্দিরের মতো কি রহিয়াছে যেন। নীলু রায় আর অপেক্ষা করিলেন না, পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া নামিতে লাগিলেন। নামাও সহজ ছিল না। চারিদিকে ছোট বড় পাথর, কাঁটা-গাছ এবং মাঝে মাঝে গর্ত। নীলু রায় হামাগুড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। একবার বসেন, সম্মুখের দিকে পা বাড়াইয়া দেন, তাহার পর আর একটু অগ্রসর হন।

"ঠাকুরপো আমিও এসে গেছি। আমি আর থাকতে পারলাম না।"

নীলু রায় সবিস্ময়ে দেখিলেন জগদ্ধাত্রীও তাঁহার পিছনে হামাগুড়ি দিয়া নামিতেছেন। তাঁহার অবগুণ্ঠন খসিয়া গিয়াছে, গাছকোমর করিয়া কাপড় পরিয়াছেন, শাড়ির স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, ঘন

ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা প্রখবতা যাহা নীলু বায় বাঘের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি ভয পাইয়া গেলেন। নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন তাঁহাব দিকে।

"বসে আছেন কেন, চলুন চলুন, একটা লোককে কাটছে ওবা- "

নীলু রায় সভয়ে দেখিলেন একটা লোককে ধবিয়া বাঁধিয়া একটা হাড়-কাঠের মধ্যে ফেলিল তাহাবা। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক প্রকাণ্ড একটা খড়্গ দিয়া তাহাব মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিল। একজন অনুচব বলিল—"নববলি হচ্ছে। এবছর ফসল ভালো হয নাই তো। খণ্ডোলাবা নিজে হাতে কাটছে—"

নীলু বায় দেখিলেন নৃত্যে মাতিয়া উঠিযাছে সবাই। মৃত ব্যক্তিটাব বক্ত গায়ে মুখে মাখিয়া উন্মাদ নৃত্য জুড়িয়াছে। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন। সহসা তাঁহাব মনে পড়িল তাঁহাব পিঠে বন্দুক বাঁধা আছে। তিনি তাড়াতাড়ি বন্দুকটি খুলিযা দুম দুম কবিয়া দুইবাব আওযাজ কবিলেন। ইহাতে ফল হইল। যে যেদিকে পাবিল ছুটিতে লাগিল।

'চলুন, চলুন, বসে' আছেন কেন?"

জগদ্ধাত্রীব তাড়ায় নীলু বায আবাব অববোহণ শুরু কবিলেন। জগদ্ধাত্রী তাহাব পিছনে পিছনে আসিতে লাগিলেন।

বাব বাব উঠিয়া পড়িযা ক্ষতবিক্ষত হইযা অবশেষে তাহারা কোনমতে নীচে নামিলেন। নীচে নামিয়াই জগদ্ধাত্রী উন্মাদিনীব মতো ছুটিতে লাগিলেন। মন্দিবের কাছাকাছি গিয়া বঙ্কিণীব ভাযণা মূর্তি। দিকে চাহিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলেন। ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত দুই হাতে দুইটি তববাবি। পদতলে একটি শবমূর্তি। কিন্তু সে স্তব্ধতা মুহূর্তের জন্য। তাহাব পবই তিনি চীৎকাব কবিয়া উঠিলেন। খাম্বাব মুণ্ডটা মায়েব পায়েব কাছে বহিয়াছে। আব, একটা কাব মুণ্ড? হ্যাঁ ওটাকেও তো তিনি চেনেন। লাল দাড়ি টিয়াপাখীব ঠোঁটেব মতো নাক। মীব মহম্মদকেও তিনি চিনিতে পারিলেন এবং পরমুহূর্তেই মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। মন্দিবেব পিছনে ঝামরি ছিল সে ছুটিয়া আসিল। মূর্ছিতা জগদ্ধাত্রীব দিকে চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল সে। উলঙ্গিনীব সর্বাঙ্গে রক্তমাখা। হঠাৎ বসিয়া মূর্ছিতা জগদ্ধাত্রীর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল। বলিতে লাগিল -"তুব

ব্যাটার কত পুণ্য, মায়ের ভোগে লাগল সে। তোর দুঃখু কিসের, একটা ব্যাটা তো রইল। মায়ার বিষ আর কত খাবি ? বিষ বিষ, বিষ আব খাস না—কিন্তু ও কি শুনবেক ? বিষ খাবেকই।"

আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল সে। তাহাব পর হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। খণ্ডোবাবা ধমক দিলেন—চুপ কর, চুপ কর।

বন্দুকেব শব্দে অনেকেই পালাইয়াছিল, কিন্তু খণ্ডোবাবা পালান নাই। তিনি রঙ্কিণীব সম্মুখে করজোড়ে বসিয়াছিলেন। কাপালিকের মতো চেহারা। মাথায় জটা, কপালে সিঁদুব। রং কালো নয়, গৌববর্ণ। চোখ দুটি টানাটানা। একমুখ গোঁফদাড়ি। বলিষ্ঠগঠন পুরুষ। পরনে কাপড নাই চিতাবাঘের চামড়া দিয়া তৈবি একটি কৌপীন লাল ডোরায় কটিসংলগ্ন রহিয়াছে। নীলু বায় হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নিজেব চক্ষুকেই যেন বিশ্বাস করিতে পাবিতেছিলেন না তিনি। কিন্তু কয়েকমুহূর্ত পরেই তাঁহার জড়ভাব কাটিয়া গেল। তিনি বন্দুকটা তুলিয়া খণ্ডোবাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি খুনী। তোমাকে আমি শাস্তি দেব।"

খণ্ডোবাবা নির্বিকাবভাবে নীলু বায়েব দিকে চাহিলেন। তিনি যে বিন্দুমাত্র ভয় পাইয়াছেন তাহা মনে হইল না। একটু হাসিয়া পবিষ্কাব বাংলায় বলিলেন—"তোর বন্দুকেতে তো গুলি নেই। থাকলেও মারতে পারতিস না।' কেউ কাউকে মাবতে পারে না। মারবার বাঁচাবাব মালিক মা। এ পূজো ধলরাজার পূজো। প্রতিবার পূজোতেই নরবলি হয়। এবাব শিশুবলিও হল। এ অঞ্চলে মাঠে এবাব সব ফসল কচি কচি অবস্থাতেই শুকিয়ে যাচ্ছে, তাই মা ঝামরিকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছিলেন এবাব কচি শিশু বলি চাই। ঝামরি শিশুটিকে যোগাড় করে এনেছে। তুই যদি আমাকে গুলি কবিস সে গুলি লাগবে ধলরাজার বুকে। তখন তুই আব নিস্তার পাবি না। খবরদার এ কাজ করিসনি!"

নীলু রায় জানিতেন তাঁহার বন্দুকে আর গুলি নাই। সঙ্গেও আব গুলি ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন এ অবস্থায় কি করিবেন, কি করা উচিত।

কাপালিক আবার বলিলেন—"তোর মনে যদি আমার উপর আক্রোশ হয়ে থাকে গুলি করে' আমাকে মারতে পারবি না। তবে একটা কাজ

করতে পারিস। মায়ের কাছে আমাকে বলি দিতে পারিস। এই খাঁড়া নে। হাড়কাঠে গলা ঢুকিয়ে দিচ্ছি, মায়ের কাছে আমাকে বলি দিয়ে দে, আমার মুক্তি হয়ে যাক—শুনলে ধলরাজাও খুশী হবে।"

প্রকাণ্ড রক্তাক্ত খাঁড়াটা লইয়া তিনি নীলু রায়ের কাছে আগাইয়া আসিলেন।

নীলু রায় পিছাইয়া আসিলেন। বলিলেন, "না, আমি পূজার নামে মানুষ খুন করি না। তোমরা কাকে খুন করেছ জান?"

"ওই দাড়িওলা লোকটাকে তো আমিই এনেছি। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিল আমাকে দেখে বলল—অমি বিদেশী লোক, পথ হারিয়েছি, আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। সঙ্গে করে' নিয়ে এলাম, দুনিয়ার সেরা পথটা দেখিয়ে দিলাম। হা হা হা হা—"

কাপালিকের অট্টহাস্যে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল।

"কিন্তু এই ছেলেটা কার জান? ধলরাজার বন্ধু ধূর্জটিমঙ্গলের। ধলরাজার অনুরোধেই তিনি মুর্শিদাবাদে গেলেন, আর তোমরা তাঁর ছেলেটাকে এনে—"

হঠাৎ একটা আর্তচীৎকার শুনিয়া নীলু রায় থামিয়া গেলেন। দেখিলেন মূর্চ্ছিতা জগদ্ধাত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার চুল আলুলায়িত, বেশবাশ বিস্রস্ত। তিনি দুই হাত রঙ্কিণীর দিকে বিস্তার করিয়া চীৎকার করিতেছেন —সে চীৎকার হৃদয়ভেদী, সে চীৎকার মর্মন্তুদ। নিপীড়িত নারীত্বের যে চীৎকার যুগ যুগ ধরিয়া মহাকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া অবশেষে শূন্যে হারাইয়া গিয়াছে সেই চীৎকার সহসা যেন জগদ্ধাত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভার ঊর্ধ্বমুখী উৎক্ষেপে অন্ধকার আকাশে উচ্ছ্রিত হইয়া পড়িল। সে চীৎকারে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, হয় নাই কেবল ঝামরি। সেও চীৎকার করিতেছিল—"শুধা শুধা ওই রক্তখাগীকে, শুধা কেন ও তোর ছেলাটা কেড়ে লিলেক, কেন আমাকে স্বপ্ন দিলেক—শুধা তুই, চীৎকার করে শুধা—শুধা—রক্তখাগী আর কত রক্ত খাবেক—"

ঝামরি দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে রঙ্কিণী মূর্তির দিকে আগাইয়া গেল। তাহার পর কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল আবার।

'ও জবাব দেবেক নাই। লুকুর লুকর করে ভালবে খালি। ওর খ্যামতা আছে, কিন্তু বড্ড নোলা—"

"তুই চুপ করবি? চুপ কর শীগ্‌গির—"

খণ্ডোবাবা ধমক দিলেন আবার। ঝামরি মুচকি হাসিয়া গা দোলাইতে দোলাইতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। জগদ্ধাত্রীও বসিয়া পড়িলেন এবং দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মনে মনে তিনি বলিতেছিলেন—"মা রঙ্কিণী, তোমাকে আমি চিনতাম না। অনেক দেবদেবীর পূজা করেছি, কিন্তু তোমার পূজা কখনও করিনি। তাই তুমি কি আমাকে শাস্তি দিলে তাই কি আমার খাম্বাকে কেড়ে নিলে তুমি? কিন্তু শুধু খাম্বাকেই তো নাও নি, আমার শক্রুটাকেও তো নিয়েছ। তোমার মহিমা তোমার লীলা বোঝবার মতো বুদ্ধি নেই আমার। কিন্তু আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে মা। আমি কি করি—আমি কি করি—"

হঠাৎ নীলু রায় লক্ষ্য করিলেন কাপালিকটি অন্ধকারে অন্তর্ধান করিয়াছে। তাহার সঙ্গে যে লোকজন আসিয়াছিল তাহারাও কেহ নাই। মশালের শিখাগুলিও নিবিয়া আসিতেছে। পর্বতবেষ্টিত রঙ্কিণীর মন্দির ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া যাইতেছে।

নীলু রায় ভয় পাইয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রীকে লইয়া কি করিবেন এখন? জগদ্ধাত্রী পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, তিনি দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়াই চলিয়াছিলেন। নীলু রায় ভাবিলেন এখন ওই পাহাড়ী জঙ্গলে ঢোকা তো অসম্ভব। হঠাৎ তিনি ডাক দিলেন—ঝামরি, এই ঝামরি, কোথা গেলি তুই? আমাদের ফেরবার ব্যবস্থা করে দে—।

কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই বিব্রত হইয়া পড়িলেন নীলু রায়। তাহার পর অদ্ভুত কাণ্ড হইল একটা। অন্ধকার ভেদ করিয়া পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো দুইটি পালকি আসিয়া হাজির হইল। বাহকেরা দীর্ঘাকৃতি, ইহার বেশী আর কিছু দেখা যায় না।

"চলেন আপনারা—"

"কোথা থেকে এলে তোমরা?"

কোন জবাব নাই।

"আমাদের পালকি আর ঘোড়া কোথায় আছে জান?"

"জানি।"

"সঙ্গে মশাল তো নেই। অন্ধকারে যেতে পারবে?"

"পারব।"

নীলু রায় তখন জগদ্ধাত্রীর নিকট গিয়া বলিলেন—বৌঠান চলুন, যাই। পালকি যখন পাওয়া গেছে—"

জগদ্ধাত্রী যন্ত্রচালিতবৎ একটি পালকিতে গিয়া উঠিয়া বসিলেন। নীলু রায় বসিলেন আর একটিতে। বাহকেরা পালকি দুইটি সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়া লইল এবং নিঃশব্দে দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। বনজঙ্গল ভেদ করিয়া অবলীলাক্রমে ছুটিতে লাগিল তাহারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা বড় রাস্তায় উপস্থিত হইল। সেখানে নীলু রায়ের পালকি, ঘোড়া, লোকজন সবাই তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহাদের নামাইয়াই পালকিবাহকগণ পালকি লইয়া দ্রুতপদে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। নীলু রায় তাহাদের পারিশ্রমিক দিবেন ঠিক করিয়া তাহাদের ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা আর ফিরিল না।

নীলু রায় জগদ্ধাত্রীকে লইয়া যখন জন সাহেবের কুঠিতে পৌঁছিলেন, তখন ভোর হইতেছে।

জগদ্ধাত্রী পালকি হইতে নামিয়াই বলিলেন—"এখানে আমি আর একদণ্ড থাকব না। আজই কলকাতায় ফিরে যাব। মরতে হয় সেখানেই মরব। আপনি যাবার সব ব্যবস্থা করুন।"

নীলু রায় বুঝিলেন এ কথার প্রতিবাদ করা চলিবে না।

১০

জফরাগঞ্জের লাল কুঠিতে ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারি আর বারাহীর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেখানে দাসদাসী যানবাহন সিপাহীসান্ত্রী কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি সেদিন বাড়ি ফিরিয়াই প্রথমে একটি ভালো ঘোড়া পাণ্ডবপ্রধানকে পাঠাইয়া দিলেন। ঝকমারিই সে ঘোড়াটি চড়িয়া গেল। ঝকমারি পুরুষের পোশাক পরিত্যাগ করে নাই। বারাহীকে হাসিয়া

বলিয়াছিল—"আমি যুদ্ধে যাব তাই পুরুষ সেজেছি। শত্রু নিপাত করব—"

বারাহীর পাগলামী কমিয়া গিয়াছিল। শরীরও সারিয়া গিয়াছিল অনেক। এ পরিবর্তন কোন ঔষধ প্রভাবে হয় নাই। ধূর্জটিমঙ্গল যে-ই তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে কংসকে তাহার কাছে ধরিয়া আনিবেন অমনই তাহার রোগ সারিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গলকে সে বলিল—"দাদা, আমি কিন্তু ওকে খুন করব।"

"বেশ, তাই করিস।"

বারাহীর স্বামী হংসেশ্বর বৃদ্ধ। বারাহীব সহিত তাঁহার বয়সের তফাৎ বিয়াল্লিশ বৎসর। বাবাহী ছাড়া আরও কয়েকটি পত্নী ছিল তাঁহার। বারাহী স্বামীগৃহে কখনও যায় নাই। পিতৃগৃহে ধূর্জটিমঙ্গলের নিকটই সে থাকিত। হংসেশ্বরই মাঝে মাঝে বারাহীব নিকট আসিতেন। একদিন খবর আসিল হংসেশ্বর অত্যন্ত অসুস্থ, বারাহীকে দেখিতে চান। তাঁহাব বৈমাত্র ভ্রাতা কংসেশ্বরকে তিনি পাঠাইলেন বারাহীকে লইবার জন্য। বারাহী পিতৃগৃহে থাকিত বলিয়া কংসেশ্বব তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখেন নাই। নবোদ্ভিন্নযৌবনা রূপসী বাবাহীকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বারাহী দেবরের সহিত স্বামীগৃহে গেলেন এবং শয্যাগত বৃদ্ধ স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহাব প্রথমা সতীন মৃতবৎসা, অতিসারে ভুগিতে-ছিলেন। তিনি রোগে শোকে এমন জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাকেও সেবা করিতে হইত বারাহীর। অন্যান্য সতীনগুলি নিজেদেব ছেলেমেয়ে লইয়া বিব্রত। তাহারাও অনেকেই অসুস্থ এবং সংসারজ্বালায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ। রোগীব সেবা করিবার সময় তাহাদেব ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। চতুর্দিকেই চ্যাঁ ভ্যাঁ, চতুর্দিকেই অশান্তি, চতুর্দিকেই কলহ কচকচি। বারাহীর মনে হইল যেন একটা নরকে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সে অভিজাত বংশের মেয়ে। এই নরকেও সে স্বামী ও সতীনদের সেবা করিতেছিল। কিন্তু তাহার জীবন দুঃসহ করিয়া তুলিল ওই কংস। সে ফাঁক পাইলেই আসিয়া প্রণয় নিবেদন করিত। যেদিন সে তাহার হাত ধরিয়া টানিল সেদিন বারাহীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। ঠাস করিয়া তাহার

গালে এক চড় মারিয়া সে পতিগৃহ ত্যাগ করিল। বেহালা অঞ্চলে শ্বশুরবাড়ি ছিল তাহার। তাহার স্বামী হংসেশ্বর সাবর্ণচৌধুরীদের কিরকম আত্মীয় ছিলেন। বারাহী বেহালা হইতে সোজা হাঁটিয়া বাপের বাড়ি সুতানুটিতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। অনুনয় করিতে করিতে কংস কিছুদূর তাহার অনুসরণও করিয়াছিল। কিন্তু বারাহীকে ফিরাইতে পারে নাই। বারাহী বলিয়াছিল, বেশী যদি বাড়াবাড়ি কর ডেকে লোক জড় করব। কংস আর অগ্রসর হইতে সাহস পায় নাই। সেকালে পথঘাট ভালো ছিল না, অনেক জায়গায় বনজঙ্গল ছিল, যানবাহন সুলভ ছিল না। বারাহী পদব্রজেই সুতানুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই শুনিল চারিদিকে পালা রব উঠিয়াছে। টালা দিয়া নবাবের ফৌজ নাকি আগাইয়া আসিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন এখন বাড়িতে থাকা ঠিক নয়, চল আমরা জঙ্গলে ঢুকে আত্মরক্ষা করি। দূরে ফৌজদের চীৎকার শোনা গেল। ধূর্জটিমঙ্গল ও ... ক্রতপদে জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। বারাহী ছুটিয়া ছাতে উঠিয়া পড়িল। চিলেকোঠার একটা ঘরে বিছানা গাদা করা ছিল। ... খিল দিয়া সেই বিছানার মধ্যে লুকাইয়া রহিল বারাহী। সমস্তদিন লুকাইয়া রহিল। নবাবের সৈন্য বাড়িতে ঢুকিয়া ধূর্জটিমঙ্গলের দুই পত্নী আর ... ভগ্নীগণকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। চিলেকোঠার ঘরে বসিয়া তাহাদের আর্ত হাহাকার শুনিল বারাহী। কিছু করিতে পারিল না, দুরু দুরু হৃদয়ে বসিয়া রহিল কেবল। সমস্ত দিন কাটিল, সমস্ত রাত কাটিল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া অবশেষে সে চিলেকোঠার দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। ... সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দেখিল লুণ্ঠনের চিহ্ন চারিদিকে। ... নাই। দাসী চাকররাও পালাইয়া গিয়াছে। উঠানে কূপ ছিল, ... ধারে দড়ি বাঁধা একটা ছোট বালতি ছিল। বারাহী উঠানে নামিয়া বালতি ... নামাইয়া জল তুলিতেছিল। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল তাহার।

"এ কি, তুমি এখনও এখানে আছ?"

বারাহী চমকাইয়া উঠিল। দেখিল খিড়কি দরজায় কংস দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্বাঙ্গ যেন জমিয়া গেল। প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল ...। কংস হাসিয়া বলিল—"ভয় কি, আমি যখন এসে গেছি, তখন

তোমাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে আর কোন ভয় থাকবে না। দাঁড়াও একটা পালকি নিয়ে আসি।"

কংস চলিয়া গেল। বারাহী জল তুলিয়া বালতিতে মুখ লাগাইয়াই খানিকটা জল খাইয়া ফেলিল। তাহাব পার আবাব চিলেকোঠায় উঠিয় খিল দিয়া বসিয়া বহিল। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। কাহারও কোন সাড়াশব্দ নাই। অনেকক্ষণ পরে শব্দ পাওয়া গেল। একাধিক পদশব্দ সিঁড়ি দিয়া শব্দ ছাদে উঠিল। তাহাব পর চিলেকোঠার দবজায় ঘা পড়িল।

"কপাট খোল। আমি এসে গেছি—"

বারাহী কপাট খুলিল না। তাহাব পব পদাঘাতেব পর পদাঘাত পড়িতে লাগিল কপাটের উপব। জীর্ণ কপাট সে প্রচণ্ড আঘাত সহ্য কবিতে পারিল না। ভাঙিয়া গেল। ভিতবে প্রবেশ কবিল দুইজন মুসলমান ফৌজি সিপাহী। দুইজনেবই কষকষে কালো দাড়ি, কাঁধে বন্দুক তাহাদের পিছনে কংস, মুখে অদ্ভুত একটা কুটিল হাসি।

সিপাহী দুইটি ঘবে ঢুকিয়াই কোন ভূমিকা না করিয়া বারাহীকে ধবিয়া ফেলিল এবং টানিতে টানিতে নীচে লইয়া গেল।

কংস বলিল—"যে চড়টা মেবেছিলে সেটা সুদশুদ্ধ শোধ করে' দিলাম।"

তাহার পর সিপাহীদেব দিকে চাহিয়া বলিল—"আরও দুই একটা বাড়িতে খবসুবৎ লেড়কী আছে তাহাদের সন্ধানও আপনাদেব দিব আমার সঙ্গে আসুন।"

সংক্ষেপে ইহাই কংসেব ইতিহাস।

ধূর্জটিমঙ্গল কংসেব খোঁজে উমিচাঁদেব জমাদার জগন্নাথকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। মৈনি বিবির মাধ্যমে জগন্নাথেব সহিত তাঁহার যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। মহম্মদী বেগও তাঁহার নিকট আসা যাওয়া করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল ধূর্জটিমঙ্গল মালদাব লোক, ভাল করিয়া খিদমত করিতে পাবিলে তাহার কিসমত ফিরিয়া যাইবে। সে যুগে সকলেই নিজের নিজের কিসমত ফিরাইতে ব্যগ্র থাকিত। অর্থের বিনিময়ে হীনকর্ম করিতেও কেহ পশ্চাৎপদ হইত না। স্বয়ং নবাব সিরাজউদ্দৌলাই অর্থেব জন্য তাঁহার আপন মাসী ঘসেটি বেগমেব মতিঝিল লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, রাজবল্লভকে পীড়ন

করিয়াছিলেন, জগৎশেঠকে অপমান করিয়াছিলেন, বিদেশী বণিকদের নিকট হইতে নানাছলে নজরানা ও জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। সেকালে টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন এমন লোকের সংখ্যা বড় বেশী ছিল না। ইতর-ভদ্র হিন্দু-মুসলমান সকলেই টাকার গন্ধ পাইলে নীতি-ধর্ম বিসর্জন দিতে ইতস্তত: করিতেন না। টাকা, মেয়েমানুষ এবং নবাব সরকারের দাক্ষিণ্যলাভ এই তিনটিকে কেন্দ্র করিয়াই নাগরিক জীবন আবর্তিত হইত, রাজনীতিও এই তিনটি চক্রে চক্রায়িত হইত। অধিকাংশ ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল এই তিনটি জিনিসই।

মহম্মদী বেগ আসিয়া ধূর্জটিমঙ্গলকে জানাইলেন—"আসফ আলী এখন মুর্শিদাবাদেই আছেন। তিনি ফৌজে কাজ করেন।"

"তাঁব বাড়ি কি এখানেই ?"

"না। তিনি এলাহাবাদেব লোক। এখানে নোকরি করেন।"

"কোথায় থাকেন ?"

"থাকেন নাজমা বিবির বাড়িতে।"

"তাঁর পরিবার এখানে নেই ?"

"না। তারা সব এলাহাবাদে।"

এই খবরটি সরবরাহ কবার জন্য ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহাকে অনেক 'শুক্রিয়া' দিলেন। তাহার পর আর একটি প্রশ্ন করিলেন।

"উজির আহমদের কোনও খবর পেলেন না ?"

"তিনি এখানে নেই। খবর পেলাম রাজমহলে ফৌজি দবকারে গেছেন ! কিছুদিন এখন ওইখানেই থাকবেন। জনাব মীরজাফর সাহেবের ভাই জনাব মীরদাউদ ওখানে ফৌজদার এখন।"

ধূর্জটিমঙ্গল আবার তাঁহাকে 'শুক্রিয়া' দিয়া ছোট একটি রেশমের থলি উপহার দিলেন। থলির ভিতর পঞ্চাশটি মোহর ছিল।

মহম্মদী বেগ সেলাম করিলেন।

"আসফ আলীর সঙ্গে দেখা করবেন কি ? যদি যান আমি নিয়ে যেতে পারি।"

"যদি যাই খবর পাঠাব আপনাকে।"

অভিবাদন করিয়া মহম্মদী বেগ চলিয়া গেলেন।

ধূর্জটিমঙ্গল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। আসফ আলির আদেশে তাঁহার কলিকাতার ঘরবাড়ি পুড়িয়াছে এ খবর যেদিন তিনি মীর মহম্মদের নিকট পাইয়াছিলেন সেইদিনই তিনি স্থির করিয়াছিলেন আসফ আলিকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ দিয়া করিতে হইবে। কিন্তু হত্যাটা তিনি নিজে করিতে চান না, কোন গুণ্ডাকে দিয়া করাইতে চান। খবর লইয়া তিনি জানিয়াছেন যে, মহম্মদী বেগ একজন নামী গুণ্ডা। নবাবের আশ্রয়ে বাস করে। অর্থের বিনিময়ে খুন রাহাজানি করাই নাকি তাহার পেশা। কিন্তু এই পেশাদার গুণ্ডাকে হঠাৎ বিশ্বাস করা উচিত কি? ধূর্জটিমঙ্গল স্থির করিলেন বন্ধু মাণিক্যপ্রধানের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিবেন। পাণ্ডব প্রধানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিক্য প্রধানের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আছে। সে বিশ্বাসযোগ্য লোকও বটে। তাঁহাকে প্রত্যহ তো তাহাদের বাড়ি যাইতেই হয়। কিন্তু মাণিক্যের সহিত তাঁহার বড় একটা দেখা হয় না। সে বাহিরে বাহিরেই বেশীর ভাগ সময় থাকে। নবাব সরকারে ইংরেজদের প্রতিনিধি ওয়াট্‌সের সহিত তাহার নাকি বড়ই হৃদ্যতা। সেদিন ভাগ্যক্রমে তাহার সহিত দেখা হইয়া গেল। মাণিক্য রূপবান লোক। ছিপছিপে লম্বা, গৌরবর্ণ, মাথায় বাবরি চুল, চক্ষু দুইটি স্বপ্নময়, সরু গোঁফজোড়া কে যেন ঠোঁটের উপর আঁকিয়া দিয়াছে। পরিধানে জরিদার ঘুন্টি দেওয়া সাদা পাঞ্জাবি, ঢিলা পায়জামা। পায়ে মখমলের আগ্রাই নাগরা, বাঁ হাতে তর্জনীর উপর একটা পোষা হরবোলা পাখী। পাখীর একটি পা কালো রেশমের ডোরা দিয়া বাঁধা, ডোরাটি তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধের উপর নিবদ্ধ। মাণিক্য প্রধানের নিজের একটি তাঞ্জাম আছে, সেই তাঞ্জামেই তিনি সর্বত্র যাতায়াত করেন। ধূর্জটিমঙ্গল যখন গেলেন তখন মাণিক্যের তাঞ্জামটি রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল। ধূর্জটিমঙ্গল অনুমান করিলেন মাণিক্য বাড়ীতেই আছে। বৈঠকখানায় কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না বৈঠকখানার বিস্তৃত ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়া পাণ্ডব প্রধান বসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সোচ্ছ্বাসে সংবর্ধনা করিলেন।

"এস, এস, এস। আজ মাণিক নতুন ঘুগনি এনেছে, তাতেই তন্ময় হয়ে আছি—"

"কি রকম ঘুগনি?"

"ফরাসী ঘুগনি। ইয়োরোপে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ বেধেছে। এদেশের ইংরেজরাও ফরাসীদের এদেশ থেকে উৎখাত করতে চায়। ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের সন্ধি হয়েছে। ইংরেজরা নবাবকে বলছে তুমি আমাদের মিত্র, সুতরাং আমাদের শত্রু তোমারও শত্রু। তুমি তোমার রাজত্ব থেকে ফরাসীদের তড়িয়ে দাও। কিন্তু নবাব মনঃস্থির করতে পারছেন না, দু'নৌকোয় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মনে মনে বুঝতে পারছেন সবাই তাঁর উপর চটা। মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, ইয়ারলতিফ, দুর্লভরাম এমন কি হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার রায় সবাই দুমুখো সাপ হয়ে বসে আছেন। রাজা মাণিকচাঁদও একটি অগ্নিগর্ভ পর্বত হয়ে আছেন। নবাব তাঁকে কয়েদ করেছিলেন, দশলাখ টাকা জরিমানা দিয়ে সে মুক্তি পেয়েছে। সে এখন তলে তলে নবাবের বিরুদ্ধে ইন্ধন যোগাচ্ছে ক্লাইভের দরবারে গিয়ে। নবাব ভাবছেন ফরাসীরা আমার সহায় আছে—কাশিমবাজার কুঠির লা সাহেব আমার বন্ধুলোক। যুদ্ধেও তরা ইংরেজদের চেয়ে কম পটু নয়—তাদের চটানো কি উচিত? এদিকে মাণিক আজ খবর এনেছে কলকাতা থেকে অ্যাডমিরল ওয়াট্সন অ্যায়সা কড়া এক চিঠি লিখেছে নবাবকে যে তাঁর চক্ষু নাকি চড়কগাছ হয়ে গেছে। ওয়াট্সন উঁচিপেঁজি লোক নয়, কোম্পানির চাকরও নয়, সে কুইনের প্রতিনিধি, ক্লাইভকেও দাবড়ি দেয়। ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজের মালিক সে। সে নবাবকে লিখেছে—আপনি যদি ফরাসীর বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য না করেন তাহলে আপনার রাজত্বে এমন আগুন জ্বালিয়ে দেব যে সমস্ত গঙ্গার জল ঢেলেও সে আগুন নেভাতে পারবেন না। নবাবের আর একটা আতঙ্ক আহমদ শা আবদালী। সে দিল্লী লুঠ করেছে কিছুদিন আগে। গুজব ছড়িয়েছিল সে বাংলাও নাকি লুঠ করবে। ভয়ে তটস্থ হয়েছিলেন সিরাজ। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে সে দিল্লী থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছে। এখানে আর আসবে না। তাই নবাবের আতঙ্ক কমেছে একটু। আর একটা খবরও এনেছে মাণিক। ক্লাইভ নাকি স্থলপথে সসৈন্যে যাত্রা করেছেন চন্দননগর আক্রমণ করবেন বলে'। তিনি বরানগরের কাছ বরাবর গঙ্গা পার হয়ে চন্দননগরের পাশে গেরিটির বাগানে তাঁবু গেড়েছেন। নন্দকুমার ওখানকার ফৌজদার। তার বাধা দেওয়া উচিত ছিস ক্লাইভকে। কিন্তু তিনি চুপটি

করে' বসে আছেন। সব তলে তলে সড়, বুঝলে? ঘুগনি কিন্তু মজাদার। হ্যাঁ, তুমি কাল চন্দ্রপুলি খেয়ে যাওনি বলে বুড়ী রেগে টং হয়ে গেছে, আজ খেয়ে যেও। তোমার জন্মে রাখা আছে।"

"মাণিক কোথা?"

"ভিতরে আছে। 'টি' নিয়ে ব্যস্ত আছে বোধহয়—"

"সে আবার কি!"

"ওয়াট্‌স্ সাহেব ওকে কালো কালো শুকনো পাতা দিয়েছে কিছু। গরম জলে ভিজিয়ে তারপর ছেঁকে দুধ আর চিনি মিশিয়ে খেতে হয়। মাণিকবাবু শৌখিন মানুষ তো, ওইসব নিয়ে থাকতে ভালবাসেন।"

ধূর্জটিমঙ্গল সোজা অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। বিরাট অন্দরমহল। প্রত্যেক ছেলের জন্মই একটা করিয়া মহল। ধূর্জটিমঙ্গল মাণিক্য প্রধানের মহলে গিয়া ঢুকিলেন।

"আরে, আরে ধুজু যে। তুমি এসেছ শুনেছি, কিন্তু তোমার দেখাই পাইনি। অথচ তুমি রোজ আস—"

"বহু ভাগ্য না হলে মাণিক্যের নাগাল পাওয়া যায় না।"

"ধূর্জটির নাগাল পাওয়া তো আরও ভাগ্যের কথা—"

জড়াইয়া ধরিলেন তিনি ধূর্জটিমঙ্গলকে।

তাঁহার হরবোলা পাখীটা নিকটেই একটা দাঁড়ে ছিল, সে সুমিষ্ট একটা শিস দিল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"শুনলাম তুমি 'টি' নিয়ে ব্যস্ত আছ।"

"হ্যাঁ, একটা নতুন জিনিস দিয়েছে ওয়াট্‌স্ সাহেব। খাবে?"

"না এখন থাক। মা আমার জন্মে চন্দ্রপুলি রেখেছেন শুনলাম, সেটা খেতেই হবে। টি পরে খাব। তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে। শুধু গোপন নয় জরুরিও। কখন তোমার সময় হবে?"

"সময়ের অভাব কি, আমি তো কারো চাকরি করি না।"

হরবোলা পাখী করুণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ফটি—ক জল', 'ফটি—ক জল'। তাহার পরই বুলবুলের স্বরে বলিল—'কৃষ্ট প্রিয়' তাহার পরই আবার ফিঙের মতো—মেকি কি, মেকি কি।

"চুপ কর ফক্কোড় কোথাকার!"

পাখীকে ধমক দিলেন মাণিক্য প্রধান। পাখীটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার কাঁধে বসিয়া বলিল—'বউ কথা কও'।

"কি দুষ্টু দেখেছ—"

"চমৎকার হরবোলাটি, সাধারণতঃ লোকে বুলবুল পোষে, তুমি এ হরবোলা পেলে কোথায় ?"

মাণিক্য এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন, "নাজমা উপহার দিয়েছে।"

"নাজমা ? যার কাছে আসফ আলি থাকে ?"

মাণিক্য আরও নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"আসফ আলি ওর ভরণপোষণ করে, আমি করি চরণতোষণ। চুপ, এ আলোচনা এখানে নয়। এখানে গোপন কথা বলা যায় না। কি গোপন পরামর্শ করবে বলছিলে ? তুমিও জুটিয়েছ নাকি কাউকে—"

"আমার তো মৈনি আছেই। না সে সব কথা নয়, অন্য কথা।"

"খুব গোপনীয় ?"

"খুব গোপনীয়।"

'তাহলে এখানে নয়। তোমার বাসায় চল। জাফরাগঞ্জে লাল কুঠিটাতে আছো ত ?'

"হ্যাঁ।"

"কে আছে সেখানে ?"

"ঝকমারি আর বারাহী। মনে আছে ওদের ?"

"মনে আছে বোধহয়। মন তো ভাই এইটুকু, আর মনে রাখবার মতো জিনিস রাশি রাশি। সব আঁটে না তাই। তারা কি যুবতী হয়েছে ?"

"বারাহীর তো বিয়েই হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। আর ঝকমারি বিয়ে করেনি। পুরুষের পোষাক পরে' থাকে, বলে লড়াই করব। আমার ঠাকুর্দার ডাকাত বন্ধু ভোজপুরী ঝঞ্ঝার সিংয়ের দৌহিত্রী।"

"তোমার বাসায় ফাঁকা ঘর নিশ্চয় পাওয়া যাবে একটা ?"

"তা যাবে।"

"তাহলে তোমার বাসাতেই যাওয়া যাক চল।"

"বেশ। আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করে' আসি তাহলে।"

মায়ের মহল একেবারে আলাদা। সেখানে উঠানেই শ্বেত-প্রস্তর নির্মিত একটি শিবমন্দির। সেই মন্দিরটিকে ঘিরিয়া একটি চকমিলানো ছোট বাড়ি নীচে প্রশস্ত দালানে নাতি-নাতনী পৌত্র-পৌত্রীর দল খাইতে বসিয়াছে কনিষ্ঠ বধূটি পরিবেশন করিতেছেন। দালানের মাঝখানে একটি উচ্চাসনে ব'সিয়া আছেন মা। তিনি খাওয়ার তদারক করিতেছেন। ধূর্জটিমঙ্গল গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি ভৎ'সনার সুরে বলিয়া উঠিলেন—"তুই কাল না খেয়ে পালিয়ে গেলি যে বড়। তুই চন্দ্রপুলি ভালোবাসিস বলে' কাল তোর জন্যেই চন্দ্রপুলি করেছিলাম, আর তুই না খেয়েই চলে গেলি?"

"দিন, এখন খাব।"

"বৌমা, ধূজুকে এই খানেই একটা ঠাঁই করে দাও।"

ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিয়াই বধূটি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল শাশুড়ীর আদেশে সে একটি কার্পেটের আসন বিছাইয়া দিল।

"রূপোর থালায় ওর জন্যে পাঁচগণ্ডা চন্দ্রপুলি আলাদা রেখে দিয়েছি। রেকাব ঢাকা আছে। সেইটে নিয়ে এস। পায়েসও দাও একবাটি আর বাগান থেকে যে কোহিতুর আম এসেছে তাই দাও গোটাকতক। ভালো বেগমপসন্দ যদি থাকে তাও এনো—"

ধূর্জটিমঙ্গল একটু প্রতিবাদ করিতে গেলেন—"মা এখন অত—"

ধমকাইয়া উঠিলেন মা।

"কথাটি বলতে পারে না। এমন কিছু বেশী দিচ্ছি না।"

ধূর্জটিমঙ্গল আর প্রতিবাদ করিলেন না।

একটু পরে বধূটি কুড়িটি চন্দ্রপুলি, এক জামবাটি পায়েস, পাঁচটি কোহিতুর এবং পাঁচটি বেগমপসন্দ আম তাঁহার সামনে সাজাইয়া দিল। ধূর্জটি নীরবে খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলি শেষ করিয়া ফেলিলেন।

"চন্দ্রপুলি কেমন লাগল?"

ধূর্জটিমঙ্গল সংক্ষেপে বলিলেন—"অমৃত।"

মাণিক্যপ্রধান এবং ধূর্জটিমঙ্গল জাফরাগঞ্জের বাসায় একটি নির্জন ঘরে বসিয়াই আলাপ করিতেছিলেন। সমস্ত শুনিয়া মাণিক্যপ্রধান বলিলেন—"তুমি আসফ আলিকে হত্যা করবেই ঠিক করেছ?"

"কেন, তোমার আপত্তি আছে ?"

"আমার আপত্তি থাকবে কেন! কি আশ্চর্য, সৎকার্যে আমি আপত্তি করিছি কখনও ?"

হরবোলটা তাঁহার হাতের উপর বসিয়াছিল। মাণিক্য তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—"আমি সৎকাজে কখনও আপত্তি করি ?"

হরবোলা উত্তর দিল—"রামঃ রামঃ রামঃ।"

মাণিক্যপ্রধান বলিলেন—"পাপীকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। আমি ভাবছি ছুরি দিয়ে হত্যা করবে, না পুড়িয়ে মারবে—"

"পুড়িয়ে মারার অনেক ঝঞ্ঝাট। আমি লোক লাগিয়ে হত্যা করতে চাই এবং হত্যা করবার আগে তাকে জানিয়ে দিতে চাই কেন তাকে হত্যা করা হল। মহম্মদী বেগ লোকটাকে কাজে লাগাব কিনা সেইটেই জানতে চাই।

"গুণ্ডা হিসাবে ভাল। কাজ ঠিক হাসিল ক'রে দেবে। কিন্তু খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর কারো কাছে টাকা খেয়ে তোমার নামটা প্রকাশ ক'রে দেবে হয়তো। তার চেয়ে এক কাজ কর—"

"কি—"

ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ বেধেছে চন্দননগরে। ফরাসীদের সাহায্য করবার জন্য নবাব কিছু সৈন্য মোতায়েন রাখতে বলেছেন নন্দকুমারকে। আসফ আলি সেই সৈন্যদলে থাকবে। ইংরেজদের দলেও দেশী সিপাহী অনেক আছে। সেই সিপাহীদের মধ্যে আছে চক্রধর কপাট। যেমনি জোয়ান তেমনি নিষ্ঠুর। তাকে আমি হাত করতে পারি। পঞ্চাশটা কিংবা জোর একশ'টা মোহর কবলালে সে সোজা গিয়ে আসফ আ[illegible] করে আসবে। সবাই জানবে আসফ আলি যুদ্ধে মারা গেছে।"

"কিন্তু আমি তাকে জানাতে চাই যে আমি তাকে তার পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি।"

"তাহলে একটা চিঠি লিখে ফেল। লেখ—জনাব আসফ আলি খাঁ তুমি আমাদের ঘর পুড়িয়ে যে পাপ করেছ, তার জন্যে আমি তোমাকে শাস্তি দেব। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক।' নীচে কোন নাম দেবার দরকার নেই। এ চিঠি আমি আসফ আলির কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।"

"আমি এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি।"

"কিন্তু তোমার না লেখাই ভালো। আর কাউকে দিয়ে লেখাও।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"এ বাড়িতে আমি ছাড়া ফার্সি কেউ জানে না। নীলু জানত। কিন্তু সে তো এখানে নেই।"

"উর্দুতে লিখলেও চলবে—"

"ঝকমারি উর্দু জানে। বাবা ছেলেবেলায় ওকে উর্দু শিখিয়েছিলেন।"

"কিন্তু ঝকমারি মেয়েছেলে, তাকে বিশ্বাস করবে?"

"আমার যাতে অনিষ্ট হয়, সে এমন কিছু কখনও করবে না।"

"কুর্‌র্‌র্‌র্—।"

একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ শব্দ করিয়া হববোলা মাণিক্যপ্রধানের স্কন্ধে আরোহণ করিল।

মাণিক্যপ্রধান হাসিয়া বলিলেন—"এর মানে ওর ক্ষিধে পেয়েছে, আমাকে বাড়ি যেতে হবে—"

"কি খায় ও? এখানেই ওর খাবার দিচ্ছি—"

"ওর খাবার তুমি দিতে পারবে না। ও খায় মাকড়শা, উচ্চিংড়ে, মধু আর পেস্তা কিসমিস। ওর চাকর ভেড়ুয়া ওর খানা তৈরী করে। তুমি ডাক না না ঝকমারিকে। তাকে দিয়ে আমি চিঠিটা লিখিয়ে নিয়ে চলে' যাই।"

ডাকিতেই ঝকমারি আসিল। সে পাশের ঘরেই ছিল। পুরুষের বেশেই ছিল সে। পাঞ্জাবি ও চুস্ত পাজামা পরিয়া চমৎকার দেখাইতেছিল তাহাকে।

মাণিক্য হাসিয়া বলিলেন—"পুরুষ বেশে চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে। ধুজু বলছিল তুমি নাকি লড়াইয়ে যেতে চাও?"

ঝকমারি সাগ্রহে বলিল—হ্যাঁ। চাই। আমি নবাবদের বিরুদ্ধে লড়ব। ব্যবস্থা করে' দিতে পারেন?"

"তা পারি। আমার দূর সম্পর্কের ভাই বলে পরিচয় দিলে ওয়াট্‌স তোমাকে সুপারিস করে কালা ফৌজে ভরতি করিয়ে দিতে পারে। বলব তাকে?"

"হ্যাঁ, বলুন বলুন।"

ধূর্জটিমঙ্গল মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

"উর্দু লিখতে জান?"

"জানি—"

"তাহলে এই চিঠিটা নকল করে' আন দেখি। ধুজু চিঠিটা লিখে ফেল তুমি।"

ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন এবং চিঠিটা লিখিয়া লইয়া আসিলেন।

"এইটে নকল করে' আন তুমি—"

ঝকমারি একটু অবাক হইয়া গেল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করিল না। চিঠিটা লইয়া পাশের ঘরে গেল এবং নকল করিয়া আনিল।

হরবোলা আবার বলিল—কুর্‌র্‌র্‌র—।

"এর ক্ষিধে পেয়েছে। আমি এখন উঠি। পরে আসব—"

"আমাকে ফৌজে ঢুকিয়ে দেবেন?"

ঝকমারি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল আবার।

"ধুজু যদি রাজী হয়, চেষ্টা করতে পারি!"

ধূর্জটিমঙ্গল হাসিয়া উত্তর দিলেন—"পাগল নাকি!"

মাণিক্যপ্রধান বলিলেন—"আচ্ছা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাও তাহলে। আমি তোমাকে একটা ফৌজি পোশাক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেইটে পরে' বাড়িতেই ঘোরাফেরা কর। পোশাক আমার বাড়িতেই আছে, এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

হরবোলা আবার বলিল—কুর্‌র্‌র্‌র্‌

"যাচ্ছি যাচ্ছি, চল। ক্ষিদে পেলে একদণ্ড তিষ্ঠুতে দেবে না কোথাও।"

মাণিক্যপ্রধান চলিয়া গেলেন।

ঝকমারি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—"আসফ আলি নামটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ আসবার সময় জঙ্গলে মীর মহম্মদের কাছে শুনেছিলাম এ লোকটা আমাদের ঘরবাড়িতে আগুন দিয়েছিল। একে শাস্তি দেব।"

"আমাকে যুদ্ধে যেতে দাও, আমিই ওকে শাস্তি দেব।'

"এই তুচ্ছ কাজের জন্য তোমাকে এত বড় সর্বনাশের ভিতর পাঠাতে পারি না।"

"আমিও তো তুচ্ছ। আমি তোমার জীবনে বাধা একটা। আমি

তো তোমাদের কোনও কাজেই লাগিনি। এই কাজটি করতে দাও আমাকে—'

"না, তুমি পবিত্র, মহিমময়ী তোমাকে দিয়ে আমি নরহত্যা করাতে পারি না।"

"মা কালীও তো নারী, তিনি তো—"

"তিনি দেবতা, তুমি মানুষ। তফাত অনেক। আসফ খাঁ মরবে, কিন্তু তার সঙ্গে তোমাকেও মরতে দিতে পারি না।"

'আসফ খাঁকে মারবার অধিকার আমারই আছে। প্রথম যেদিন সেই অন্ধকার গুহায় ওই নামটা শুনেছিলাম সেইদিনই যেন আমার মনের অন্ধকার গুহায় একটা সাড়া জেগেছিল। তখন বুঝতে পারিনি এখন পাচ্ছি। এখন সেই যুদ্ধক্ষেত্রটা দেখতে পাচ্ছি আমি—"

ঝকমারি সামনের আসনটায় বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর দুলিতে লাগিল ধীরে ধীরে।

"আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি রানী দুর্গাবতীকে। রাজপুত চন্দেল বংশের উজ্জ্বল মহিমা, মাহোবারাজের বীর কন্যা, গড়মণ্ডলাধিপতির মহারানী দুর্গাবতীকে দেখতে পাচ্ছি আমি। আমিই দুর্গাবতী। আমি বিধবা হয়েছি। স্বামী চারবছর আগে মারা গেছেন। আমার রাজ্য আক্রমণ করেছেন সম্রাট আকবর। অনেক সৈন্য নিয়ে এসেছে সেনাপতি আসফ খাঁ। আমি হাতীর পিঠে চড়ে' সেনা পরিচালনা করছি তার বিরুদ্ধে। হঠাৎ দুটো তীর লাগল আমার মুখে। একটা তীর আমার চোখে বিঁধল। এই দেখে আমার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল। আমি বার বার ডাক দিলাম সবাইকে ফেরো, ফেরো, ফেরো তোমরা। কেউ ফিরল না। নিরুপায় হ'য়ে মাহুতের হাত থেকে ছোরা নিয়ে আত্মহত্যা করলাম তখন। আসফ খাঁর সৈন্য গড়মণ্ডল অধিকার করল, কিন্তু আমাকে অধিকার করতে পারল না। সেই আসফ খাঁ আবার আমাদের ঘর পুড়িয়েছে, এবার তাকে আমিই শাস্তি দেব। আমিই শাস্তি দেব—"

ঝকমারি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে তুলিয়া বিছানায় শোওয়াইয়া দিলেন।

ঝকমারি সমস্ত দিন অজ্ঞান হইয়াই রহিল। অজ্ঞান অবস্থায় বিড়বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। কারণ যে ভাষায় সে বলিতেছিল সে ভাষা বাংলা ভাষা নয়। ইহা দেখিয়া বারাহীরও কেমন যেন মাথা খারাপ হইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল— মর মর মর, মরে শান্তি পা। এদেশে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে আর নিস্তার নেই। মরতেই হবে। আমি মরব। কিন্তু কংসকে মেরে তারপর মরব।"

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে আলাদা একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। বিপদের সময় ধূর্জটিমঙ্গল বিচলিত হন না। তিনি ঝকমারির মাথার শিয়রে বসিয়া বার বার তাহার চোখে মুখে, চুলে গোলাপের আসব সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। ঝকমারিকে সেবা করিতে পারে এরকম দাসী বাড়িতে ছিল, কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গল কোনও দাসী নিযোগ করিলেন না, নিজেই তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ মৈনিবিবি আসিয়া হাজির। তাহার সর্বাঙ্গে সাদা মসলিনের অপরূপ ওড়না, পিছনে জরির ফিতা জড়ানো বেণী, চোখে সুরমা; মুখে মৃদু হাসি। ছিপছিপে কালো দেহটি ঘিরিয়া যে স্নিগ্ধতা বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহা স্থূল নহে সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম।

ধূর্জটিমঙ্গলের কাছে আসিয়া সে বলিল "রাজা, কি হয়েছে? এতবারও যাননি কেন আমার কাছে?"

"বড় ব্যস্ত আছি —"

"এ কে?"

"আমাদের পরিবারেরই একজন। বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ধূর্জটিমঙ্গল খসখসের হাতপাখা দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন মৈনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নীরবে কি যেন হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহার পর বলিল, "আমি তাহলে যাই। ওস্তাদ কেরামত ফিরে এসেছেন, সেই খবরটা দিতে এসেছিলাম। আমি চললাম।"

"যাচ্ছ কেন, বস না।"

"না এখন বসা ঠিক হবে না।"

মৈনি চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারির শয্যাপার্শ্বে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ঝকমারির জ্ঞান হইল, ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল সে। তাহার পর পাশ ফিরিয়া শুইল।

একটু পরেই মাণিক্যপ্রধানের একটি দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার হাতে একপ্রস্থ ফৌজি পোশাক এবং একটি পত্র। মাণিক্যপ্রধান উর্দুতে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম—চন্দননগরে যুদ্ধ লাগিয়া গিয়াছে। নবাব সাহেব ফরাসী লা সাহেবকে কাশিমবাজার কুঠি ছাড়িয়া পাটনায় চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। আসফ আলি খাঁকে পত্র পাঠাইয়াছি। উজির আহম্মদ এখানে নাই। রাজমহলে আছে। ওস্তাদ কেরামত আসিয়া তাহার সেই পুরাতন পোড়ো বাড়িটাতে উঠিয়াছে। আমি সন্ধ্যায় সেখানে যাইব। তুমি আসিলে কেরামত খুশী হইবে। ঝকমারির পোশাক পাঠাইলাম। পত্রপাঠ শেষ করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল ঝকমারিকে বলিলেন—মাণিক তোমার জন্যে ফৌজি পোশাক পাঠিয়েছে।

ঝকমারি সোৎসাহে উঠিয়া বসিল।

"তাই নাকি। কই দেখি—"

পোশাক লইয়া সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল মাণিক্যের পত্রটি আর একবার পাঠ করিলেন। তাহার পর উঠিয়া সন্তর্পণে বারাহীর ঘরের শিকলটি খুলিয়া দেখিলেন পাগলী অঘোরে ঘুমাইতেছে। সন্তর্পণে শিকলটি আবার তুলিয়া দিলেন তিনি। ফৌজিসাজে সাজিয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল ঝকমারী। তাহার একমুখ হাসি, চক্ষু দুইটি উদ্ভাসিত।

"গায়ে ঠিক হয়েছে?"

"খুব ঠিক হয়নি। একটু ঢিলে হয়েছে। কিন্তু এতেই চলে যাবে।"

"সিপাহীজি, তুমি তাহলে বারাহীকে পাহারা দাও। আমি কেরামতের সঙ্গে একটু দেখা করে' আসি।"

"বেশ।"

মুর্শিদাবাদ শহরের বাহিরে একটি বাগানের মধ্যে ছোট একটি বাড়ি। তাহাতে শামাদানে ছোট একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। প্রদীপের সামনে একটি শতরঞ্চি পাতা। সেই শতরঞ্চির উপর গেরুয়া রঙের একটি আলখাল্লা পরিয়া কেরামত সারেঙ্গী বাজাইতেছিল। কেরামত কন্দর্পকান্তি, কিন্তু

তাহার রূপের মধ্যে লালসার কোন আভাস নাই। তাহা যেন অতি পবিত্র, দেখিলেই সম্ভ্রম জাগে। যদিও তাহার পোশাক অতি সাধারণ, যদিও তাহাব অঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই, যদিও তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত গোঁফদাড়িতে আতর বা অন্য কোন সুগন্ধের চিহ্ন মাত্র নাই, তবু তাহাকে ঘিরিয়া এমন একটি আভিজাত্য বিরাজ কবিতেছিল যাহা দুর্লভ। মনে হইতেছিল অদৃশ্য এক সিংহাসনে একজন সম্রাট যেন বসিয়া আছেন। সামনে আর একটি ছোট আসনে পুতলিবিবি পুতুলেব মতই বসিয়া ছিল। তন্ময় হইয়া বাজনা শুনিতেছিল সে। তাহার যেন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। বাজনা শেষ করিয়া কেরামত তাহার দিকে চাহিতেই সে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। কেরামতের বাজনা শোনার পর পুতলি বরাবরই সেলাম করে। বলে—সুরের যে হুরী আসিয়া এতক্ষণ আনন্দ বিতরণ করিয়া গেল তাহাকেই কুরনিশ করিলাম। পুতলি নিজেও একটি মূর্তিমতী সুর। অপরূপ রূপসী তো বটেই তাহার ধবনধারণও অনন্য। কথা খুব কম বলে। কিন্তু তাহার কম্পমান অধব, তাহার চকিত দৃষ্টি, কপালের উপব ক্রীড়াশীল তাহাব চূর্ণ অলকদাম, তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলেব সদা-উন্মুখ ভাব, তাহাব ঈষৎ বিস্ফাবিত নাসারন্ধ্র তাহাকে যে অবর্ণনীয় শ্রী-শোভায় মণ্ডিত করিয়াছে, একমাত্র সুরের সহিতই তাহা উপমেয়।

কেরামত বলিলেন—"এইবার তুমি তোমার বীণা শোনাও।"

ইহাদের কথাবার্তা উর্দুতেই হয়, আমি বাংলা অনুবাদ কবিয়া দিতেছি।

"আপনার সারেঙ্গীর পর আমার বীণা জমবে না।"

কেরামত হাসিয়া বলিলেন—"পুতলি এ কথাটা তুমি বিশ্বাস কব না কেন যে, তুমি আমাব চেয়ে অনেক বড় বাজিয়ে?"

পুতলি আবার অভিবাদন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"শুক্রিয়া। খোদাতালা কিন্তু আমার উপব একটি মেহেরবানি কবেছেন, আমার আসল 'কিমৎ' কি তা বোঝবার বুদ্ধিটুকু আমায় দিয়েছেন।"

"আচ্ছা, তবে ওকথা যাক সরফুদ্দিনকে দেখতে যাবে কি? খবর পেয়েছি ধুজু তাকে খুব আবামেই রেখেছে। এখানকাব মাদ্রাসায় সে পড়াশোনা করছে। একজন ভালো মৌলভীসাহেব তার দেখাশোনা করেন। ধুজু সব ব্যবস্থা করে' দিয়েছে।"

পুতলি নতমুখে নীরবে রহিল খানিকক্ষণ।

তাহার পর বলিল—"হুজুর যা করতে বলবেন, তাই করব।"

কেরামত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—দেখ আমার মতে ওর সঙ্গে আর দেখা না করাই ভালো। আমরা দুজনেই দেওয়ানা, আমরা যা খুঁজছি তা হয়তো ইহজীবনে পাব না। কিন্তু খুঁজতে হবে তবু। আমরণ খুঁজতে হবে। সুরের সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েছি। চিরকাল ভেসেই যেতে চাই। কোন পিছটান থাকলে ভাসা যাবে না। আমরা ঢোলখণ্ডে সেই চাষার বাড়িতে খুব আনন্দে ছিলাম। এখানে ফিরে এসেছি সরফুদ্দিনের একটা ব্যবস্থা করবার জন্যে। ধুজু ওর সব ব্যবস্থা করেছে। ধুজু আমাকে বলেছিল—ওর ভার আমি নিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। লালবাগের কাছে আমার কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি আছে। ভাবছি ধুজুর নামেই সেটা লেখাপড়া ক'রে দিয়ে যাব। সেইজন্যেই এখানে এসেছি। কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে, তুমি ওর মা, তুমি কি ওকে ছেড়ে যেতে পারবে?"

পুতুলি বলিল—"আপনি যদি পারেন, আমিও নিশ্চয় পারব। আপনিই সরফুদ্দিনকে আমাকে দিয়েছিলেন, সরফুর চেয়ে আপনি আমার কাছে বড়। আপনি যদি সরফুকে ছেড়ে থাকতে পারেন, আমিও পারব।"

"একবারও দেখা করবে না?"

"দেখা করলে হয়তো দুর্বল হয়ে পড়ব। আপনি ঠিকই বলেছেন, দেখা না করাই ভালো। আমার কিন্তু একটা ছবি প্রায়ই মনে পড়ে ঢোলখণ্ডের রাস্তার ধারে সেই যে ছোট্ট নদীটা ছিল। নদীর ধারে সামান্য জঙ্গল ছিল একটু। আমরা শিকারপুর থেকে ফিরছিলাম, রাস্তায় সন্ধ্যা হয়ে গেল, আকাশে চাঁদ উঠল। হঠাৎ দেখি নদীর ধারে একটা বাঘিনী তার তিনটে বাচ্চাকে নিয়ে খেলা করছে। আমরা চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলাম গাছের ছায়ায়। দেখতে লাগলাম সেই বাঘিনী আর তার বাচ্চা তিনটেকে, কি সুন্দর যে লাগছিল! এ ছবিটা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তোমার পড়ে না?"

"পড়ে বইকি। তার চেয়ে আরও সুন্দর একটা ছবির কথাও মনে পড়ে বড়লোকের মেয়ে পুতলিবিবি গরীবের 'কুটিয়া'য় বসে' বীণা বাজাচ্ছে

ভুলে গেছে তার ঐশ্বর্যের কথা, ছেলের কথা, সুর ছাড়া আর সবকিছুর কথা।"

পুতলিবিবির চোখ দুইটিতে অশ্রু টলমল করিতে লাগিল। কোন কথা না বলিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল সে। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না, বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল সে।

মাণিক্য ও ধূর্জটি প্রবেশ করিলেন।

"আরে আরে এস এস, আমিই যে তোমাদেব ওখানে যাব ভাবছিলাম। আমি যে এখানে এসেছি সে খবর কি করে' পেলে?"

"মৈনি খবব দিয়েছে। তুমি কি মৈনিব বাড়িতে গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম। সে আমার প্রিয় ছাত্রী। এখানে এসে তাব স‌ঙ্গে দেখা না কবলে সে বড অভিমান কবে। তার কাছেই গিয়েছিলাম খালি, আর কোথাও যাইনি।"

ধূর্জটিমঙ্গলের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার কাছে যাব মৈনিকে বলেছিলাম। মৈনি বললে তুমি কোথায় কখন থাক ঠিক নেই। মাণিকেরও পাত্তা পাওয়া নাকি শক্ত। শুনলাম ইংরেজদের গোলা পড়ছে চন্দননগরে, নবাবের সৈন্য যাচ্ছে চন্দননগরের দিকে। সাজ সাজ রব পড়ে গেছে চতুর্দিকে। আমি বিব্রত হয়ে পড়েছি। ভাবছি কালই চলে যাব এখান থেকে।"

"সরফুর সঙ্গে দেখা করবে না?"

"না। তুমি তো ওকে সুখে রেখেছ শুনলাম। আমরা দেখা করে' হয়তো মায়াব ফাঁদে আটকে যাব। সে ইচ্ছে নেই।"

"কোথায় যাবে তোমরা?"

"জঙ্গলে। টনকপুরে এক বুড়ো চাষীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ভালো গান গায়। তার সঙ্গে দোস্তি হয়ে গেছে। তারও কেউ নেই। বুড়ো হয়ে গেছে বেচারা। নিজে রান্নাবান্না করতে পারে না। ঠিক হয়েছে পুতলি তার রান্না করে' দেবে, আর আমি তার ক্ষেত পাহারা দেব। আব সময় পেলেই তিনজনে মিলে পাড়ি দেব সুরের সমুদ্রে। এখানে এসেছি তোমাকে একটা জিনিস দেব বলে।"

কেরামত উঠিয়া গেল এবং ভিতর হইতে লাল কাপড়ে জড়ানো ছোট একটি কাগজের পুলিন্দা লইয়া আসিল।

"এই নাও।"

ধূর্জটিমঙ্গলের হাতে পুলিন্দাটি দিল সে।

"কি এটা—"

"আমার ঠাকুর্দাকে নবাব সুজাউদ্দিন লালবাগের কাছে ছোটখাটো একটা জায়গীর দিয়েছিলেন। সেখানে আমাদের প্রায় তিনশ' বিঘে জমি আছে, একটা বাড়ি আছে, বাগান আছে, পুকুরও আছে একটা। বাবা ওই বাড়িতেই ছিলেন, আমারও ছেলেবেলা ওখানে কেটেছে। এখন ওটা প্রায় বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে আছে। তোমাকেই ওটা দিয়ে যাচ্ছি। ওর কোবালা, কাগজপত্তর, সুজাউদ্দিনের হুকুমনামা, সব এর মধ্যেই আছে। আমিও লিখে দিয়েছি আমি সমস্ত তোমাকে দান করলাম। এখন তুমি ওটা নিয়ে যা খুশী কর। আমি এসব ভার বইতে পাচ্ছি না।"

"আমি নিয়ে কি করব। নিজের বিষয়ই আমি সামলাতে পারি না। নীলু সব দেখে—"

"নীলু কোথা এখন?"

"সে জঙ্গলমহালে ধলরাজার রাজ্যে আছে। তুমিই গিয়ে নিজের বাড়িতে বাস কর—"

"না, এদেশে বড় গোলমাল। এদেশের আবহাওয়ায় সুর নেই, আছে খালি হাল্লা। আমার ভালো লাগছে না। তুমি আমার ছেলে শরফুকে নিয়েছ, আমার বিষয়টাও নাও। আমরা টনকপুর চলে' যাই।"

"টনকপুর কোথা?"

"হিমালয়ের নীচে। চমৎকার জায়গা। আর সেই বুড়ো আবিদ মিঞা বড় ভালো গান গায়। শুনবে তার একটা গান?"

কেরামত সারেঙ্গী তুলিয়া সারেঙ্গী বাজাইতে বাজাইতে গাহিতে লাগিল।

ময় দেওয়ানা হুঁ
ময় একই খবর লায়া হুঁ
খুদা কি মেহেরবানি
ফুল হোকর খিলতি হ্যয়

বহি ফুল দো মুঝকো
ফুল চুননে আয়া হুঁ
ময় একই খবর লায়া হুঁ
ময় দেওয়ানা হুঁ ।

মাণিক্যের হরবোলা গান শেষ হইবামাত্র সুমিষ্টকণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'দেওয়ানা হুঁ'।

কেরামত সহাস্যদৃষ্টিতে পাখীটির দিকে চাহিয়া বলিল—"বাঃ দোস্ত। তোমার গলা আমার চেয়েও মিষ্টি।"

ধূর্জটি গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন।

মাণিক্য বলিলেন—"দেখ, ভাই কেরামত, তোমার মতো বন্ধু যে আমাদের ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাবে এ আমরা সহ্য করব না। তুমি শহরে না থাকতে চাও পাড়াগাঁয়ে চল। কৈঁকালাতে আমার যে জমিদারি আছে সেখানে কোন গোলমাল নেই। চল সেখানেই তোমার ব্যবস্থা করে' দিই।"

"আমি ভাই এদেশে থাকতে পারব না। তাছাড়া আবিদ মিঞা আমার পথ চেয়ে থাকবেন! আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছি ফিরে যাব। আমাকে যেতেই হবে।"

"কিন্তু তোমাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে টাকাকড়ি আছে?"

"আছে কিছু। খুব বেশী নয় অবশ্য—"

"কম টাকা নিয়ে অতদূর যাবে কি করে'? হেঁটে যাবে?"

কেরামত কিছু বলিল না, হাসিল কেবল।

মাণিক্য বলিল—"বেশ, যাবে যাও। কিন্তু একটি শর্তে তোমাকে যেতে দেব। তোমার সঙ্গে আমরা কিছু টাকা দিয়ে দেব। দুজন হাতিয়াবন্দ লোকও সঙ্গে থাকবে আর একটা বড় পালকি—"

ধূর্জটিমঙ্গল গম্ভীর হইয়াই রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

"ধুজু তুমি কিছু বলছ না যে?"

"বলবার তো কিছু নেই। আমি নিজে চিরকাল নিজের মতে নিজের পথে চলেছি। কেরামতও যদি তাই চলতে চায় আমি বাধা দেব কেন।

তবে তুমি যা বলেছ সেটা ঠিক। ওকে নিঃসহায়ভাবে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওর সঙ্গে দুজন রক্ষী, একটি বড় পালকি আর কিছু টাকা অবশ্যই দিতে হবে। সব খরচ আমাদের। কেরামত তুমি কি কালই যাবে?"

"কালই যাব। কিন্তু ভাই আমার জন্যে এতসব করছ কেন—"

ধূর্জটিমঙ্গল উত্তর দিলেন—"এর জবাব দেব না। যা ঠিক করেছি তা করবই। তোমাকে আমরা বাধা দিইনি, তুমিও আমাদের বাধা দিও না। তবে ইচ্ছে করলে তুমি আমার একটি উপকার করতে পার। শুনেছি কারাধ্যক্ষ তুর্বক আলি তোমাকে খুব খাতির করেন। আমার এক বন্ধু জন সাহেব বিনা দোষে কয়েদ হয়ে আছেন। তাকে আমি উদ্ধার করতে চাই। তুমি তুর্বক আলিকে একটা চিঠি লিখে দেবে? সেই চিঠি নিয়ে আমি তাঁব সঙ্গে দেখা করব।"

"আমি চিঠি লিখে তোমাকে আমাব বন্ধু বলে' তার সঙ্গে পরিচয় কবিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কাজ হাসিল করতে হলে শুধু আমার চিঠিতে হবে না। ঘুষ দিতে হবে।"

"দেব।"

"বেশ, চিঠি নিয়ে যেও তাহলে।"

মাণিক্য বলিলেন—"এবার একটু গানবাজনা হোক। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে।"

"সাবেঙ্গী ছাড়া আমি কিছু আনিনি।"

"সারেঙ্গীই বাজাও।"

কেরামত সাবেঙ্গী বাজাইতে শুরু করিল।

দেখিতে দেখিতে সুবের এমন এক মায়ালোক চতুর্দিকে মূর্ত হইয়া উঠিল যে, ধূর্জটি ও মাণিক্য উভয়ে ভুলিয়া গেলেন তাঁহারা মুর্শিদাবাদ শহরে সামান্য একটা শতরঞ্জিতে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মনে হইল তাঁহাবা গন্ধর্বলোকে স্বপ্নবিহার করিতেছেন। মুখর হরবোলা পাখীটাও মাণিক্যের স্কন্ধে নীরবে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন ঝকমারি বারাহী কেহ নাই। চাকর একটি চিঠি দিল। ঝকমারির চিঠি। ঝকমারি লিখিয়াছে—"আমি যুদ্ধে চললাম। জগন্নাথ কলকাতা থেকে এসেছিল। বারাহীর স্বামী

মৃত্যুশয্যায়। তিনি তাকে দেখতে চান, জগন্নাথ একটা ছিপ নিয়ে এসেছিল। সেই ছিপে চড়ে' বারাহীও চলে গেছে। আমি ফিরব কিনা জানি না। যদি না ফিরি দুঃখ কোরো না। তোমাকে দেবতা বলে' জানি। দেবতার কাজে যদি আত্মবলি দিতে পারি তাহলে কৃতার্থ হব। আমার প্রণাম জেনো। বৌদিকেও অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি। তিনি সতীলক্ষ্মী, তিনি দেবী। জানি না আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কিনা।'

ধূর্জটিমঙ্গল নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১১

উমিচাঁদের জমাদার জগন্নাথ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সাবর্ণচৌধুরীরা নামী লোক ছিলেন। উমিচাঁদের জমাদার হিসাবে সে তাহাদের বাড়িতে কয়েকবার গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই আত্মীয় হংসেশ্বরের পরিবারকে সে চিনিত না। ধূর্জটিমঙ্গলের নিকটই ইহাদের সব বৃত্তান্ত সে শুনিল। ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে বলিলেন—ওই বংশের কুলাঙ্গার কংসকে ধ্বংস করিতে হইবে। সে আমার বোনের সম্ভ্রমই শুধু নষ্ট করে নাই সে তাহাকে মুসলমান ফৌজরূপী নেকড়েগুলোর হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। বারাহী ফিরিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে এখন উন্মাদিনী। তাহার মুখে এক বুলি—'কংসকে খুন করব।' তাহাকে আমি আশ্বাস দিয়াছি তাহার বাসনা আমি ' র্ণ করিব। কিন্তু সে মেয়েমানুষ, ক-সকে হত্যা করা তাহার সামর্থ্যে কুলাইবে না। তাহার সহিত কংসের যোগাযোগ করাও সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। তুমি ইহার একটা ব্যবস্থা কর। টাকা যাহা লাগে আমি দিব। বেশ কিছু টাকা লইয়া জগন্নাথ কলিকাতা গিয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া দেখিল কলিকাতায় বেশ একটা উত্তেজনা। লালমুখ গোরা পলটনরা সর্বত্র সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে। তাহাদের দেখিলেই দেশী কালো আদমীরা যে যেখানে পারিতেছে আত্মগোপন করিতেছে। জগন্নাথ আসিয়া বেহালায় হংসেশ্বরদের বাড়িতেও গিয়াছিল, সাবর্ণচৌধুরীদের পরিচয়ের সুবাদেই গিয়াছিল সেখানে। বলিয়াছিল চৌধুরীবাবুরা আপনাদের খবর লইতে

পাঠাইয়াছেন। কিন্তু গিয়া চাকরবাকরদের মুখে যাহা সে শুনিল তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য। হংসেশ্বর সত্যই মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পাছে সহমৃতা হইতে হয় এই ভয়ে তাঁহার পত্নীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ছেলেমেয়ে লইয়া কে কোথায় যে সরিয়া পড়িয়াছেন তাহা বোঝা যাইতেছে না। হংসেশ্বরকে সেবা করিবার লোক নাই। দিবারাত্রি তিনি বারাহীকে স্মরণ করিতেছেন। জগন্নাথ আর একটি সংবাদও সংগ্রহ করিল। কংস নবাবপক্ষ ত্যাগ করিয়া এখন নাকি ইংরেজ পক্ষে ভিড়িয়াছেন। একজন ইংরেজ ব্যবসায়ীর সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। কংস এখন তাহার ব্যবসার অংশীদার। একটি ইংরেজ পাদ্রীর সহিতও মাখামাখি করিয়াছে কংস। অনেকের ধারণা কংস এবার হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইলে ইংরেজ দরবারে বড় চাকরি হইবে তাহার। কংস একটা কেষ্টবিষ্টু হইয়া যাইবে। একদিন সুযোগ বুঝিয়া জগন্নাথ কংসের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করিল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল তাহাকে। তাহার পর হাতজোড় করিয়া বলিল—"আপনাকে গোপনে একটা কথা নিবেদন করিতে চাই।"

"কে তুমি—"

"আমি উমিচাঁদের বাড়ির চাকর। মালিক এখন মুর্শিদাবাদে আছেন বলে' আমি সেখানেই থাকি। একটা জরুরি দরকারে কলকাতায় এসেছি। আমি যখন কলকাতায় আসছিলাম তখন আপনার বৌদিদি বারাহী ঠাকরুনের সঙ্গে দেখা হল আমার। তিনি বললেন—আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাব। আমার শ্বশুরবাড়ি বেহালায় যেতে চাই, ঠাকুরপোর জন্যে বড় মন কেমন করছে। আমি রাগারাগি করে' চলে এসেছি। আবার ফিরে যেতে চাই। তুমি আমাকে নিয়ে চল। কিন্তু আমি বেহালায় যেতে পারব না, চিৎপুরেশ্বরী কালীমন্দিরের পাশের গলিতে আমার দাদার একটা বাড়ি আছে। সেখানেই আমি উঠব। তুমি ঠাকুরপোকে সেইখানেই ডেকে নিয়ে এস।"

কংস যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

"এসেছেন তিনি?"

"এসেছেন।"

"তাহলে আমাকে নিয়ে চল সেখানে।"

"নিয়ে যাব। তাঁকে জিগ্যেস করে' এসে সন্ধ্যার পর নিয়ে যাব আপনাকে।"

জগন্নাথ একটি ছিপ ভাড়া করিয়াছিল, কারণ ছিপ দ্রুতগামী। দশজন মাঝি দাঁড় বাহিবে, একজন হালে থাকিবে। ছোট একটি ঘরও ছিল ছিপটিতে। ত্রিবেণীর জমিদারবাবুদের নিকট ছিপটি সংগ্রহ করিয়াছিল জগন্নাথ। ফরাসীদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধের খবর চতুর্দিকে চাউর হইয়া গিয়াছিল। দুইদিন পূর্বেই ওয়াটসনের রণতরী ভাগীরথী বাহিয়া চন্দননগরের দিকে আগাইয়া গিয়াছে। মাঝিরা মুর্শিদাবাদের দিকে যাইতে চাহে নাই। জমিদারবাবুরাও ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু টাকার জোরে মাঝিদের বশ করিয়া ফেলিল জগন্নাথ। ত্রিবেণীর জমিদারবাবুরা উমিচাঁদের নিকট টাকা ধার করিয়াছিলেন। জগন্নাথ বলিল—মালিকের একটা জরুরি দরকারেই ছিপটা আমার চাই। জমিদারবাবুরা আর আপত্তি করিলেন না। কেবল একটা কড়ার করাইয়া লইলেন—ছিপটা মুর্শিদাবাদে গিয়াই যেন ফিরিয়া আসে। ফরাসীদের সহিত সাহেবদের জলযুদ্ধ লাগিয়াছে, তাহাদের কোন পক্ষ যদি ছিপখানাকে আটকাইয়া ফেলে তাহা হইলে বড়ই মুশকিলে পড়িতে হইবে। জগন্নাথ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ছিপ যেদিন যাইবে সেইদিনই ফিরিয়া আসিবে। মুর্শিদাবাদে গিয়া জগন্নাথ যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চতুর্দিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে। জাফরাগঞ্জে ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়ি গিয়া দেখিল ধূর্জটি-মঙ্গল নাই। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিল সে। তবু ধূর্জটিমঙ্গল ফিরিল না। ছিপের মাঝিরা আসিয়া বলিল—রাস্তা দিয়ে একদল ফৌজ কুচকাওয়াজ করে' ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনছি এখানেও নাকি যুদ্ধ বাধবে। তুমি যদি এখনি আমাদের সঙ্গে না আসতে পার, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারব না। জগন্নাথ বাধ্য হইয়া শেষে বারাহীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। প্রণাম করিয়া বলিল—"মাঠাকরুন আপনার স্বামী মৃত্যুশয্যায়। আপনাকে দেখতে চান। ছিপ পাঠিয়েছেন। কিন্তু ছিপটা থাকতে চাইছে না। এক্ষুনি চলে যেতে চায়।" তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিল—"কংসকে কায়দা করেছি।"

বারাহীর মনে হইল—তাহার স্বামী মৃত্যুশয্যায়? তাহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন? অসহায় রুগ্ণ হংসেশ্বরের মুখটা তাহার মনের উপর ভাসিয়া

উঠিল। কিন্তু কথাটা তেমন বিশ্বাস হইল না। বহুপত্নীক হংসেশ্বর তো তাহাকে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা দিয়া পার্শ্বে স্থান দেন নাই। তবু সেই রোগা লোকটার চেহারা বারবার তাহার মনে জাগিতে লাগিল। নিজে হাতে খাইতে পর্যন্ত পারেন না, খাওয়াইয়া দিতে হয়। বিছানায় উঠিয়া বসিবার সামর্থ্য নাই, উঠাইয়া বসাইয়া দিতে হয়। বারাহীর মনে পড়িল যে দৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন সে দৃষ্টি যেন আতুরের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন কৃপাভিখারী, সে দৃষ্টি যেন তাহার কাছে নীরব ভাষায় বারবার বলিতেছিল—আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। হঠাৎ পাগলীর মনে হইল—আমি যাইব, এখনই যাইব, নিশ্চয় যাইব, হাজার হোক স্বামী তো! কেউ তো তাহার সেবা করে না, হয়তো তেষ্টার সময় জল পাইতেছেন না, হয়তো খলে মাড়িয়া কবিরাজী ঔষধ কেহ সময়মতো দিতেছে না, হয়তো গুয়েমূতে মাখামাখি হইয়া পড়িয়া আছেন—নানা চিত্র পরপর তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল। সে ঠিক করিল যাইবে, দাদার জন্য আর অপেক্ষা করিবে না। কংসের কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল। সে কি ওখানে আছে? সে যদি ওখানে থাকে তাহা হইলে তো—

জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"কংস কি ও বাড়িতে আছে?"

জগন্নাথ বলিল—"না—"

"সে কোথায় আছে?"

"গেলেই বুঝতে পারবেন। এখন এর বেশী আর কিছু বলব না। যদি যান তাহলে বেশী দেরি করবেন না, কারণ ছিপের মাঝিরা এখনই চ'লে যেতে চাইছে।"

বারাহী জগন্নাথের সহিত বাহির হইয়া পড়িল।

ছিপ যখন ছাড়িল, তখন চারিদিকে অন্ধকার। বারাহী সমস্ত রাত ঘুমাইল না। অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে নৌকা দেখা গেল, ঘাটের পাশে পাশে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরবাড়িও দেখা গেল। মাঝে মাঝে আলো জ্বলিতেছে। আবার অন্ধকার। নদীর ধারে ধারে অনেক ঝোপ-জঙ্গল, জোনাকিরা সেখানে দীপালী উৎসব করিতেছে যেন। বারাহী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যখন সকাল হইল তখন ঘাটে ঘাটে স্নানার্থীর ভীড়, নৌকাও অনেকরকম। কোনটা মালবাহী ভড় কোনটা বড়লোকের

বজরা, কোনটা পারাপারের খেয়া নৌকা, কোনটা ডিঙি। গঙ্গার তীরে মাঝে মাঝে মন্দির, সেখানে পূজোর ঘণ্টা বাজিতেছে। এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটা বটগাছ। তাহাতে অনেক পাখী। তাহার একটা ডাল গঙ্গার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সে ডালে উঠিয়া ছেলেমেয়েরা জলে ঝাঁপ দিতেছে। একটা ঘাটে উলু উলু শব্দ শোনা গেল। একদল মেয়ে ঘড়া লইয়া আসিয়াছে। বোধহয় কোথাও বিবাহ হইতেছে, জল 'সইতে' আসিয়াছে মেয়েরা। চারিদিকে জীবনেরই উৎসব। আসন্ন যুদ্ধের ভয় কাহারও মুখে নাই। বারাহী মাঝে মাঝে ঢুলিতেছিল। সমস্ত রাত সে ঘুমায় নাই।

"মা ঘরে গিয়ে একটু ঘুমোন না"—জগন্নাথ বলিল।

"না আমি ঘুমুব না।"

শ্রীরামপুরের ঘাটে ছিপ ভিড়াইল জগন্নাথ। ঘাটের উপরই একটি খাবারের দোকান ছিল। কিছু খাবার কিনিয়া আনিল সে। গরম সন্দেশ, গরম লুচি, এক হাঁড়ি ভাল দই।

"মা, কিছু খেয়ে নিন।"

"তোমরা খাও, আমি কিছু খাব না।"

মাঝি মাল্লারা স্নান করিয়া লইল। আহারও করিল তাহারা।

জগন্নাথ বলিল—"মা কিছু মুখে না দিলে, আমি খাব না।"

অগত্যা বারাহী সামান্য সন্দেশ লইয়া মুখে দিল। কিন্তু সে একবারে চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল সর্বক্ষণ। মাথায় ঘোমটা টানিয়া নদীর জলের দিকেই চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহার মন চুপ করিয়া ছিল না। মন তাহার ফিরিয়া গিয়াছিল সুদূর অতীতে, যখন তাহার বাবা মহেশমঙ্গল বাঁচিয়া ছিলেন। যখন তিনি তাহাকে নয় বৎসর বয়সে গৌরীদান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যখন তাহাকে প্রৌঢ় হংসেশ্বর মাঝে মাঝে আসিয়া আদর করিয়া যাইতেন, যখন তাহার বড়বৌঠান ভানুমতী তাহাকে নানাসাজে সাজাইয়া দিতেন, কপালের উপর চন্দনের আলপনা দিতেন, দুই ভ্রূর মাঝখানে কাচপোকার টিপ পরাইয়া দিতেন, চুলে সুগন্ধী তেল দিয়া চমৎকার খোঁপা বাঁধিয়া দিতেন। নিত্য নূতন রকমের খোঁপা, বৌঠান কতরকমের খোঁপা বাঁধিতেই যে জানিতেন, ঢাকাই মসলিনের হালকা শাড়ী পরাতেন তাহাকে, পায়ে পায়জোর পরাইয়া দিতেন, মলের উপর চুটকি ছিল,

হাত ভরতি সোনার চুড়ি ছিল, মকরমুখো বালা ছিল, তাগা ছিল। হংসেশ্বর আসিলে সেগুলি পরিতে হইত। কোথাও নিমন্ত্রণে গেলেও সেগুলি পরিতে হইত কিন্তু সেগুলি তখন মসলিনের কাপড় দিয়া ঢাকা থাকিত—হঠাৎ তাহার দিদিদের কথা মনে পড়িল। বড়দিদি জগদম্বা শ্বশুর বাড়ি হইতে পুরীতে তীর্থ করিতে গিয়াছিল। আর ফেরে নাই। জলদস্যু বোম্বেটেরা তাহাকে নাকি লুটিয়া লইয়া গিয়াছিল। মনে পড়িল ভালো আমসত্ত্ব দিতে পারিত সে। নতুন কাপড়ের উপর ছোট ছোট পাথরের থালায় ভালো ভালো আমের আমসত্ত্ব দিত, রোদে বসিয়া পাহারা দিত সর্বক্ষণ মেজদি শ্যামাঙ্গিনীকেও মনে পড়িল তাহার। পাড়ার একটা ছেলের সহিত ভাব হইয়াছিল তাহার। বাবা তাহাকে জোর করিয়া শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন মগরায়। সেখানে জ্বরে ভুগিয়া মরিয়া গেল সে। আর এক বোন জয়া— ভারী দজ্জালিনী ছিল সে। ঝকমারির সহিত খুব ভাব ছিল। আমের সময় দুইজনেই বাগানে ঘুরিত। বর্ষার সময় গঙ্গার জলে সাঁতার দিত। একবার একটা মুসলমান ছোঁড়া নাকি তাহাদের পিছু লইয়াছিল। সে শিশ দিতেই ঝকমারি একটা থান ইট ছুঁড়িয়া তাহার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। অনেক হাঙ্গামা হইয়াছিল ইহা লইয়া। বাবা গোবিন্দ মিত্তিরের সহায়তায় অনেক টাকা খরচ করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই হইতে তাহারা আর বাড়ির বাহির হইত না। কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল তাহার। হংসেশ্বর একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন—তোমার জন্য সোনার কেয়ূর গড়াতে দিয়েছি। বারাহী বুঝিতে পারে নাই কেয়ূর আবার কি। গহনা যখন আসিল তখন হাসি পাইল তাহার—ওমা এ তো বাজু! এর নাম কেয়ূর নাকি। এমনি সব কত অসংলগ্ন স্মৃতি, কত তুচ্ছ ঘটনা মনে পড়িল তাহার। গঙ্গার জলে দেখিল একটা ফুলের মালা ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। বারাহীর মনে হইল তাহার জীবনেও কত ফুল ফুটিয়াছিল, সে সব ফুল লইয়া মালাও গাঁথিয়াছিল সে, সে মালাও ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ একটা ঘাটের কাছে দেখিল অনেক লোকের ভীড়। ঘণ্টা বাজিতেছে, শাঁখ বাজিতেছে, কীর্তন হইতেছে। বারাহী দেখিল একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধকে গলা পর্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া কয়েকজন লোক তারস্বরে চীৎকার করিতেছে

—হরে কৃষ্ণ হরে রাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম। বারাহী বুঝিতে পারিল অন্তর্জলী হইতেছে। তাহার ঠাকুরদাদারও হইয়াছিল। আর একটা কথাও মনে পড়িল—তাহার ঠাকুরমা 'সতী' হইয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছিলেন। তাঁহার সব দুঃখের অবসান হইয়াছিল। জীবনে অনেক শোক পাইয়াছিলেন তিনি, দুরারোগ্য পেটের ব্যথায় ছটফট করিতেন, চিতায় পুড়িয়া শান্তি পাইয়াছিলেন।

আর একটা ঘাটে দেখিল দুইটি কালো পাঁঠাকে স্নান করাইতেছে। ঘাটের উপরই একটি খড়ের মণ্ডপে কালীমূর্তিও দেখা গেল। বারাহীর মনে পড়িল খুব ছেলেবেলায় সে-ও একটি ছাগলছানা পুষিয়াছিল। তাহার নাম ছিল মটরু। মটরু একদিন হারাইয়া গেল। শোনা গেল তাহাকে নাকি কালীঘাটে বলি দেওয়া হইয়াছে। বারাহীর মনটা কেমন যেন উদাস হইয়া গেল। নদীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল সে। তাহার মনে হইতে লাগিল জীবনে সাধ-আহ্লাদ তো ফুরাইয়া গিয়াছে, নিজের আত্মীয়-স্বজন মরিয়া গিয়াছে, হারাইয়া গিয়াছে, পলাইয়া গিয়াছে। জীবনের যে ছবিটা সে আঁকিয়াছিল তাহার রং শুকাইতে না শুকাইতে কে যেন তাহার উপর এক ঘটি জল ঢালিয়া দিল, সব রং উঠিয়া গেল, ছবি অবলুপ্ত হইল। রং-ন্যাবড়ানো কাগজটার দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল সে। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল, ছিপ কলিকাতার বাগবাজারের ঘাটে ভিড়িয়াছে।

জগন্নাথ আসিয়া বলিল—"মা এবার নামতে হবে, আমরা বাগবাজারে এসে গেছি। আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আসছি----"

"এখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে' বেয়ালায় যাব ?"

"বেয়ালায় যাবার আগে চিৎপুর হয়ে যাব একবার।"

'চিৎপুর ? কেন ?"

"সেখানে আপনাদের একটা ছোট বাড়ি আছে। একটা জিনিস আছে সেখানে। ধুজুবাবু বলেছিলেন সেটা আপনাকে দিতে—"

"কি জিনিষ ?"

"একটা বাক্স।"

"কিসের বাক্স ?"

"দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

একটি গলির সামনে চিৎপুরের উপরই ঘোড়ার গাড়িটি দাঁড়াইয়া রহিল। জগন্নাথ তাহাকে আর গলির ভিতর ঢুকিতে দিল না।

"মা নামুন। গলির ভিতরে কিছুদূর যেতে হবে।"

বারাহী নামিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল আবার। এই অপরিচ্ছন্ন সরু গলিটাতে একা জগন্নাথের সঙ্গে যাইতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না তাহার। গলির মুখেই একটা মরা ইঁদুর পড়িয়া আছে। তাহার পাশে খানিকটা গাদা-করা ছাই। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি বিষ্ঠা, পাড়ার ছেলেমেয়েরা রাস্তার দুইধারে মলত্যাগ করে। গলির দুই পাশে পচা নালী। অধিকাংশ বাড়িরই দেওয়াল মাটির, চাল খড়ের। মাঝে মাঝে দুই একটা পাকা ছোট বাড়ি আছে। কিন্তু সেগুলিও বড় পুরাতন, ইঁটগুলি নোনা লাগিয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"এ কোথায় আনলে আমাকে জগন্নাথ। এখানে আমাদের বাড়ি আছে জানতুম না তো।"

জগন্নাথ সে তর্কে না গিয়ে বলিল—"আসুন না আমার সঙ্গে। বেশীদূর নয়, কাছেই। ঘরে গিয়ে কুলুপটি খুলে জিনিসটি আপনার হাতে দিয়ে দেব। ধূর্জুবাবুর হুকুম এটা। অমান্য করতে পারব না।"

"বেশ তো, আমি গাড়িতেই বসছি। তুমি গিয়ে নিয়ে এস সেটা।"

"না, সে জিনিস আনা যাবে না। আপনি চলুন।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে অবশেষে বারাহী জগন্নাথের পিছু পিছু গেল। কিছুক্ষণ পরে একটি পাকা বাড়ির সম্মুখে জগন্নাথ দাঁড়াইল। বাহিরের দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছিল। সেটা খুলিবার পর ভিতরে ঢুকিতেই বারাহী দেখিল প্রকাণ্ড উঠান একটা। উঠানে এক হাঁটু ঘাস। একধারে একটা আকন্দগাছে ফুল ফুটিয়াছে, আর একধারে ভাঙা তুলসীহীন তুলসীমঞ্চ একটা। আর একধারে ঘেঁটু ও কচুর বন। বাড়ি জনশূন্য!

" কোথা নিয়ে এলে জগন্নাথ—"

জগন্নাথ কোন উত্তর না দিয়া সোজা দালানে গিয়া ঢুকিল এবং আর একটা ঘরের তালা খুলিতে লাগিল।

"কোন ভয় নেই। চলে' আসুন সোজা।"

বারাহী দালানে গিয়া দেখিল জগন্নাথ একটি ঘরে ঢুকিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া সে একটি তালাবন্ধ বড় সিন্দুকের তালা খুলিতেছে। বারাহী সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। সিন্দুকের ভিতর হইতে কাঁসার একটি বড় হাঁড়ি বাহির করিল জগন্নাথ। হাঁড়ির মুখে একটি পেতলের সরা, ময়দা দিয়া সরাটি হাঁড়ির মুখে আটকানো। জগন্নাথ ময়দার প্রলেপ তুলিয়া সরাটি খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির করিল একটি ছিন্নমুণ্ড।

"এই নিন। কংসের মুণ্ডু। আপনি তাকে খুন করতে চেয়েছিলেন, আপনার আদেশ আমরা প্রতিপালন করেছি। মুণ্ডুটি কেটে তাকে ভালো বিলিতি মদে ভিজিয়ে রেখে আপনাকে আনতে গিয়েছিলাম।"

বারাহী ব্যায়ত আননে মুণ্ডটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পা দুইটা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে মেজের উপর বসিয়া পড়িল সে। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার পর নিজেকে সামলাইয়া প্রশ্ন করিল—"একে খুন করলে কে—"

"গুণ্ডারা করেছে। পাঁচশ' আসরফি খরচ হয়েছে এ জন্য। পয়সা ফেললে এদেশে ঘাতকের অভাব হয় না। তবে আমি করিনি। ওই পাষণ্ডটাকে ছুঁতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। আমি যাদের খুন করেছি তারা দেবী ছিল। তাদের রক্ষা করবার জন্যেই তাদের খুন করতে হয়েছিল—"

বারাহী নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

"চলুন এবার। আপনাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দি। আপনার স্বামীর অবস্থা খুবই খারাপ দেখে এসেছিলাম।"

কয়েকদিন পরে জগন্নাথ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া মৈনিবিবিকে খবর দিল বারাহীর স্বামী মারা গিয়াছেন। বারাহী ফেরে নাই, কারণ সে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদে ছিলেন না। মৈনি বলিতে পারিল না তিনি কোথায় গিয়েছেন।

১২

কংস ও আসফ আলি খাঁকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়া ধূর্জটিমঙ্গল ঠিক করিয়াছিলেন এবার উজির আহম্মদের পশ্চাদ্ধাবন করিবেন। তাঁহার পত্নীর ধর্ষণকারী তাঁহার হাত হইতে নিস্তার পাইবে না। নানাদিক হইতে খবর লইয়া তিনি জানিয়াছিলেন উজির আহম্মদ রাজমহলে আছেন। রাজমহলে গিয়াই ওই পাষণ্ডকে বিনাশ করিতে হইবে এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি বাছা বাছা কয়েকটি গুণ্ডা লইয়া রাজমহলে যাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার বুকের ভিতরটা পুড়িয়া যাইতেছিল অপমান অবিচার প্রতিহিংসার ত্রিশূলে, যদিও তাঁহার মর্ম ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, কিন্তু বাহিরে তাহার কিছু মাত্র প্রকাশ ছিল না। বাহিরে তিনি মৈনিবিবির অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিতেছিলেন, বন্ধু কেরামতের গান শুনিতেছিলেন, পিতৃবন্ধু পাণ্ডবপ্রধানের সহিত সরস রাজনীতি আলোচনা করিতেছিলেন, মাণিক্যের মায়ের মহলে গিয়া প্রত্যহ কিছু খাইয়া আসিতেছিলেন, মাণিক্যপ্রধানের নূতন পাখী হর-বোলা এবং নূতন প্রণয়িনী নাজমাকে লইয়া লঘু হাস্য-পরিহাস করিতেছিলেন, মাঝে মাঝে জগদ্ধাত্রীর মুখখানাও তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল কিন্তু মনে মনে একটি লক্ষ্যেই তিনি দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছিলেন, পাপীদের দণ্ড দিতে হবেই। পাপীতে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সব পাপীদের দণ্ড দিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, কিন্তু যাহারা তাঁহার বংশকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাঁহার মর্যাদার মূলে আঘাত করিয়াছে, তাঁহার বংশের পুরনারীদের সতীত্ব হরণ করিয়াছে—তাহাদের তিনি প্রাণদণ্ড দিবেন। যে দেশে রাজাই লম্পট স্বেচ্ছাচারী, পশুবল এবং অর্থবলই যে দেশে ন্যায়বিচারের সিংহাসন জবর-দখল করিয়া বসিয়া আছে, সে দেশে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে নিজেই পাপীদের দণ্ড দিতে হইবে। পশুবল এবং অর্থবলের সহায়তা লইয়াও সে দণ্ড দিতে হইবে। ধূর্জটিমঙ্গল অনুভব করিতেছিলেন এ দণ্ড দিতে তিনি যদি অপারগ হন তাঁহার সমূহ সর্বনাশ হইয়া যাইবে, তিনি আর ভদ্রসমাজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন না, যে পৌরুষ তাঁহার

বংশমর্যাদার ভিত্তি সেই পৌরুষ চিরতরে অবলুপ্ত হইবে, তাঁহার আত্মসম্মানের, তাঁহার বংশগৌরবের হর্ম্য ভাঙিয়া পড়িবে। তাই তিনি স্থির করিয়াছিলেন এ দণ্ড দিবেনই। কংস এবং আসফ আলির ব্যবস্থা হইয়াছে এবার উজির আহম্মদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাণিক্য এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে তাঁহাকে। দুইজন পর্তুগীজ, দুইজন রাজপুত এবং তিনজন সাহেব গুণ্ডা যোগাড় করিয়া দিয়াছে সে। সকলেই অস্ত্রবিশারদ, সকলেই অর্থপিশাচ। এমন কাজ নাই যাহা তাহারা টাকার জন্য না করিতে পারে।

মাণিক্যপ্রধান বলিল—"খবর নিয়ে জানলুম, উজির আহম্মদ সম্প্রতি মফঃস্বল থেকে একটি গেরস্তর বউকে ভাগিয়ে নিয়ে এসে জোর করে নিকে করেছেন। তোমাকে সেই বধূটির স্বামী সাজতে হবে। ওদের কাছে তোমার আসল নাম বলিনি, সেই মেয়েটির স্বামী বটুকলালের নাম বলেছি। তুমি বটুকলাল সেজে যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে যাচ্ছ। ওদের প্রত্যেককে দুশো আসরফি দিয়েছি। কার্যসিদ্ধি হলে আরও একশো ক'রে দিতে হবে। তুমি টাকাটা সঙ্গে নিয়ে যেও এবং উজির সাহেবের মরামুখ দর্শন ক'রে টাকাটা ওদের দিয়ে দিও। ওরা রাজমহলের দিকে বেরিয়ে গেছে, ঘাটের কাছে যে আফগান সরাইখানা আছে সেইখানেই ওরা আড্ডা গাড়বে। তুমিও কাল সকালেই বেরিয়ে পড়। শুভস্য শীঘ্রম্। কি বলিস রে হরবোলা ?"

হরবোলা হলদে পাখির ডাকের নকল করিয়া বলিল—'টিউ'।

সেদিন কেরামতের বাড়িতে যখন গানের আসর শেষ হইল, গন্ধর্বলোক হইতে সকলে যখন মর্ত্যলোকে অবতরণ করিলেন তখন কেরামৎ বলিল— "আমি কাল চলে যাব। মৈনিকে এই খবরটা দিও। আর তার সঙ্গে দেখা করতে পারব না।"

মাণিক্য বলিল, "ধুজু তুমিই তাহলে খবরটা দিয়ে দিও। আমি কেরামতের যাওয়ার ব্যবস্থা করি।"

কেরামত একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

"কেন ভাই ওসব হাঙ্গামা করতে যাচ্ছ। আমরা দেওয়ানা, আমাদের দেওয়ানার মতোই থাকতে দাও।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমরা যা করছি তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন। তুমি দেওয়ানা আছ, দেওয়ানার মতোই থাক।"

মাণিক্য বলিল—"আলবৎ।"

সেইদিন রাত্রেই ধূর্জটিমঙ্গল মৈনি বিবির কাছে গেলেন।

মৈনি অবাক হইয়া গেল।

"এত রাত্রে এত কৃপা।"

তাহার চোখ দুটিতে হাসি নাচিতে লাগিল।

"খবর দিতে এলাম কেরামত কাল চলে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না তার।"

"একথা সকালে এসে বললেই পারতেন। কত রাত হয়েছে জানেন? তোপখানা থেকে রাত দুপুরের তোপ অনেকক্ষণ আগে পড়ে গেছে।"

"কাল সকালে আমি বাইরে যাব।"

"কোথায় যাবেন?"

"সব কথা না-ই জানলে।"

"তবু বলুন।"

"না, বলব না। একটা কথা কিন্তু বলব—তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।"

মৈনীর চোখ দুইটির আলো যেন নিভিয়া গেল সহসা।

বলিল—"ঘাস দেখে সবাই বলে আহা কি সবুজ, আহা কি চমৎকার। কিন্তু ঘাসের কি দুঃখ জানেন? ঘাসকে মানুষ দু'পায়ে মাড়িয়ে যায়, আর গরুতে ছিঁড়ে খায়। কিন্তু আমি জানি আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি যাচ্ছেন রাজমহল।"

"কে বলল!"

"তা বলব কেন?"

মুচকি হাসিয়া মৈনি আদাব করিল। তাহার পর হঠাৎ পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ধূর্জটিমঙ্গলও আর অপেক্ষা করিলেন না, বাড়ি চলিয়া গেলেন।

বাড়ি ফিরিয়া তিনি ঝকমারির চিঠি পাইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। চাকর হীরালাল বলিল ঝকমারি ফৌজি বেশ পরিধান করিয়া

একটি তাঞ্জামে চড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে তাহা সে জানে না। বারাহী জগন্নাথের সঙ্গে গিয়াছে। এখন কি করা উচিত? ধূর্জটিমঙ্গল ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন উহাদের অনুসন্ধানে তিনি বৃথা কালক্ষয় করিবেন না। করিলেও উহাদের ধরিতে পারিবেন না। যাহা হইবার হউক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি হীরালালকে বলিলেন—"খাবার দাও—"

পাচক জানকী ঠাকুর প্রচুর রান্না করিয়া রাখিয়াছিল। নিরামিষ ব্যঞ্জনই বেশী। রোহিত মৎস্যের কালিয়া এবং রোহিতের মুড়া দিয়া মুগের ডালও ছিল। হীরালাল বলিল—"মাণিকবাবুর মা আপনার জন্যে কিছু বেলের মোরব্বা আর মধু পাঠিয়েছেন।" ধূর্জটিমঙ্গল ভাত খাইলেন না। খাইলেন রোহিত মৎস্যের কালিয়াটা এবং ডালটা। তাহার পর দুইটি আম এবং আমের পর বেলের মোরব্বা কয়েকটা। পরিশেষে খানিকটা মধু। হীরালালকে বলিলেন—"কাল সকালে আমি বেরিয়ে যাব। রাত্রে তাই বেশী কিছু খেলাম না। খুব ভোরে ঘোড়া যেন ঠিক থাকে। আমার সঙ্গে দু'জন যাবে—রামশরণ মিশির আর যোগী সিং। বাকী সবাই এখানে থাকবে। আমি কবে ফিরব তার ঠিক নেই। এখানকার সব ভার তোমার উপর থাকল। খরচের টাকা তোমাকেই দিয়ে যাব।"

ধূর্জটিমঙ্গল শুইতে গেলেন।

কিন্তু সেদিন তাঁহার অদৃষ্টে নিদ্রা ছিল না। একটু পরেই হন্তদন্ত হইয়া মাণিক্যপ্রধান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে পাখি নাই। যেন্ধ্রুকেশ।

বলিলেন, "কীর্তন জমে উঠেছে। ওয়াট্‌সের কাছে এখান খবর এসেছে যে ইংরেজরা চন্দননগর দখল করেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কেল্লা ফতে হয়ে গেছে। কিছু ফরাসী পালিয়ে এসেছে এখানে। নবাব তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। মনে হচ্ছে এই নিয়েই নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে। ক্লাইভ নাকি বলেছে নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা চন্দননগর দখল করলাম। কিন্তু এইখানেই আমরা থামব না, আমরা নবাবকেও সিংহাসনচ্যুত করব।"

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"শুনেছিলাম ফরাসীরা বীর। এত শীগ্‌গির তারা হেরে গেল?"

"ওদের মধ্যেও মীরজাফর আছে যে। ফরাসীরা কেল্লার সামনে নদীর বুকে অনেক নৌকা উপুড় ক'রে রেখেছিল। অ্যাডমিরল ওয়াট্‌সনের যুদ্ধজাহাজ কাছে ভিড়তে পারছিল না। কিন্তু একটা গোপন পথ ছিল। ফরাসী ফৌজের টেরান্নু সাহেব সেই পথটি ইংরেজদের দেখিয়ে দিলেন। সেই পথে হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল ওয়াট্‌সনের যুদ্ধ-জাহাজ, দমাদ্দম গোলা পড়তে লাগল। তু'ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ। খবর শুনে বাবা খুব ঘাবড়ে গেছেন। তুমি তাঁকে যে ঘোড়াটা দিয়েছিলে সেইটে চড়েই তিনি রওনা হয়ে গেছেন কৈঁকালার দিকে। আমিও ভাবছি বাড়ির সকলকে নিয়ে কাল ভোরে কৈঁকলায় চ'লে যাব। কেরামতের জন্য পালকী, তু'জন সিপাহী আর পাঁচশ' আসরফি পাঠিয়ে দিয়ে এলাম এখনি। চিঠিও দিলাম একটা। লিখলাম—অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ কর। নবাবের সঙ্গে ইংরেজের লেগে গেছে। কালই হয়তো ইংরেজের ফৌজ এসে পড়বে এখানে। তুমি আর এক দণ্ড থেকো না। টাকাটা সাবধানে রেখো। একটা হুণ্ডিও পাঠাচ্ছি পাটনায় গোবিন্দ শেঠের রেশমের দোকানে এটা ভাঙাতে পারবে। আমরা কৈঁকালা চললাম। আমাদের যা করবার তা তো করেছি। এখন কেরামত কি করে দেখ। আমি তোমাকে খবরটা দিতে এলাম আর জানতে এলাম তুমি কি করবে—তুমি যদি কৈকালা যেতে চাও—"

"আমি রাজমহল যাব"

"আর তোমার বাড়ির মেয়েরা কোথা থাকবে?"

"তারা কেউ নেই। এই দেখ—"

ঝকমারির চিঠিটা তিনি মাণিক্যের হাতে দিলেন।

"ঝকমারি যুদ্ধে গেছে? তার মানে? কোথা গেছে সে, চন্দননগর?"

"কি ক'রে বলব বল। তুমি যে ফৌজি পোশাক পাঠিয়েছিলে সেই পোশাক পরেই বেরিয়ে গেছে—"

'সেটা তো ইংরেজি ফৌজের পোশাক। তাহলে কি ইংরেজ ফৌজে গিয়ে মিশেছে?"

ধূর্জটিমঙ্গল কোন জবাব দিলেন না।

বাতায়ন-পথে দৃষ্টি মেলিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মাণিক্য বলিলেন—"দেখ ধুজু আমার একটা পরামর্শ শুনবে? এখন

রাজমহল যেও না। আমি যে গুণ্ডাগুলো পাঠিয়েছি তারাই উজির মাহম্মদকে খতম করতে পারবে। তুমি ও বিপদের মধ্যে যাচ্ছ কেন—"

ধূর্জটিমঙ্গল অন্ধকার হইতে চোখ ফিরাইয়া মাণিক্যপ্রধানের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মাণিক্যপ্রধান দেখিলেন তাঁহার চোখের দৃষ্টি বাঘের চোখের দৃষ্টির মতো জ্বলজ্বল করিতেছে।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"যাচ্ছি, কারণ ছেলেবেলায় বাবার কাছ থেকে একটি মন্ত্র শিখেছিলাম—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। উজির মাহম্মদকে আমি শুধু খুন করতে চাই না, আমি বিচার ক'রে তার মৃত্যুদণ্ড দিতে চাই। মৃত্যুর পূর্বে সে যেন জেনে যায় কেন তার মৃত্যু হল। আমি বিচারক, সুতরাং আমায় যেতেই হবে সেখানে।"

"তাহলে যাও। আমি উঠলাম। হ্যাঁ, আর একটা কথা। ওয়াট্‌স্ সাহেবের বাড়িতে জনাব তুর্বক মিঞার সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম তিনিও বেশ ভয় পেয়েছেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব তাঁকে বললেন সাহেব কয়েদীদের ছেড়ে দিন। ক্লাইভ যদি এসে দেখেন সাহেবকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে, তাহলে আগে তিনি প্রথমে আপনাকেই গুলি করবেন। আমার মনে হয় এখন একটু চেষ্টা করলে তোমার বন্ধু জন সাহেব ছাড়া পেয়ে যেতেন। কিন্তু চেষ্টা করবে কে, আমি চললাম কৈঁকালায়, তুমি চললে রাজমহল। যা হবার তাই হবে। বেঁচে থাকি তো দেখা হবে আবার। চললাম।"

ধূর্জটিমঙ্গল আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দ্বারে আবার করাঘাত পড়িল। ধূর্জটিমঙ্গল উঠিয়া গেলেন। হারালাল আসিয়া খবর দিল দুইটি মেয়ে আসিয়াছে। অবিলম্বে তাহার সাক্ষাৎ চায়।

"মেয়ে? কি রকম মেয়ে?"

"মাথায় জবাফুল-গোঁজা কালো মেয়ে দুটো। নাম বললে তির্কি আর শাওনি। বোধ হয় সাঁওতাল।"

"ডেকে নিয়ে এস এখানে।"

তির্কি ও শাওনি আসিয়া প্রবেশ করিল। দুইজনের মুখেই আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি। শাওনি বলিল—"রাজা, তোকে দেখে ভরসা পেলাম। সেই সন্দি থেকে তুকে খুঁজছি। বাবা বাবা কত পথ যে হাঁটলাম। শহরটা মস্ত বড়।"

তির্কি বলল—"যাকে পাই তাকেই শুধাই আমাদের মঙ্গলরাজা থাকে কোথা। কেউ বুলতে পাবে না। শেষে একটা সহিস বুললে—তোদের রাজার কি ঘোড়া আছে? আমরা বুললাম—হঁ আছে। মস্ত ঘোড়া। সে আবার শুধালেক—তোদের রাজা কি জোয়ান মরদ? আমরা বুললাম—হঁ মরদের মতো মরদ। তখন সে বললেক জাফরগঞ্জের লালকুঠিতে একজন রাজা আইছে, তার অনেক ঘোড়া, অনেক লোকজন। আমরা তখন তাকে বললাম—বাপধন, বাড়িটা আমাদের দেখায়ে দে। তুকে পয়সা দিব। সে-ই আমাদের এখানে দিয়ে গেল। তুকে দেখে আমবা বাঁচলম্।"

ধূর্জটিমঙ্গল ইহাদেব আবির্ভাবে বিস্মিত হইয়া গেলেন।

প্রশ্ন করিলেন—"তোদের সঙ্গী সেই মীর মহম্মদ সাহেব কোথা গেল?"

"তাকে ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ি ফিরে এলম আমরা।"

"উড়িষ্যা থেকে এত তাড়াতাড়ি ফিবে এলি কি ক'রে?"

"রাস্তায় ঘোড়া কিনলম। তুই যে টাকা দিয়েছিলি সেই টাকায় ঘোড়া পেলম। পথে ধলরাজার ফৌজের সঙ্গে দেখা হল। তাবা সব লাঠি শড়কি বল্লম তীর ধনুক বন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। শুনলম তারা নবাবের ফৌজকে মদত দিতে আসছে। আমবাও তাদের সঙ্গে জুটে গেলম তাদেব সঙ্গেই আইছি আমরা।"

শাওনি বলিল—"বড় ক্ষিধে লেগেছে রাজা। কিছু খাবাব আছে?"

"আছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল হীবালালকে খাবার আনিতে আদেশ দিলেন। ভাত ডাল তরকারী, ফল মিষ্টান্ন প্রচুব ছিল। মহানন্দে দুইজনে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। ভোজনশেষে শাওনি বলিল—"মহুয়া নাই?"

"এখানে মহুয়া পাওয়া যায় না। সিরাজী পাওয়া যায়।"

"তাই দে তাহলে"

উভয়ে সিরাজীও পান করিল। তাহার পর তাহারা বিবৃত করিল কেন তাহারা ধূর্জটিমঙ্গলের সন্ধানে এত রাত্রে আসিয়াছে। তাহারা মুর্শিদাবাদে আসিয়া প্রথমেই গিয়াছিল তাহাদের প্রেমিক কারারক্ষী রমজান আলীর কাছে। রমজান আলী অনেক আগেই জন সাহেবকে ছাড়িয়া দিত, কিন্তু কারাধ্যক্ষ তুর্বক আলীর ভয়ে পারে নাই। শোনা যাইতেছে তুর্বক আলী

কাল নাকি পাটনায় চলিয়া যাইবেন। নবাবের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষে তিনি নাকি খুব ভয় পাইয়াছেন। পাটনায় তাঁহার শ্বশুর আছেন, একজন ফরাসী সেনাপতির সহিত তাঁহার দোস্তিও আছে। সুতরাং তিনি পাটনা যাইতেছেন। রামজান বলিতেছে—এই সুযোগে জন সাহেবকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সে নিজে তাহার ঘরের তালা খুলিয়া দিতে ভয় পাইতেছে। বলিতেছে তোমরা উহার ঘরের জানলায় একটা মই লাগাইয়া উহাকে নামাইয়া লও। আমি চোখ বুজিয়া থাকিব। উহারা একটা মই কিনিয়াছে। কাল রাত্রে সেটার সাহায্যে জন সাহেবকে তাহারা উদ্ধার করিবে। কিন্তু তাহার পর? জন সাহেবকে লইয়া কি করিবে তাহারা? আবার যদি নবাবের কোন লোক তাহাকে কয়েদ করে? কয়েদখানা হইতে বাহির হইয়া রাত্রের অন্ধকারেই কোন গোপন জায়গায় লুকাইয়া না থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা। কি করা উচিত এই পরামর্শের জন্যই তাহারা এত রাত্রে ধূর্জটিমঙ্গলের কাছে আসিয়াছে।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমি ভোরেই রাজমহল চলে যাচ্ছি। তোমরা সাহেবকে এই বাড়িতে রাখো; এখানে আমার লোকজন সবাই থাকবে। খাওয়াদাওয়ারও কোন অসুবিধে হবে না। রোমনিও আসবে তো?"

"হ্যাঁ, আসবেক বইকি। সে সাহেবকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে নারে।"

খুব ভোরে উঠিয়াই ধূর্জটিমঙ্গল বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিবার পূর্বে মৈনি বিবির মুখটা সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। মনে হইল কাল রাত্রে তাহার সহিত আচরণটা একটু রূঢ় হইয়া গিয়াছে! মনের ভিতরটা খচখচ করিতে লাগিল। তিনি মৈনি বিবির বাড়ির দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরাইলেন। মৈনি বিবির বাড়িতে অত ভোরে সাধারণতঃ কেহ যান না, গেলেও মৈনি তাঁহার সহিত দেখা করে না। কিন্তু ধূর্জটিমঙ্গলের কথা স্বতন্ত্র। তিনি যাইবামাত্র চাকর তাঁহাকে সসম্ভ্রমে উপর লইয়া গেল এবং মৈনি বিবিকে 'এত্তেলা' দিল। মৈনিও যেন ধূর্জটিমঙ্গলের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। গায়ে একটা ওড়না জড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধূর্জটিমঙ্গল দেখিলেন মৈনির চোখ দুইটি ফোলা ফোলা। কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়াছে নাকি? এ সম্বন্ধে কিন্তু তিনি কিছু উচ্চবাচ্য

করিলেন না। কেবল বলিলেন, "মৈনি, আমি রাজমহল যাচ্ছি। আমার উপর রাগ ক'রে থেকো না।"

মৈনি কিছু বলিল না, নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

"চুপ ক'রে আছ কেন?"

"কি আর বলব।"

"তবু কিছু বল।"

"কাল রাত্রে একটা খবর শুনেছি সেইটে বলছি তাহলে। নবাব দরবারে ইংরেজদের যে উকিল ছিল তাকে নবাব সাহেব তাড়িয়ে দিয়েছেন দুর্লভরামের সঙ্গে একদল সেনাও পলাশীতে পাঠিয়েছেন তিনি। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ লাগবে নিশ্চয়। আপনি এ সময়—"

মৈনি কথা শেষ করিল না। মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে ধূর্জটিমঙ্গলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কেবল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—"আমাকে যেতেই হবে। তুমি একটু হাস দেখি।"

মৈনির চোখ দুইটি সহসা হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মনে হইল চোখের ভিতর কে যেন আলো জ্বালিয়া দিল।

"চললুম। আবার ফিরে আসব। ফিরে এসে গান শুনব তোমার। ভেবো না।"

ধূর্জটিমঙ্গল নীচে নামিয়া আসিলেন।

তাঁহার দুইজন অশ্বারোহী সঙ্গী রামশরণ মিশির ও যোগী সিং রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল।

জন সাহেব ছাড়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে লুকাইয়া থাকেন নাই। তিনি সোজা কালনায় গিয়া ইংরেজদের ফৌজে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৩

ইতিহাসে এই ঘটনাটির উল্লেখ নাই। কিন্তু ইহা ঘটিয়াছিল ফরাসীদের সহিত ইংরেজদের যখন যুদ্ধ বাধিল তখন কাশিমবাজারের ফরাসী

কুঠির অধ্যক্ষ ল' সাহেবের অনুরোধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফরাসীদের সৈন্য সাহায্য কবিতে সম্মত হইয়াছিলেন। দুর্লভবাম, মাণিকচাঁদ, মোহনলাল সকলকে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছিলেন। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার রায়ের অধীনে যে দুই সহস্র মোগল সৈন্য ছিল নবাবের হুকুমে তাহারা চন্দননগরে গিয়াছিল। সে সৈন্যদলে আসফ আলি খাঁ ছিলেন। এ সৈন্যদল গিয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ করে নাই। নন্দকুমার রায়ের সহিত ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ছিল, তিনি যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদের বিব্রত করিতে চাহেন নাই, নবাবের হুকুম রক্ষা করিবার জন্য লোক-দেখানো অভিনয় কবিয়া ওই দুই সহস্র সেনাকে চন্দননগরে তিনি পাঠাইয়াছিলেন। তাহাবা গিয়াই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল। এসব কথা ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে ক্ষুদ্র একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে কথা ইতিহাসে লেখা নাই। এই যুদ্ধে আসফ আলি খাঁ নিহত হইয়াছিলেন। ইংবেজ-ফৌজের পোশাকপরা একটি যুবক সহসা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে ছুবি বসাইয়া দেন। তাহার পরই প্রকাণ্ড একটি গোলা পড়ে। উভয়েরই দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। ঝকমারির আসল নাম ছিল ঝঙ্কারিণী। মহাকালেব তম্বুরার দীপক রাগে যে ঝঙ্কারটা সে বাজাইয়া গেল তাহা কেহ শুনিল না। শুনিবে এ প্রত্যাশাও সে করে নাই।

১৪

পলাশীর প্রান্তর।

মাটির দেওয়াল-ঘেরা দেড় হাজার বিঘার বিরাট আমবাগান আমবাগানে এক লক্ষ আম গাছ। আমবাগানের পাশেই পাঁচিলঘেরা একটি ছোট পাকাবাড়ি। নবাব শিকার করিতে আসিলে এই বাড়িতে বিশ্রাম করিতেন বলিয়া নাম শিকারবাড়ি। এই বাড়িতেই সসৈন্যে ক্লাইভ, আয়ার কুট, এবং অন্যান্য ইংরেজ সেনাধ্যক্ষরা আশ্রয় লইয়াছেন! চন্দননগরের ফৌজরা কলিকাতার ফৌজের সহিত মিলিত হইয়া পলাশী প্রান্তরে সমবেত হইয়াছে। গোরা সৈন্য আসিয়াছে দুইশত নৌকা চড়িয়া, কালা সৈন্য

আসিয়াছে পায়ে হাঁটিয়া। পথে হুগলী, কাটোয়া, অগ্রদ্বীপে এবং পলাশীর ছাউনিতে নবাবের অনেক সিপাহী সেনা মজুত ছিল, কিন্তু কেহ তাহাদের গতিরোধ করে নাই। গতিরোধ করিলে পথেই ইংরেজ সৈন্য বিনষ্ট হইত, পলাশী পর্যন্ত পৌছিতে পারিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই, ইংরেজ বাহিনী বিনা বাধায় পলাশীর আমবাগানে আসিয়া পৌছিয়াছে।

প্রভাত হইতেই যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল।

ক্লাইভ শিকারবাড়ির ছাতে উঠিয়া দূরবীন দিয়া নবাববাহিনী দেখিলেন। বিশাল জনসমুদ্র। বাগানের দক্ষিণ দিকে এই বিরাট বাহিনী অর্ধচন্দ্রাকারে তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। ফরাসী সেনানায়ক সাঁফ্রে অল্প দূরেই পঁয়তাল্লিশ জন গোলন্দাজ এবং চারিটি কামান লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সাঁফ্রে নবাবের পক্ষে। সাঁফ্রের পিছনে মীরমদন। মীরমদনের বামদিকে একটা প্রচণ্ড জায়গা ঘিরিয়া কাশ্মীরী সেনাপতি মোহনলাল। সেখানে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার, সাত হাজার পদাতিক সৈন্য। নবাবের বাকী সৈন্যরা একটা উঁচু ঢিপির উপর। ইংরেজদের বাম দিকে রহিয়াছেন রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খাঁ আর মীরজাফর।

ইংরেজদের সর্বসাকুল্যে নয়শ' পঞ্চাশ জন গোরা, একুশ শ' কালা সিপাহী, আটটি ছোট কামান এবং দুইটি বড় তোপ। নবাবপক্ষের ফৌজে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, পঞ্চাশটা বড় কামান।

সাঁফ্রে কামান দাগিয়া প্রথমেই যুদ্ধ শুরু করিয়া দিলেন। ইংরেজ সৈন্য কয়েকজন মারা পড়িতেই ইংরেজরা পিছু হাটিয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমবাগানে ঢুকিয়া তাঁহারা গর্ত খুঁড়িয়া গর্তের ভিতর কামান স্থাপন করিলেন। নবাবের কামানগুলি উঁচু উঁচু। সে সব কামান হইতে যে সব গোলা বাহির হইল সেগুলি ইংরেজদের গায়ে লাগিল না, সেগুলি তাহাদের মাথার উপর দিয়া গিয়া আমগাছগুলিকে জখম করিতে লাগিল। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। সমস্ত মাঠ কাদায় জলে ভরিয়া গেল। নবাবের বারুদগাড়ির উপর কোন ঢাকা ছিলনা। সমস্ত বারুদ জলে ভিজিয়া গেল।

ঐতিহাসিকেরা বলেন এক পশলা বৃষ্টি ওয়াটার্লু যুদ্ধের সময়ও হইয়াছিল এবং সেই বৃষ্টির ফলেই নেপোলিয়নের বীরবাহিনী নাকি বিপর্যস্ত হইয়া

পড়িয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন ওই এক পশলা বৃষ্টি না হইলে নেপোলিয়ন হয়তো ওয়াটার্লু যুদ্ধে জয়লাভ করিতেন। এক পশলা বৃষ্টি নবাবকেও পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। মীরমদন ও সাঁফ্রের কামান নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ইংরেজদের কামানের বারুদ সুরক্ষিত এবং শুষ্ক ছিল। তাহারা গর্তের ভিতর বসিয়া জোরে জোরে ঘন ঘন তোপ দাগিতে লাগিল। মীরমদন, এবং আরও অনেক সেনাপতি আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। নবাবসেনা পিছু হাটিতে লাগিল। মীরজাফর, ইয়ারলতিফ, রায়দুর্লভ পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহারা যদি এই সময় বীরবিক্রমে আগাইয়া আসিতেন, পলাশীর যুদ্ধে নবাব হারিতেন না। ইংরেজদের ঘন ঘন তোপ-গর্জন শুনিয়া নবাবের বিপুল সৈন্যবাহিনী কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মীরমদনের মৃত্যুতেও সকলে বিহ্বল ভীত হইয়া যে যেদিকে পারিলেন পালাইতে লাগিলেন। নবাব নিজের শিবিরে পিছন দিকে দুইহাত রাখিয়া উত্তেজিতভাবে পরিক্রমণ করিতেছিলেন। মীরমদনের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নবাব মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং মীরজাফরের পায়ের কাছে নিজের পাগড়িটা রাখিয়া মিনতি করিলেন—এখন সব তোমার হাতে, আমাকে বাঁচাও। মীরজাফর কোরান স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি নবাবকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, কিন্তু এখন যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। রায়দুর্লভও সেই পরামর্শ দিলেন। মোহনলাল কিন্তু ইহাতে সম্মত হইলেন না, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য আগাইয়া গেলেন। ফরাসীরাও লড়িতে লাগিল। কিন্তু নবাবের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল, কোথাও কোন শৃঙ্খলা আর ছিল না। ঘোড়া গরুর গাড়ি সৈন্য সব বিশৃঙ্খল হইয়া ছুটোছুটি করিতেছিল। ক্লাইভের সৈন্য সুশিক্ষিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাহারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু তাহাদের রণকৌশল অদ্ভুত। তাহারা কিছুক্ষণের মধ্যেই নবাবের ছাউনী দখল করিয়া ফেলিল। ছাউনীতে ঢুকিয়া দেখিল সিরাজদ্দৌলা নাই। তিনি পলাতক। শোনা গেল তিনি একটা উটের পিঠে চড়িয়া মুর্শিদাবাদের দিকে চলিয়া গিয়াছেন।

এই যুদ্ধে জন সাহেবও যোগ দিয়াছিলেন।

একটি গুলি তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিয়াছিল। তিনি মারা যান নাই হাসপাতালে ছিলেন।

১৫

ধূর্জটিমঙ্গল রাজমহল হইতে ফিরিতেছিলেন। সেকালে রাজমহলের নিকট পাহাড়ের উপর যে জঙ্গল ছিল সেই জঙ্গলেই তিনি তাঁহার বিচারালয় বসাইয়াছিলেন। তাঁহার নিয়োজিত গুণ্ডারা উজীর আহম্মদকে অপহরণ করিয়া সেই জঙ্গলে টানিয়া আনিয়াছিল। ব্যাপারটা মোটেই দুঃসাধ্য হয় নাই। উজীর আহম্মদের অনুচরেরাই টাকা খাইয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল।

ধূর্জটিমঙ্গল বলিয়াছিলেন—"তুমি বহু সতী রমণীর সতীত্ব অপহরণ করেছ। সেজন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি। পা থেকে শুরু করে তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে পারতাম। তুমি যা করেছ তাই হয়তো তোমার উচিত শাস্তি হ'ত। কিন্তু অত নিষ্ঠুর আমি হব না। এক কোপেই তোমার শিরশ্ছেদ করব।"

উজীর আহম্মদের মৃতদেহটাকে তিনি জঙ্গলে শকুন শেয়ালদের মুখে ফেলিয়া দেন নাই। গর্ত খুঁড়িয়া তাঁহার একটা কবরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সহচরবৃন্দসহ অশ্বারোহণে ফিরিতেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের খবর তিনি তখনও শোনেন নাই। তিনি জানিতেন না যে স্বয়ং নবাব পলায়ন করিয়া মহানন্দা নদী ধরিয়া পাটনার দিকে গিয়াছেন। উদ্দেশ্য বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা রামনারায়ণের সহিত মিলিত হওয়া, উদ্দেশ্য ফরাসী জাঁ লর সহায়তায় আবার বাহিনী সংগঠন করিয়া ক্লাইভকে আক্রমণ করা। ধূর্জটিমঙ্গল এসব ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না। ইহা জানিতে পারিলেন না যে রাজমহলের কিছুদূরে কালিন্দী নদীতে তাঁহার নৌকা চড়ায় ঠেকিয়ে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, জানিতে পারিলেন না যে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া বাংলার নবাব সেই ফকির দান শার দ্বারস্থ হইয়াছেন কিছু দিন আগে তিনি যাহার নাক কান কাটিয়া দিয়াছিলেন। জানিতে পারিলেন না যে ফকির দান শা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছেন, জানিতে পারিলেন না যে মীরজাফরের ভাই দাউদ এবং

মীরজাফরের জামাই মীরকাশিম তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে, জানিতে পারিলেন না সিরাজউদ্দৌলা অর্থ দিয়া মীরকাশিমকে বশীভূত করিবার প্রয়াসে লুৎফুন্নিসার বহুমূল্য জহরত এবং অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছিলেন, জানিতে পারিলেন না যে গহনাগুলি মীরকাশিম আত্মসাৎ করিয়াও তাঁহার মুক্তির কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। এসব কিছুই জানিতে পারিলেন না ধূর্জটিমঙ্গল। তিনি অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। এক জায়গায় কিন্তু তাঁহাকে ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিতে হইল। দেখিলেন একটি বহুমূল্য পর্দা-ঢাকাগাড়ি রাস্তার কাদায় আটকাইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার গর্তটি বেশ গভীর এবং কাদাও প্রচুর। ঘোড়া দুইটির পেট পর্যন্ত কাদা উঠিয়াছে। তাহারা গাড়িটিকে টানিয়া তুলিতে পারিতেছে না। গাড়ির সহিস ও কোচোয়ানও মহার্ঘ পোশাকে সজ্জিত দুইজন মুসলমান। তাহারা এ অবস্থায় কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

ধূর্জটিমঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার গাড়ি—"

কোচোয়ানটি খানিকক্ষণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পর উর্দুতে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোথাকার লোক? কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমি মুর্শিদাবাদ যাচ্ছি। সেখানেই আমার বাড়ি।"

"আপনি লড়াইয়ের খবর শোনেন নি? হালত খুবই বুরা। নবাব সাহেব ফতে হয়ে গেছেন! মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি বেগমসাহেবাকে নিয়ে পালাচ্ছিলেন! বেগমসাহেবার গাড়ি কাদায় আটকে গেছে। তিনি কিন্তু দাঁড়াতে পারলেন না, চলে গেলেন।"

গাড়ির ভিতর হইতে একটা বুকফাটা আর্ত ক্রন্দন শোনা গেল।

"কোন্ বেগমসাহেবা গাড়িতে আছেন?"

"বেগম লুৎফুন্নিসা।"

"বেশ আমি গাড়িটা তুলে দেবার ব্যবস্থা করছি। আমার সঙ্গে লোক আছে।"

ধূর্জটিমঙ্গলের সহচরবৃন্দ টানাটানি করিয়া গাড়িটাকে কাদা হইতে তুলিয়া রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহাদের ছুটিয়া পলাইতে হইল। কারণ দাউদ খাঁর সৈন্যরা বেগমদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

তাহারা আসিলেই বেগম লুৎফুন্নিসা তাহাদেব হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

ধূর্জটিমঙ্গলেব একবার মনে হইয়াছিল এই পাষণ্ডদেব হস্ত হইতে বেগম লুৎফুন্নিসাকে বক্ষা কবেন। যে কয়জন সৈন্য আসিযাছিল তাহাদেব হারাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না তাঁহাব পক্ষে। সৈন্য ছিল মাত্র চার। ধূর্জটি-মঙ্গলেবা ছিলেন দশজন। কিন্তু ভাবিলেন সাপেব মাথাব মণি উদ্ধার করিয়া তিনি তাহাকে কোথায লুকাইযা বাখিবেন? মহাকালেব মহা-বিচাবা· য়ে যে শাস্তিব বায় বাহিব হইয়া গিযাছে সে বায়েব প্রতিবাদ কবিবার স্পর্ধাই বা তাঁহাব কেন হইবে? তবু দুঃখিনী লুৎফুন্নিসাব জন্য তাঁহাব কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন অভাগিনী পূর্বজন্মে নিশ্চয় কোন মহাপাপ কবিয়াছিল, তাই এ জন্মে ওই লম্পট পাষণ্ডেব সহধর্মিণী হইতে হইয়াছে। তবু তাহাব জন্য কষ্ট হইতে লাগিল।

একজন সঙ্গী জিজ্ঞাসা কবিল—"এখন তো মুর্শিদাবাদে খুব গোলমাল। সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে এখন?"

"তোমবা যদি অন্য জাযগায যেতে চাও যাও, আমাকে কিন্তু সেখানে যেতেই হবে।"

মৈনিবিবি এবং সরফুব কথা তিনি ভোলেন নাই।

তাঁহার সঙ্গীবা তাঁহাকে কিন্তু ত্যাগ কবিল না। সকলেই তাঁহাব সঙ্গে গেল।

ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন ক্লাইভ সামান্য কয়েক-জন সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ আসিয়াছেন। মুবাদবাগে নবাবেরই এক প্রাসাদে আছন তিনি। ধূর্জটিমঙ্গল একটা অসমসাহসিক কাজ কবিয়া বসিলেন। প্রথমেই সোজা তিনি মুবাদবাগে চলিযা গিযা ক্লাইবেব সাক্ষাৎ প্রার্থনা কবিলেন। সঙ্গে একজন দোভাষী লইয়া গিয়াছিলেন। ভাবিয়া-ছিলেন সাহেবদেব যেমন কাযদা হয়তো দেখা কবিবাব একটা সময় বলিয়া দিবেন। ক্লাইভ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা কবিলেন তাঁহার সঙ্গে। কুর্নিশ করিয়া দোভাষী মারফত জানাইলেন যুদ্ধজয়ের জন্য তিনি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিযাছেন। আরও বলিলেন যে তিনি কলিকাতায় তাঁহাদেব

জমিদারি সুতানুটিতে বসবাস করিতেন। কিন্তু নবাবের সৈন্যরা তাঁহার ঘরবাড়ি পুড়াইয়া দিয়াছে। এখানেও তাঁহারা বড় ভয়ে ভয়ে আছেন। ক্লাইভ সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—ভয়ের কোন কারণ নাই। কলিকাতায় যাহাদের বাড়ি পুড়িয়াছে তাহাদের বাড়ি আবার তৈয়ারি করাইয়া দেওয়া হইবে। আপনি আপনার নাম ঠিকানা এখানে রাখিয়া যান আমি সুতানুটির মুনশী নবকৃষ্ণকে বলিয়া দিব তিনি যেন আপনার থাকিবার সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। এখানেও যত দিন ইচ্ছে নির্ভয়ে থাকিতে পারেন। আপনি যদি দুইজন গোরা সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত থাকেন দুইজন গোরাকে আপনার বাড়ি পাহারা দিবার জন্য মোতায়েন করিয়া দিতে পারি। ধূর্জটিমঙ্গল আর একবার কুর্নিশ করিয়া একমুঠা আসরফি তাঁহাকে নজরানা দিলেন। ক্লাইভ মহা খুশী। বলিলেন, কোন ভয় নাই, আমরা আপনার সহায় থাকিব। ধূর্জটিমঙ্গল যখন ফিরিতেছেন তখন দেখিলেন দুইজন গোরা ঘোড়সওয়ার তাঁহার পিছু পিছু আসিতেছে। মৈনিবিবির বাড়ির সম্মুখে ধূর্জটিমঙ্গল অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে। গোরা দুইটিও সেখানে ঘোড়া থামাইল। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন—এখন পাহারার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হইলে তিনি খবর দিবেন। তাহাদের একটা করিয়া আসরফিও দিলেন। তাহারা চলিয়া গেল। বাড়ির সামনে গোরা সৈন্য মোতায়েন রাখা তিনি সুবুদ্ধির কাজ মনে করিলেন না। পাড়ার লোকেরা হয়ত অন্যরকম ভাবিবে।

ভিতরে গিয়াই তিনি মৈনিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। পেশোয়াজ পরিয়া ওড়না গায়ে দিয়া চোখে সুর্মা লাগাইয়া দোদুল্যমান বেণীতে জরির ফিতা বাঁধিয়া মৈনি যেন অন্যরকম হইয়া গিয়াছে।

"আপনি এসে গেছেন। বাচলুম—"

"তোমার একি বেশ—"

"আমি জনাব মীরজাফর সাহেবের বাড়ি যাচ্ছি। সেখান থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে। খুব ধূম সেখানে আজ। অনেক তইফি, বাইজী, গাইয়ে বাজিয়েরা আসবে সেখানে। দরবার বসবে। শুনেছি সেই দরবারে নাকি স্বয়ং ক্লাইভ সাহেব মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসিয়ে দেবেন। নবাবের বাড়ির সামনের মাঠে প্রচুর তাঁবু পড়েছে—"

"তাই নাকি। তুমি ফিরবে কখন?"

"তা তো জানি না। ছুটি হলেই ফিরব। বহুলোক আসবে দরবারে, আপনিও চলুন না।"

"বিনা নিমন্ত্রণে আমি কোথাও যাই না।"

মৈনির চোখ দুইটির ভিতর হাসির আলো জ্বলিয়া উঠিল, সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"নিমন্ত্রণ আসবে।"

"সরফুর খবর কি?"

"ভাল আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বাহিব হইতে খবর আসিল মৈনির জন্য তাঞ্জাম আসিয়া গিয়াছে।

"তুমি তাহলে যাও এখন। আমি সরফুর কাছে চললাম।"

ধূর্জটিমঙ্গল সরফুর কাছে গিয়া দেখিলেন সরফু ঘরে খিল লাগাইয়া বসিয়া আছে। ধূর্জটিমঙ্গলকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, শুনিলাম নাকি বাবা মা এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি আর এখানে থাকিব না, আমাকেও বাবা মার কাছে পাঠাইয়া দিন। আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না। ধূর্জটিমঙ্গল বলিলেন তাহার বাবা মা কোথায় গিয়াছেন তাহা তিনিও জানেন না। তবে তিনি তাহাকে মুর্শিদাবাদে আর রাখিবেন না। লালবাগের কাছে তাহাদের যে বাড়ি এবং জায়গীর আছে সেইখানেই পাঠাইয়া দিবেন তাহাকে। তাহার সঙ্গে একজন মৌলভী, একজন সঙ্গীত শিক্ষক এবং একজন কুস্তিগীর থাকিবে। ভালো চাকরও বাহাল করিয়া দিবেন তিনি। কোন কষ্ট হইবে না। তাহার পর বাবার ঠিক ঠিকানা পাইলে তাহাকে সেখানে পাঠাইয়া দিবেন। আপাতত: লালবাগে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রাজধানীতে না থাকাই ভালো। ধূর্জটিমঙ্গল বেশীক্ষণ সেখানে বসিলেন না।

"আমি আজই সব ব্যবস্থা করছি। কালই তুমি লালবাগ চলে যাবে। কিচ্ছু ভয় নেই।"

ধূর্জটিমঙ্গল একজন ভালো মৌলভী, ভালো সঙ্গীত শিক্ষক এবং একজন ভালো কুস্তিগীরের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন। সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মুর্শিদাবাদের অনেক নাগরিক ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যদিও

জগৎশেঠের লোকেরা এবং মীরজাফরের অনুচরগণ পুরবাসীদের শান্ত থাকিবার পরামর্শ দিতেছিলেন, যদিও তাঁহারা বলিতেছিলেন—পাপটা বিদায় হইয়াছে এইবার সকলে সুশাসনে সুখে থাকিবে—তবু অনেকেই মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং কিছুক্ষণ ঘুরিয়াই ধূর্জটিমঙ্গল একজন মৌলভী, একজন ওস্তাদ এবং একজন পালোয়ান যোগাড় করিতে সমর্থ হইলেন। অগ্রিম বেতন দিয়া তাহাদের নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন কাল সকালেই গাড়ি আসিয়া তাহাদের লইয়া যাইবে। বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার অপেক্ষায় কেতা- দুরস্ত পোশাক-পরা একজন দৌবারিক বসিয়া আছে। দৌবারিক তাঁহাকে একটা পত্র দিল। পত্রটি নবাবসাহেবের দফতরখানা হইতে আসিয়াছে। ফার্সিতে লেখা আছে —আজ বৈকালে নবাবের প্রাসাদের সম্মুখে দরবার বসিবে। সেই দরবারে আপনি যদি আপনার তশরিফ লইয়া আসেন, আমরা সকলেই সুখী হইব। নীচে মীরজাফরের নামাঙ্কিত একটি সীলমোহর। ধূর্জটিমঙ্গল বুঝিলেন মৈনিই কোন কৌশল করিয়া নিমন্ত্রণটি পাঠাইয়াছে।

ধূর্জটিমঙ্গল গেলেন। দেখিলেন বিরাট আয়োজন, রাজকীয় পরিবেশ। দূরে বৃটিশদের ব্যাণ্ড বাজিতেছে। চতুর্দিকে বিচিত্র পটমণ্ডপ। পাত্রমিত্র সামন্তবর্গের জন্য, নিমন্ত্রিত অথিতিদের জন্য সারি সারি অলঙ্কৃত পট্টাবাস। নানা অলঙ্কারে সুশোভিত, কোনটাতে কিংখাব, কোনটাতে জরি ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে চক্রাকারে সহস্র সহস্র বস্ত্রগৃহ। তাহার চারিপাশে অসংখ্য দোকান, কোনটা পানের দোকান, কোনটা মদের দোকান, কোনটা অলংকারের দোকান, কোনটা মিষ্টান্নের দোকান, কোনটা রেশমের কাপড়ের দোকান, কোনটা খেলনার দোকান, কোনটা ফুলের দোকান, আরও কত রকমের কত দোকান। দোকানীরাও নানা রকমের নানা বেশভূষায় সজ্জিত। লাল দাড়ি আরমানী, ভ্রমরকৃষ্ণ বাবরি দাড়ি সমন্বিত মোগল, ফিরিঙ্গিবেশে সজ্জিত পর্তুগীজ বণিক, চুস্ত পায়জামা শেরওয়ানি পরিহিত বাঙালী ব্যবসায়ী, অর্ধেক মাথা কামানো পিরানকাপড়পরা উড়িয়া দোকানী, ভেলভেটের জামা-কাপড় পরা আফগান—এসব তো আছেই, এ ছাড়া মাঝে মাঝে আছে রূপসী মেয়েরা। তাহারা পানের এবং ফুলের দোকানগুলি অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়া

আছে। ইহাদের সকলকে ঘিরিয়া বিপুল জনতা। সকলে দাঁড়াইয়া আছে। দূরেদূরে গাছেরউপরও লোক কম নাই। কেন্দ্রস্থলেবিরাট একটি মণ্ডপের উপর বিরাট একটি মখমলের চন্দ্রাতপ, তাহাতে অপরূপ কারুকার্যময় স্বর্ণনির্মিত কনকপদ্ম। এই মণ্ডপেব নিচেই সেই মসনদ, যে মসনদে আজিমউস্‌শান, মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজা উদ্দিন মুহম্মদ খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দী খাঁ, সিরাজ-উদ্দৌলা উপবেশন করিযাছিলেন, যে মসনদে বসিবার জন্য কত নবাব কত রক্তে বাংলাদেশের মাটিকে সিক্ত করিয়াছেন। সেই মসনদে আজ মীরজাফর উপবেশন কবিবেন। দরবাবকে ঘিরিয়া যে সুসজ্জিত পট্টবস্ত্রগুলি সম্ভ্রান্ত অতিথি ও বন্ধুবর্গের জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই পট্টবস্ত্রগুলিব ভিতর হইতে গান বাজনার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল। হয়তো মৈনি উহারই একটার মধ্যে বসিয়া কোনও বিশিষ্ট অতিথির মনোরঞ্জন কবিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল যে নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলেন তাহা দেখাইলে হয়তো তাঁহাকেও কোথাও একটা আসন দেওয়া হইত, কিন্তু তাহা দেখাইতে তাঁহাব প্রবৃত্তি হইল না। তিনি দূরে একধারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হঠাৎ একটা তোপধ্বনি শোনা গেল। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিল। পট্টবাস হইতে নানাবেশে সুসজ্জিত আমীব ওমরাহেবা বাহির হইলেন। তাহাব পব কুচকাওয়াজ কবিতে করিতে একদল গোরা সৈন্য আসিয়া মণ্ডপেব একধাবে দাঁড়াইল। আর একধাবে দাঁড়াইল নবাবের সৈন্যরা। দূরে দেখা গেল ক্লাইভেব সহিত মীবজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, এবং কয়েকজন হোমরাচোমরা সাহেব আসিতেছেন। তাঁহাদের আগে আগে একজন নকীব তাঁহাদের আগমনবার্তা ঘোষণা কবিতেছে। তাঁহাবা যখন মসনদের নিকটবর্তী হইলেন স্বয়ং ক্লাইভ মীরজাফবকে হাত ধরিয়া মসনদের উপর বসাইয়া তাঁহার মাথায় উষ্ণীষ পবাইয়া দিলেন। সভাব সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাব পর গর্জন কবিয়া উঠিল আবও কয়েকটা তোপ। ধূর্জটিমঙ্গল একদৃষ্টে মীরজাফবের মুখের দিকে চাহিয়া বহিলেন। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ একটা। গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। গাঁজা মদ আপিঙ ভাঙেব করাল প্রভাব চোখে মুখে পরিস্ফুট। মুখের ভাবটা বড় ভয়ঙ্কব, মনে হয় যেন কোন কুষ্ঠরোগী। এই লোক বঙ্গদেশ শাসন করিবে। নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন ধূর্জটিমঙ্গল।

দরবার হইতে বাহির হইয়া ধূর্জটিমঙ্গল মুর্শিদাবাদের রাস্তায় রাস্তায়

ঘুরিয়া বেড়াইলেন অনেকক্ষণ। যে গাড়িটা সরফু এবং তাঁহার শিক্ষকগণকে লইয়া যাইবে তাহার সহিত আর একবার যোগাযোগ করিলেন। মৈনির বাড়ীতে যখন উপস্থিত হইলেন তখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। শুনিলেন মৈনি তখনও ফেরে নাই। চাকরকে বলিয়া গেলেন মৈনিকে বলিও আমি আসিয়াছিলাম। আমি জাফরাগঞ্জের বাড়িতে ফিরিয়া যাইতেছি।

ধূর্জটিমঙ্গল পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। খাওয়া শেষ করিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। অনেক রাত্রে মৈনি আসিয়া হাজির হইল।

"খবর শুনেছেন ?"

"কি খবর ?"

"এই জাফরাগঞ্জের এক বাড়িতে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে খুন করেছে আজ। কাল তাঁর দেহটাকে নিয়ে হাতী বেরুবে নাকি।"

"কে খুন করেছে ?"

"মহম্মদী বেগ। আপনি তো তাকে চেনেন। আলীবর্দী খাঁ ওকে মানুষ করেছিলেন, সিরাজের দিদিমা ওর বিয়ে দিয়েছিলেন, সিরাজের মা আমিনা বেগম ওকে স্নেহ করতেন—সেই মহম্মদী বেগ।"

"তা তুমি এত রাত্রে এখানে চলে এলে কেন ?"

"মনে হল আপনি এখানে আছেন—এই প্রেতপুরীতে, আমার ভয় হল। চলুন আমার বাড়ি। শুনেছিলাম ঝকমারি এখানে আছে কিন্তু দেখছি কেউ নেই—ঝকমারি কোথায় ?"

"জানি না কোথায়। এখান থেকে চলে গেছে সে। বারাহীরও কোনও খবর পেলাম না। জগন্নাথ ফেরেনি এখনও।"

মৈনি বারাহীর খবর জানিত। কিন্তু কথাটা সে প্রকাশ করিল না। বলিল—"ফেরেনি বোধহয়। আপনি চলুন আমার বাড়ীতে।

আমি কোথাও যাব না। এইখানেই থাকব। কাল ভোরে উঠে সরফুকে নিয়ে লালবাগে চলে যাব।"

"যেখানে এত বড় একটা খুন হয়ে গেছে, সেখানে আপনার ভয় করবে না ? পাড়া নির্জন, কোথাও কেউ নাই।"

"আমার কিচ্ছু ভয় করবে না। তুমি ফিরে যাও।"

"আমি একা ফিরে যেতে পারব না। আপনিও চলুন। অমার ব
ভয় করছে।"

ধূর্জটিমঙ্গল ধমক দিয়া উঠিলেন।

"এ কি অসঙ্গত আবদার তোমার। আমি সঙ্গে দু'জন লোক দিচ্ছি, তুমি
ফিরে যাও।"

মৈনি হঠাৎ ধূর্জটিমঙ্গলের পা দুইটি ধরিয়া বলিল, "দোহাই আপনা
আমাকে সেখানে ফিরে যেতে বলবেন না। আমি সেখানে এখন কিছুতে
ফিরে যেতে পারব না।"

"কেন ?"

মৈনি ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। 'দরবার থেকে ফিরে এসে দেখি
আমার বাড়িতে মহম্মদী বেগ বসে আছে। সে মাঝে মাঝে আমার কা
প্রণয় নিবেদন করত কিন্তু আমি তাকে আমোল দিইনি। আজ সে দু'থ
সোনার মোহর আমার পায়ের কাছে রেখে বলল—বিবিসাহেব, আমি
তোমার কেনা গোলাম, মেহেরবানি করুন। আমি তাকে ঘরে বসি
পালিয়ে এসেছি, সেখানে আর একা ফিরতে পারব না এখন। আপনি
আমার সঙ্গে চলুন—

ধূর্জটিমঙ্গল কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"বেশ, চল।"

দুইজন রক্ষী সঙ্গে লইয়া ধূর্জটিমঙ্গল বাহির হইয়া পড়িলেন।

মৈনিবিবির তাঞ্জাম বাহককে বলিলেন—"মোরাদবাগে চল"। বলিয়াই
তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আগাইয়া গেলেন।

মৈনি একটু অবাক হইয়া গেল—"মোরাদবাগে কেন—?"

তাঞ্জামবাহক প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাব তাহলে—"

"আচ্ছা, মোরাদবাগেই চল—"

অনেকক্ষণ পরে মোরাদবাগে পৌঁছিয়া ধূর্জটিমঙ্গল ক্লাইভের খোঁজ করিলেন।

প্রহরী বলিল—"তিনি এখন নবাব সাহেবের বাড়িতে আছেন।"

ধূর্জটিমঙ্গল তাহাকে একটি আসরফি দিয়া বলিলেন, এখানে কোনও
সাহেব নেই ? কারো সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। তোমাকে আরও
বখশিস দেব। জরুরি দরকার।"

প্রহরী বলিল—"ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব আছেন এখানে"।

"বেশ তাঁর কাছেই আমাকে নিয়ে চল।"

ধূর্জটিমঙ্গল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে ওয়ারেন হেষ্টিংস নামক যুবক ইংরেজটি চমৎকার উর্দু বলিতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি অতি ভদ্রলোক।

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহাকে বলিলেন—"একটি বদমায়েশ লোক একজন বাইজিকে বিরক্ত করছে, আপনি তাঁকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করে দিন। মেয়েটি আমার সঙ্গে এসেছে—"

ওয়ারেন হেষ্টিংস সোৎসাহে বলিলেন, "নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করব। দু'জন গোরা পাহারার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

মৈনির তাঞ্জাম আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

মৈনি তাঞ্জাম হইতে নামিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"বহুত শুক্রিয়া। কিন্তু আমি গোরা পাহারা চাই না। আমি নবাব সাহেবের অন্দরমহলে গান করি। সেখানেই চললাম। আদাব।"

মৈনি তাঞ্জামে উঠিয়া সোজা নবাববাড়ির দিকেই চলিয়া গেল। ধূর্জটিমঙ্গল তাহার পিছু পিছু কিছুদূর গেলেন। কিন্তু মৈনি তাঁহার দিকে আর ফিরিয়া চাহিল না। ফিরিয়া চাহিলে তিনি হয়তো দেখিতে পাইতেন মৈনি কাঁদিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার জাফরাগঞ্জে নিজের বাসায় ফিরিয়া গেলেন। মৈনির জন্য তাঁহার কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্গে আর গেলেন না। বাসায় গিয়া পুনরায় বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

১৬

জগদ্ধাত্রী পরদিনই চলিয়া আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। নীলু রায় বলিলেন, "ধলরাজাকে খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে যাওয়া উচিত নয়।"

দানিয়েলও বলিল—"জন সাহেব আমার উপর আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছেন, তাঁর হুকুম না পেলে কি ক'রে আপনাদের যেতে দি। লালী খাম্বার দেখাশোনা করত, তার উপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলাম

আমি। কিন্তু সে দেখছি তার কাজ ঠিকমতো করেনি। এর জন্যে ফৌ[illegible] শাস্তি পাবে সে—"

লালীকে সে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। এই দেখিয়া ঝামরি কোথা[illegible] যে অন্তর্ধান করিল তাহা কেহ বলিতে পারিল না। দানিয়েল বলি[illegible] বেড়াইতে লাগিল—ওই ডাইনীকে ধরিতে পারিলে তাহাকেও গুলি করি[illegible] মারিয়া ফেলিব। জগদ্ধাত্রীর কাছে আসিয়া তাহার পায়ের উপর মা[illegible] খুঁড়িতে লাগিল সে, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বন্দুকটা তাঁহা[illegible] দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—শুট মি। আমিই দোষ করেছি।

জগদ্ধাত্রী পাথরের মতো হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত অনুভূতি, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত সাধ আহ্লাদ সব যেন জমিয়া বিরাট একটা নৈবেদ্যে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল, সে নৈবেদ্য তিনি ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন বলিয়াছিলেন—নাও আমার সব নাও। তুমি তৃপ্ত হও, তাতেই আমার তৃপ্তি। বিধাতার অমোঘ বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তিনি। ভাবিয়াছিলেন হয়তো সত্যই তিনি সৌভাগ্যবতী, তাই রংকিণী তাঁহার শিশুপুত্রটিকে নিজের চরণে স্থান দিয়াছেন। জগদ্ধাত্রীর চোখে মুখে অদ্ভুত অপূর্ব একটা সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা অবর্ণনীয়, যাহা অননুকরণীয়। এমন সুষমা শিল্পীরা প্রতিমায় বা চিত্রে ফুটাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। এ সুষমার মূল সুর করুণা, মূল ব্যঞ্জনা আত্মসমর্পণ, মূল উদ্দেশ্য পূজা। প্রায় সব সময়েই তিনি নিজের ঠাকুরঘরটিতে থাকিতেন। কস্তুরী একদিন খুঁটিকে আনিয়া বলিল—মা, একে তুর কাছে রাখ। আমি সদাই একে বুকে করে রাখি, বনের হুঁড়ার একে লিতে লারবে আমার বুক থেকে, কিন্তু মানুষ-হুঁড়ারকে বড় ডরাই। তোর ধন তোর কাছেই থাক। জগদ্ধাত্রী প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। বলিলেন, মায়ের যা ইচ্ছা তাই হবে। ও তোর কাছেই থাক ও আমাকে চেনে না, তোকে চেনে। দানিয়েলের কাছে থাকতে যদি তোর ভয় করে আমার কাছে এসে থাক। কস্তুরী বলিল—উকে আমার কিছু ভয় নাই। উ-ই বরং আমাকে ডরায়। জগদ্ধাত্রী বুঝিলেন কস্তুরী দানিয়েলকে ছাড়িয়া আসিবে না। বলিলেন, তবে ওইখানেই থাক তুই। খুঁটি তোর কাছেই থাক। আমার সব ভয় ভেঙে গেছে, আমার সব আমার দেবতাকে

আমি দিয়েছি, ভয় ভাবনা সব। তিনি যা করবেন তাই হবে, আমাদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই। এসব শুনিয়া কস্তুরী অবাক হইয়া গেল।

এইভাবে জগদ্ধাত্রীর দিন কাটিতেছিল।

নীলু রায় একদিন মাখনলালকে সঙ্গে করিয়া ধলরাজার বাড়িতে গেলেন। তাঁহার মনে হইল রাজাকে সব জানানো দরকার। রংকিণীর নিকট তাঁহার মিতেনের পুত্রকেই যে বলি দেওয়া হইয়াছে এবং সেইজন্যই যে তিনি চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন এ কথাটা জানাইলে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থাই তিনি করিবেন। তাঁহারও আর এখানে ভালো লাগিতেছিল না। বাংলাদেশের কোনও খবরও এখানে পৌঁছে নাই। মধু সামন্ত কিছুকাল পূর্বে কিছু সৈন্যসামন্ত লইয়া নবাবকে সাহায্য করিবার জন্য গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারও আর কোনও খবর নাই। শেষপর্যন্ত নবাবের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ বাধিল কি না এবং তাহার ফলাফল কি হইল তাহা জানিবার জন্যে তিনি উৎসুক হইয়া উঠিতেছিলেন। তাছাড়া দানিয়েল লোকটাকেও কেমন যেন একটা খাপছাড়া ধরণের লোক বলিয়া মনে হইতেছিল। সে লালীকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল, জগদ্ধাত্রীর পায়ের নিকট মাথা কুটিল কিন্তু এমন একটা ভাব করিয়া বেড়াইতেছে যেন সে-ই এই অঞ্চলের হর্তাকর্তাবিধাতা। লোকটা যখন রাগে, তখন তাহার জ্ঞান থাকে না,—ক্ষ্যাপা গোছের গোঁয়ার লোক। জগদ্ধাত্রীকে সে অবশ্য দেবীর মতো ভক্তি করে, কিন্তু নীলু রায়ের ধারণা এরকম একটা খামখেয়ালী লোকের নিকট বাস করা নিরাপদ নহে।

ধলরাজা সব শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন। মিতেনের ছেলেকে রংকিণীর কাছে বলি দেওয়া হইয়াছে, এ নিশ্চয় ওই ডাইনী ঝাঁঝরির কারসাজি। ইহার একটা প্রতিবিধান করিতেই হইবে। নীলু রায়কে তিনি বলিলেন ক্ষতিপূরণ না করিলে তাঁহার পাপ হইবে। যেমন করিয়া হোক ইহার ক্ষতিপূরণ করিবেনই। এখন মিতেনের যাওয়া হইবে না, তিনি যথাসময়ে সসম্মানে মিতেনকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। নীলু রায় একটু অবাক হইলেন। ক্ষতিপূরণ করিবেন? টাকা দিবেন নাকি! তাই যদি দেন তাহা হইল সেটা তো কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো হইবে। কিন্তু ধলরাজা যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছেন তাহাতে একথা বলিবার সাহস তাঁহার হইল না। তিনি বার বার নিজের দুই বাহু দুই দিকে প্রসারিত

করিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা দুই উরুর উপর সশব্দে চাপড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইয়া গেল, চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। তিনি আদিবাসীদের ভাষায় উচ্চকণ্ঠে যাহা বলিতে লাগিলেন তাহা রণহুঙ্কার বলিয়া বোধ হইল। নীলু রায় আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। মাখনলালও চোখের ইঙ্গিতে বারণ করিল। নীলু রায় এবং মাখনলালকে ধলরাজা রাজকীয় সম্মানে আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহাদের ভূরিভোজন তো করিতে হইলই, আদিবাসী মেয়েদের বোনা কাপড় চাদর এবং আরও নানারূপ উপহার গ্রহণ করিতে হইল। ধলরাজা নীলু রায়কে একটি প্রকাণ্ড ভল্ল উপহার দিলেন।

কয়েকদিন পরেই একটি নাটকীয় কাণ্ড ঘটিল। ধলরাজার সৈন্যসামন্তরা ঝামরিকে বাঁধিয়া টানিতে টানিতে লইয়া হাজির করিল নীলু রায়ের সম্মুখে। সৈন্যদের সহিত ধলরাজার একটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীও আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ধলরাজা আদেশ দিয়াছেন তাঁহার মিতেন ইহাকে যে শাস্তি দিতে বলিবেন সেই শাস্তিই তাহারা ইহাকে দিবে। ফাঁসি দেওয়া যাইতে পারে, কিংবা পুড়াইয়া ফেলা যাইতে পারে। আজ অমাবস্যা, জগদ্ধাত্রী দেবী যদি ইচ্ছা করেন ইহাকে রংকিণী দেবীর নিকট বলিও দিতে পারেন। ঝামরি চীৎকার করিতেছিল—আমি জানি রংকিণী আমাকে বাঁচাবেক। ওই রক্তখাগিই আমাকে স্বপন দিয়েছিল, আমি যা করেছি তার উস্‌কানিতেই করেছি। সে আমাকে বাঁচাবেক। সত্যই সে বাঁচিয়া গেল শেষকালে। জগদ্ধাত্রী তাহাকে কোন শাস্তি দিলেন না, ক্ষমা করিলেন। সৈন্যরা তাহার বন্ধন খুলিয়া দিতেই সে হাসিতে হাসিতে বনের ভিতর চলিয়া গেল। বৈকালে যাহা ঘটিল তাহাও অপ্রত্যাশিত। স্বয়ং ধলরাজা অশ্বারোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোকজন এবং একটি সুসজ্জিত ছোট পালকি। পালকির ভিতর একটি আদিবাসী রমণী একটি শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। ধলরাজা বলিলেন ছেলেটি তাঁহারই ছেলে। বয়স এক বছর। উহার মা উহাকে প্রসব করিয়াই মারা গিয়াছিল। একটি ধাত্রী তাহাকে লালন পালন করিতেছে। ধলরাজা ধাত্রী সমেত ছেলেকে মিতেনকে দান করিবেন বলিয়া আসিয়াছেন। ছেলেটির ভরণ-পোষণের জন্য কিছু জমিও তিনি মিতেনকে দান করিবেন। মিতেন যদি দয়া

করিয়া তাঁহার এই উপহার গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিবে। মিতেনের যে ক্ষতি হইয়াছে সে ক্ষতি পূরণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই, কিন্তু যতটুকু তাঁহার সাধ্যে কুলাইল ততটুকুই তিনি করিলেন। মিতেন যেন অপ্রসন্ন হইয়া না থাকেন ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। অতিথি অপ্রসন্ন হইলে রাজ্যের অমঙ্গল হয়। তিনি আরও বলিলেন বঙ্গদেশের খবর না পাওয়া পর্যন্ত তিনি মিতেনকে যাইতে দিবেন না। বঙ্গদেশে এখন রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছে। ধূর্জটিমঙ্গল এখন কোথায় আছেন সবই অনিশ্চিত। এ অবস্থায় তিনি মিতেনকে সেখানে পাঠাইবেন না। মধু সমস্ত খবর লইতে গিয়াছে। সে ফিরিয়া আসিলে যে ব্যবস্থা করা দরকার তাহা তিনি করিবেন। কোন বিপদের আশঙ্কা যদি না থাকে মিতেনকে অবশ্যই তিনি পাঠাইয়া দিবেন।

পরদার আড়ালে বসিয়া জগদ্ধাত্রী সব শুনিলেন। নীলু রায় দো-ভাষীর কাজ করিলেন। ধলরাজা অবশেষে সেই পরদার সম্মুখেই হাঁটু গাড়িয়া অভিবাদন করিলেন জগদ্ধাত্রীকে। জগদ্ধাত্রী তখন পরদা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ধলরাজাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"আপনার দান আমি মাথা পেতে নিলাম। আপনার ছেলেকে আমি আমার সাধ্যমত মানুষ করব। আপনার আরও ছেলে আছে তো?"

ধলরাজা বলিলেন তাঁহার ছেলেমেয়ের অভাব নাই। কুড়িটি ছেলে এবং দশটি মেয়ে ভগবান তাঁহাকে দিয়াছেন। "এ ছেলেটির মা মরিয়া গিয়াছে, আপনিই ইহাকে মানুষ করুন।"

জগদ্ধাত্রী পুনরায় তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরদার আড়ালে চলিয়া গেলেন।

মাস ছয়েক পরে ধলরাজা জগদ্ধাত্রীকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। মধু সামন্ত যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে যুদ্ধের ঝড় ঝাপটা থামিয়া গিয়াছে, ধূর্জটিমঙ্গল সুতানুটিতে নিজের নূতন বাড়ি নির্মাণ করিতেছেন, তখন ধলরাজা জগদ্ধাত্রীকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সঙ্গে যদিও লোকজন ছিল তবু যাত্রা খুব নির্বিঘ্ন হয় নাই। পথে এক জায়গায় বাঘের গর্জন শুনিয়া থামিয়া যাইতে হইয়াছিল। বাঘের নিদারুণ গর্জনে দিগদিগন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সকলে স্থির করিলেন আর

অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, নিকটবর্তী একটি প্রান্তরে মশাল জ্বালাইয়া সকলে একত্রে রাত্রিবাস করিলেন। প্রভাতে যাত্রা শুরু হইল। কিছুদূর গিয়াই দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড মৃত বন্য বরাহ পথের ধারে পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ বরাহটাব সহিত কোনও বাঘের যুদ্ধ হইয়াছিল। আর একটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল বাংলাদেশের কাছাকাছি আসিয়া প্রকাণ্ড একটা মাঠের উপর। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক পরিপ্লাবিত। একটা চটিতে আশ্রয় পাইবাব জন্য জগদ্ধাত্রীর পালকি দ্রুতবেগে মাঠটা অতিক্রম করিতেছিল। জগদ্ধাত্রীর অশ্বারোহী সঙ্গীরা নিকটবর্তী একটা জঙ্গলে শিকার করিতেছিলেন বলিয়া একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা একটা পালকি-বাহকের পায়ে একটা লাঠি আসিয়া লাগিল। সে খোঁড়া হইয়া বসিয়া পড়িল। পালকি নামাইতে হইল। ওই অঞ্চলটায় তখন ঠ্যাঙাড়েদের খুব উপদ্রব। বাকি পালকিবাহকরা তারস্বরে চীৎকাব করিতে লাগিল। দেখা গেল দূরে একদল ঠ্যাঙাড়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। একজন পালকিবাহক তখন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল অশ্বারোহীদের খবর দিতে। বাকী যাহাবা রহিল তাহাদেব দুইজন ঠ্যাঙাড়েদের দিকেই আগাইয়া গেল। উদ্দেশ্য তাহাদের সহিত দরদস্তুব করিয়া কিছু কালহরণ করা। এই কৌশলে ফল হইল। তাহাবা ঠ্যাঙাড়েদের সর্দারকে বলিল, তোমরা আমাদেব পথ আটক কোবো না। রানী মা বিশেষ দরকারে মন্দিরে পূজো দিতে যাচ্ছেন। তোমরা দুশ' টাকা নিয়ে আমাদের ছেড়ে দাও।"

সর্দার বলিল—"রানী মা যখন তখন আরও বেশী কিছু দিতে হবে। অন্তত শ' পাঁচেক চাই।"

তাহলে রানী মাকে জিগ্যেস করে আসি। তোমবা একটু অপেক্ষা কর।'

লোকটি পালকির কাছে ফিরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে আবার গেল।

"রানী মা তিন শ' দিতে চাচ্ছেন।"

"তিনশ'তে হবে না। অন্তত: শ' চারেক চাই।'

"আচ্ছা জিগ্যেস করি তাহলে—"

ইতিমধ্যে অশ্বারোহীরা খবর পাইয়া গেলেন। বন্দুক আওয়াজ করিতে করিতে সদলবলে ছুটিয়া আসিলেন তাঁহারা। ঠ্যাঙাড়েরা পলায়ন করিল।

নীলু রায়ই অশ্বারোহীদের অগ্রবর্তী ছিলেন। দেখা গেল তাঁহার ঘোড়ার পিছন দিকে বেশ বড একটা হরিণ ঝুলিতেছে।

আরও দুইটি পালকি ছিল। একটিতে ছিল খুঁটি এবং কস্তুরী আর একটিতে ছিল ধলরাজার পুত্র ও তাহার ধাত্রী শাবরি। জগদ্ধাত্রী ধলরাজার পুত্রটির জটামঙ্গল নামকরণ করিয়াছিলেন।

এই পালকি দুটি দ্বিপ্রহরে আগাইয়া গিয়া চটিতে আশ্রয় লইয়াছিল। জগদ্ধাত্রীও তাহাদের সহিত যাইতেছিলেন কিন্তু পথে একটি পর্বতবেষ্টিত নদী দেখিয়া তিনি স্নান করিবার জন্য নামিয়াছিলেন। স্নানান্তে পূজাও অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। নীলু রায় ভাবিয়াছিলেন তিনটি পালকিই দিনের আলোয় চটিতে পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাই তিনি শিকার করিয়া কিছু মাংস সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় নিকটবর্তী অরণ্যে ঢুকিয়াছিলেন।

আর এক জায়গায় এক দিন থামিতে হইয়াছিল।

পালকিবাহক কম পড়িয়া গিয়াছিল। একজনের পায়ে লাঠি লাগিয়াছিল, পায়ের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছিল। একটা ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া তাহাকে আনিতে হইতেছিল। আরও দুইজন বাহকও অসুস্থ হইয়া পড়ি । একজনের ভেদবমি এবং আর একজনের জ্বর হইল। তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া নূতন বাহক যোগাড় করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল

জগদ্ধাত্রী সমস্ত পথটা স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের অলৌকিক সৌন্দর্যে যেন আর একটা নূতন শোভার সৃষ্টি হয়। অনেকদিন পরে স্বামী সন্দর্শনে চলিয়াছেন। স্বামীকে কেমন দেখিবেন, কি ভাবে তিনি অভ্যর্থনা করিবেন, তাঁহার হৃদয়মন্দিরে স্বামীর জন্য যে আসনটি তিনি পাতিয়া রাখিয়াছেন, সেখানে তিনি বসিবেন কি না এই সব চিন্তা তাঁহার মুখভাবে যে প্রত্যাশা, যে উন্মুখতা, যে অনিশ্চয়তার আভাস ফুটাইয়া তুলিল তাহা যেন আলো-ছায়া-খচিত আর একটা অপূর্ব শ্রী।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহার পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটায় বিরাট বাড়ি নির্মাণ করিয়াছেন। তিন মহলা বাড়ি। প্রকাণ্ড বাগানের পাশে অতিথিদের থাকিবার জন্যও একটি আলাদা দোতলা বাড়ি। যে শিবলিঙ্গের মাথায় কোনও আচ্ছাদন ছিল না সেই শিবলিঙ্গকে ঘিরিয়া বিশাল একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের সংলগ্ন খুব বড় একটি পূজার দালান। দালানের পাশে আর একটি ঘর। জগদ্ধাত্রীর ঠাকুরঘর। বাড়ির পিছনে পুকুর। পুকুরেব পাশে ফলের বাগান। বাড়ির সম্মুখে ফুলের বাগানে বহু রকম ফুল। বাগানের পাশেও কয়েকটা ঘর।

ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে দুর্গাপূজা হইতেছে। শিবমন্দিরসংলগ্ন দালানে লাবণ্যময়ী দুর্গাপ্রতিমা। মা যেন হাসিতেছেন। অষ্টমী পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। দালানের সম্মুখে যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাতে চাঁদোয়া টাঙানো হইয়াছে। বিরাট চাঁদায়ো, বিরাট এবং অলঙ্কৃত। চাঁদোয়ার নীচে নিমন্ত্রিত অতিথিগণ সমবেত হইয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সাহেব সব রকম অতিথিই আছেন। একজন সাহেব চেয়ারে বসিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন। ক্রাচের উপব ভর দিয়া জন সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধে একটি পা তিনি হারাইয়াছেন। কিন্তু কিছুমাত্র দমেন নাই।

"হ্যালো, জর্জটি, মে আই হ্যাভ এ হুইস্কি।'

"নিশ্চয়।"

ধূর্জটিমঙ্গল তাঁহাকে আলাদা একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে টেবিলের উপর সারি সারি বিলাতী মদ। সেখানে দুইজন পোশাকপরা আরদালীও ছিল। ইঙ্গিত করিতেই তাহারা জন সাহেবকে গ্লাসে করিয়া হুইস্কি দিল। একটু পরেই সেই ঘরে দুইজন সারেঙ্গীওলা এবং দুইজন তবলাবাদক আসিয়া বসিল। একটু পরেই বাইনাচ আরম্ভ হইবে। তাহার সংলগ্ন আর একটি ঘরে শুধু গানের আসর। মৈনি বিবি কেরামত আলী

এবং পুতলি বিবি সেখানে আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন। দ্বারের কাছে বসিয়া আছে রোমনি, শাওনি আর তির্কি। ধূর্জটিমঙ্গল তাহাদেব ঝকমকে নূতন পোশাক কিনিয়া দিয়াছেন, তাহারা ভারি খুশী। দন্তগুলি সর্বদা বিকশিত হইয়া আছে। মৈনি এবং কেরামতের গান শুনিয়া তাহারা অবাক হইয়া গিয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল ঠিক করিয়াছেন মৈনি, কেরামত এবং পুতলি এখন কলিকাতাতেই থাকিবে। বাগানেব পাশেব ছোট বাড়িটি তাহাদের জন্যই প্রস্তুত করাইয়াছেন তিনি। সবফুদ্দিনও কলিকাতায় ইংরেজ সরকারে একটি ভালো চাকুরি পাইয়াছে। ধূর্জটিমঙ্গল যদিও বাড়ির মালিক, কিন্তু বাড়ির আসল কর্তা নীলু রায়। তিনি চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। ভারে ভারে খাবার আসিতেছে। দলে দলে লোক আসিতেছে, চেযাব টেবিল আসবাবপত্র জাজিম, কার্পেট, বালিশ, খাট,—কত রকম জিনিস আসিতেছে। সকলেরই ব্যবস্থা কবিতেছেন নীলু রায়। তাঁহাব মুহূর্তমাত্র সময় নাই।

হঠাৎ পুরোহিত মহাশয় ঘণ্টা নাড়িয়া ঘোষণা করিলেন—এইবার সন্ধিপূজা হবে।

ধূর্জটিমঙ্গল করজোড়ে অতিথিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনারা যাঁরা সন্ধিপূজা দেখতে চান তাঁরা মায়ের সামনে এসে দাঁড়ান।"

সকলেই গিয়া দালানের সম্মুখে সমবেত হইলেন। সাহেবরা এবং মুসলমানরাও গেলেন। আহুত অনাহুত রবাহুত, ধনী দরিদ্র বালক যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ—বিরাট ভিড়। সকলেই জোড়হস্তে দাঁড়াইয়াছেন।

সহসা নীলু রায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এই সন্ধিপূজার সময় মায়ের কাছে বব প্রার্থনা করুন আমবা যেন বিজয়ী হই। আজ আমরা যুগ-সন্ধিক্ষণেও উপস্থিত হয়েছি। মুসলমানেব রাজত্ব শেষ হয়েছে, ইংবেজদের রাজত্ব শুরু হল। এই সন্ধিপূজাও আমাদের করতে হবে। এ পূজার মন্ত্র পাঠ করবেন আমাদের বিবেক। এ পূজায় আমরা শপথ নেব যে আমরা চিরকাল সত্যের দিকে, ন্যায়েব দিকে ধর্মের দিকে থাকব। অসত্য অন্যায় অধর্ম আমরা কিছুতে সহ্য করব না। মা আমাদের আশীর্বাদ করুন।"

প্রতিমার একধারে জগদ্ধাত্রী তাঁহার ছোট ছেলে দুইটি ও আত্মীয়-

স্বজনদের লইয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঢাক, ঝাঁজর, শঙ্খ, ঘণ্টা একযোগে বাজিয়া উঠিল।

সন্ধিপূজা শুরু হইয়া গেল।

সে সন্ধিপূজায় আর একটি পবিত্র আলোও জ্বলিয়াছিল। কলিকাতায় ধূর্জটিমঙ্গলের বাড়িতে নহে, মুর্শিদাবাদ খুশবাগে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমাধিমন্দিরে আলোটি জ্বালাইয়াছিলেন বেগম লুৎফুন্নিসা।

সিরাজের মৃত্যুর পর মীরণ তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন, আমাকে নিকা কর। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, সারাজীবন হাতির পিঠে চড়িয়া বেড়াইয়াছি, এখন গাধার পিঠে চড়িতে পারিব না।

সবাই জানে হাতিটি ছিল মত্ত মাতঙ্গ। কিন্তু এই মত্ত মাতঙ্গের স্মৃতি-পূজাই মহীয়সী লুৎফুন্নিসা আমরণ করিয়া গিয়াছেন। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন প্রতি সন্ধ্যায় সিরাজের কবরে একটি বাতি তিনি জ্বালিয়া দিতেন। সেই যুগসন্ধিক্ষণের মহাপূজায় এই ক্ষুদ্র বর্তিকার কোনও সার্থকতা ছিল কিনা জানি না, শুধু জানি তাহার পুণ্য-প্রভা ইতিহাসে আজও অম্লান হইয়া আছে।